Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

# সীরাহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে হানী

রোলঃ 215001291

৫ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### রিসার্চের বিষয়ঃ

### সীরাহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে হানী

রোলঃ 215001291

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

**প্রত্যয়ন পত্র**

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “সীরাহ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে উম্মে হানী, আইডিঃ 215001291 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সীরাহ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Umme Hany

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

**উম্মে হানী**

আইডিঃ 215001291

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র


| বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা সংখ্যা |
|---|---|
| ১.ভূমিকা | ৭ |
| ২.সীরাহর সংজ্ঞা | ৮ |
| ৩.সীরাহ অধ্যয়ন করার গুরুত্ব | ৯ |
| ৪.সীরাহ শাস্ত্র ও হাদীস শাস্ত্রের মধ্যে পাথক্য | ১০ |
| ৬.নবুওয়াত পূর্ববর্তী আরব | ১১ |
| -ইবরাহীম আ এর কাহিনী | ১১ |
| -মক্কার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস | ১৩ |
| -আরবের তৎকালীন ধর্মীয় পটভূমি | ১৪ |
| -আবরাহা ও হস্তি বাহিনী | ১৪ |
| ৬.রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সৌভাগ্যময় আবির্ভাব:তার পবিত্রতম জীবনের ৪০টি বছর | ১৪ |
| -সৌভাগ্যময় জন্ম | ১৪ |
| -বনু সাদ গোত্রে লালন পালন | ১৪ |
| -বক্ষ বিদারণ | ১৫ |
| -বাহিরা রাহিব | ১৫ |
| -ফিজার যুদ্ধ | ১৬ |
| -হিলফুল ফুযূল বা ন্যায় নিষ্ঠার প্রতিষ্ঠা | ১৭ |
| -দুঃখময় জীবন যাপন: | ১৮ |
| -খাদীজাহ (রা) এর সাথে বিবাহ | ১৯ |
| -কাবা গৃহ পুন:নির্মাণ | ২১ |
| ৭.নবুওয়াতী জীবন | ২৩ |
| -পয়গম্বরী যুগ পবিত্র জীবনের মক্কাবস্থানকাল:দাওয়াতের সময়কাল ও স্তর | ২৩ |
| -হেরা গুহায় নির্জনাবাস/ হেরা গুহার অভ্যন্তরে | ২৩ |
| -নবুওয়াত প্রাপ্তি | ২৪ |
| আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ঐশী বাণীর বিভিন্ন রূপ | ২৭ |
| -ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ | ৩০ |
| -প্রকাশ্যে প্রচার দাওয়াত | ৩০ |
| -রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ব্যাপারে মুশরিকদের অবস্থান | ৩৩ |
| -প্রথম হিজরত আবিসিনিয়া | ৩৫ |
| -কেন আবিসিনিয়া ইরাক বা সিরিয়া কেন নয়? | ৩৬ |
| -মক্কায় সাহাবীদের দৃষ্টান্ত/ ইসলাম গ্রহণ | ৩৭ |
| -বয়কট | ৪০ |
| -শোকের বছর | ৪৩ |
| -মক্কার বাইরে ইসলামের দাওয়াত-তায়িফে রাসুল ﷺ | ৪৬ |
| -আল ইসরা মিরাজ | ৪৯ |
| -আক্কবাহর প্রথম বায়আত আনুগত্যের শপথ | ৫৩ |
| -হিজরতে সর্বপ্রথম বাহিনী | ৫৫ |
| -রাসূল ﷺ এর হিজরত | ৫৭ |
| -আল্লাহ সুবহানু ওয়া তালার ইচ্ছে ও কুরাইশের প্রচেষ্টা | ৫৭ |
| -হিজরতের সিদ্ধান্ত | ৫৯ |
| -বাসভবন ঘেরাও | ৬০ |

| বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা সংখ্যা |
|---|---|
| -রাসূলুল্লাহর ﷺ ঘরে | ৬০ |
| -মদীনার পথে | ৬১ |
| -মদীনায় প্রবেশ | ৬৪ |
| ৮.মদীনার প্রবেশ:দাওয়াত,জিহাদ ও পরিত্রানের যুগ | ৬৫ |
| -মদীনার উপকণ্ঠে রাসুলুল্লাহ :নতুন যুগের সূচনা | ৬৬ |
| -মদীনার প্রথম দিনগুলো | ৬৬ |
| -ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা | ৬৭ |
| -প্রথম প্রজেক্ট:মসজিদ নির্মাণ | ৬৮ |
| -আযানের সূচনা | ৬৯ |
| -দ্বিতীয় প্রজেক্ট:মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা: | ৭০ |
| -তৃতীয় প্রজেক্ট: মদীনার সনদ বা চুক্তিপত্র- | ৭২ |
| -চতুর্থ প্রজেক্ট: মুজাহিদ বাহিনী গঠন- | ৭৪ |
| -জিহাদের সূচনা- | ৭৪ |
| -জিহাদ হলো আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার একটি কৌশল | ৭৫ |
| -মুজাহিদ বাহিনী গঠন | ৭৬ |
| ৯.গাযওয়ায়ে বদরে কুবরা-ইসলামের প্রথম ফায়সালাকারী যুদ্ধ | ৭৭ |
| -যুদ্ধের কারণ | ৭৭ |
| ১০.মক্কার পরিস্থিতি | ৭৮ |
| -মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ও তাদের নেতৃত্বের বিন্যাস | ৮০ |
| -মক্কাবাসীগনের যুদ্ধ প্রস্তুতি | ৮১ |
| -মক্কা সেনাবাহিনীর সংখ্যা: | ৮২ |
| -রণক্ষেত্রে অবস্থান: | ৮২ |
| -আল্লাহর সাহায্য ও রহমতের বৃষ্টিপাত: | ৮৩ |
| ১১.যুদ্ধমঞ্চ:বদর | ৮৪ |
| -আবু জাহেল:এক ফেরাউনের জীবনাবসান | ৮৬ |
| -আবু লাহাবের মৃত্যু- | ৮৭ |
| ১২.উহুদের যুদ্ধ: | ৮৯ |
| -কুরাইশ সেনাবাহিনীর যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম এবং কামান: | ৯১ |
| -ইসলামী সেনাবাহিনীর বিন্যাস এবং যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে যাত্রা: | ৯১ |
| -শুরু হলো যুদ্ধ | ৯২ |
| -শহীদ ও কাফির হত্যা সংখ্যা: | ৯৭ |
| ১৩.বনু নাযিরের যুদ্ধ: | ৯৮ |
| -সূত্রপাত | ৯৮ |
| -হত্যাচেষ্টা | ৯৯ |
| ১৪.যাত আর-রিক্বার যুদ্ধ | ১০০ |
| -সালাতুল খওফ: | ১০১ |
| ১৫.বনু আল-মুস্তালিকের যুদ্ধ: | ১০২ |
| ১৬.রাসূলুল্লাহ ﷺ সাথে জুয়াইরিয়্যাহর রাদিয়াল্লাহু আনহার বিয়ে: | ১০৩ |
| ১৭.ইফকের ঘটনা: | ১০৪ |
| ১৮.গাযওয়ায়ে আহযাব(খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ): | ১১১ |
| ১৯.খন্দকের যুদ্ধে অলৌকিক ঘটনা: | ১১৩ |

| বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা সংখ্যা |
| --- | --- |
| ২০.বনু কুরাইযাহর যুদ্ধ: | ১১৪ |
| -অবরোধের সিদ্ধান্ত | ১১৫ |
| ২১.হুদাইবিয়ার সন্ধি: | ১১৮ |
| -দুই পক্ষের মধ্যে দূত প্রেরণ | ১১৯ |
| -বাইয়াতুর রিদওয়ান: | ১২২ |
| -সন্ধির শর্তাবলি: | ১২৪ |
| -হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকে শিক্ষা: | ১২৬ |
| ২২.আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসূলের চিঠি: | ১২৭ |
| ২৩.খাইবারের যুদ্ধ: | ১৩০ |
| -খায়বারের দুর্গসমূহ: | ১৩২ |
| -মুখোমুখি মুসলিম এবং খাইবারের ইহুদিরা- | ১৩৩ |
| ২৪.উমরাতুল কাযা: | ১৩৬ |
| -সাবধানতা অবলম্বন- | ১৩৭ |
| -সাহাবিদের নিয়ে রাসূলুল্লাহর উমরা সম্পাদন: | ১৩৮ |
| ২৫.মুতাহ যুদ্ধ | ১৩৯ |
| -যুদ্ধের কারণ: | ১৪০ |
| ২৬.মক্কা বিজয়: | ১৪৪ |
| ২৭.হুনাইনের যুদ্ধ: | ১৪৬ |
| ২৮.তাবুক যুদ্ধ: | ১৫১ |
| -কুরআনের চোখে তাবুকের যুদ্ধ: | ১৫২ |
| ২৯.বিদায় হজ্জ: | ১৫৫ |
| -আল্লাহর রাসূলের দুআ: | ১৬০ |
| ৩০.জীবনসায়াহ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ: | ১৬০ |
| -বিদায়বেলা: | ১৬২ |
| -উম্মাহর জীবনে বিষাদতম দিন: | ১৬৫ |
| -কাফন-দাফন: | ১৬৭ |
| ৩১.রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পরিবার: | ১৬৯ |
| ৩২.পরিবার, আত্মীয় ও প্রতিবেশীর সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আচরণবিধি: | ১৭৪ |
| -স্ত্রীগণের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আচরণবিধি: | ১৭৪ |
| -সন্তানদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আচরণ: | ১৭৭ |
| -আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আচরণ: | ১৮১ |
| -প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহর ﷺ আচরণ: | ১৮৩ |
| -প্রতিবেশীর সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আচরণ: | ১৮৬ |
| ৩৩.শেষ কথা: | ১৯০ |
| তথ্যসূত্র: | ১৯১ |

# □ ১.ভূমিকা

অন্ধকার অরণ্যে এক ছটা আলোর কিরণ কিংবা ঘোর অমানিশায় উজ্জ্বল তারকার মত জন্ম যার। সততার অটল আদর্শে সদা হাস্যোজ্জ্বল তরুণ আল আমীন একদিন ওহীর পরশে সমগ্র মানবজাতির কাজ হলেন রহমাতুল্লিল আলামিন। কখনও স্বজাতির প্রস্তরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত শির, কখনও বদর উহুদের রক্তে ভেজা জমিন মাড়িয়ে দ্বীনের ঝাণ্ডা বয়ে নিয়ে চলা।সন্তানের মৃত্যুতে ক্রন্দনরত পিতার হৃদয়, কখনও বা কিশোরী স্ত্রীর খেলার সাথী। যুগের পর যুগ ধরে লেখা হয়েছে হাজারো পৃষ্ঠা, কত শত ঘটা পেরিয়ে গেছে তাঁর স্মৃতি রোমন্থনে। হৃদয় থেকে হৃদয়ে ছুঁয়ে গেছে তাঁর ভালোবাসা।

হাজার বছর পরও লেখকদের কলমের কালি আজও ফুরিয়ে যায়নি, মিটে যায়নি নবীপ্রেমিকের হৃদয়ের তৃষ্ণা,অশ্রু সজল হৃদয়ের আবেগে এটুকুও ভাটা পড়েনি। তাঁর সম্পর্কে আরো একটু জানার আকাঙ্ক্ষায়,আরো একটু হৃদয়ের কাছাকাছি যাওয়ার আশার আজও আমরা খুঁজে ফিরি নতুন কোনো পাণ্ডুলিপি।

তিনি আমাদের নবীজী,সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ﷺ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার।দুরুদ ও সালাম তার সর্বোত্তম বান্দা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর এবং তার পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীদের উপর।

সীরাহে এমন একজন আদর্শ পুরুষের আলোচনা করা হয়েছে যিনি জীবনের পরতে পরতে তার অনুসারীদের জন্য আদর্শ রেখে গেছেন।তাই সালাত আদায় করতে গেলে তার কথা মনে পড়ে।কারণ,তিনি বলেছেন-

صلّوا كما رأيتمونى أصلّى

“তোমরা সেভাবেই চালাত আদায় করো যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছো” (১)

হজ আদায় করতে গেলেও হৃদয়ের দর্পণে তার ছবি ভেসে ওঠে। কারণ,তিনি বলেছেন-

خذوا عنّى منا سكاكم

"তোমরা আমার কাছ থেকে হজের যাবতীয় বিধি-বিধান শিখে নাও" (২)

এক কথায়,দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজেই তার শ্রুত স্বরধ্বনি কানে বেজে ওঠে।কারণ,তিনি বলেছেন-

فمنْ رغبَ عَنْ سُنّتيِ فليس مِنِّ

"যে আমার আদর্শ থেকে বিচ্যুত,সে আমার অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়"(৩)

অধিকন্তু মহান আল্লাহ ও তাকে অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করেছেন।কুরআন কারীমে ঘোষিত রয়েছে-

لقدْ كانَ لكمْ فِى رَسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ" (৪)

সূত্র:(১)সহীহ বুখারী:৬৩১

(২)সহীহ মুসলিম:১২৯৭

(৩)সহীহ বুখারী:৫০৬৩

(৪)সূরা আহযাব,আয়াত:২১

## ☐ ২.সীরাহর সংজ্ঞা

সীরাহ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো পথ বা রাস্তা।সীরাহ বলতে এমন একটি পথ বুঝায় যার উপর দিয়ে একজন ব্যক্তি তার জীবনভর হেটে চলে।সীরাহ বলতে শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনী বোঝায় না বরং তা দ্বারা যে কোন ব্যক্তির জীবনীকেই বোঝানো হয়।কিন্তু মুহাম্মাদের ﷺ এর জীবনী সাথে সীরাহ শব্দটি এত বেশি ব্যবহার করা হয়েছে যে,সীরাহ বলতে অধিকাংশ সময় নবীজি মুহাম্মাদের ﷺ জীবনীকেই বোঝানো হয়।

## □ ৩.সীরাহ অধ্যয়ন করার গুরুত্ব

১.ইসলামের ইতিহাস জানা:রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনকে ঘিরেই ইসলামের ইতিহাস।তার জীবন অধ্যয়নের মাধ্যমেই ইসলামের আসল ইতিহাস জানা যাবে,অর্থাৎ তার পুরো জীবনকাল হলো ইসলামের ইতিহাস জানার একটি উপযুক্ত মাধ্যম।তার জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতি গুলো জানা বর্তমান সময়ে দাওয়াতি কাজের জন্য খুবই জরুর।রাসুলুল্লাহর ﷺ সীরাহ অধ্যায়ন তাই নিছক একজন ব্যক্তির জীবন নিয়ে আলোচনা নয় বরং রাসুলুল্লাহর ﷺ সীরাহ হলো মুসলিম জাতির ইতিহাস দিন ইসলামের ইতিহাস।

২.রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি ভালোবাসা:সীরাহ অধ্যয়ন করার একটি অন্যতম কারণ হলো অন্তরে মুহাম্মাদের ﷺ প্রতি এক গভীর ভালোবাসা গড়ে তোলা।নবীজিকে ﷺ ভালোবাসা হলো ইবাদাত।দ্বীনের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে রাসুলুল্লাহর ﷺ প্রতি ভালোবাসা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,"তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না,যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিত,সন্তান এবং সব মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় হই"

অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ ﷺ সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসতে না পারা পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হওয়া যাবে না।সুতরাং মুহাম্মদ ﷺ কে ভালোবাসা হলো ইসলামের একটি অংশ।

৩.সর্বোত্তম আদর্শের অনুসরণ:ইবন হাজার বলেছেন,"কেউ যদি আখিরাতের জীবনে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে চায়,জীবনে সঠিক উদ্দেশ্য বুঝতে চায় এবং নিজের মাঝে প্রকৃত নৈতিকতা ও উন্নত চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ দেখতে চায়,তবে সে যেন রাসুলুল্লাহর ﷺ পথ অনুসরণ করে।"মুহাম্মাদ ﷺ এর ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ আখলাক।তার মাঝে যাবতীয় অসাধারণ গুণাবলির অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল।তাই তার সীরাহ অধ্যয়ন করার মাধ্যমে তাকে আরও বেশি করে অনুসরণ করা সম্ভব হবে।

৪.কুরআন কে অনুধাবন:কুরআনে এমন কিছু আয়াত আছে যেগুলো ওহি নাজিল হওয়ার সময়কার পরিবেশ পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল নয়,যেমন আখিরাত সম্পর্কিত আয়াতসমূহ।পরিবেশ পরিস্থিতি যাই থাকুক না কেন এই আয়াতগুলো সব সময় স্বতন্ত্র

থাকে।আবার কুরআনে এমন কিছু আয়াত আছে যেগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ সময়ে সংঘটিত কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে।তাই দেখা যায় যে কিছু আয়াত কোন ঘটনার পূর্বে নাযিল হয়েছে অথবা ঘটনা ঘটার সময় নাযিল হয়েছে কিংবা ঘটনা ঘটার পর নাযিল হয়েছ।সীরাহ এইসব আয়াতের বিস্তারিত বিবরণ দেয়।এর মাধ্যমে কোন ঘটনার প্রেক্ষাপটে কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তা সীরাহ থেকে জানা যায়।যেমন,সূরা আহযাবের অধিকাংশ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আল-আযহাব বা খন্দকের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে।আবার সূরা আল ইমরানের এমন কিছু আয়াত আছে যা রাসূলুল্লাহর ﷺ সময়ে সংঘটিত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে।আল ইমরানের পরবর্তী অংশে গাযওয়ায়ে উহুদ অথবা উহুদের যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।কিন্তু এ যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা এই সূরাতে দেওয়া হয়নি।একমাত্র সীরাহ অধ্যয়ন করার মাধ্যমে এই আয়াতগুলোকে যথাযথ পরিস্থিতি নিরিখে বোঝা সম্ভব।

৫.সীরাহ অধ্যয়ন একটি ইবাদত:সীরাহ বিনোদনের জন্য নয় এটি একটি ইবাদত।তাই সীরাহ অধ্যয়নের জন্য আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে উত্তম প্রতিদান রয়েছে।যে জামায়াতে রাসুলুল্লাহর ﷺ সীরাহ অধ্যয়ন করা হয় সে জামায়েত আল্লাহ তা'আলা ইবাদাত করার জামায়েত আল্লাহতালার কে স্মরণ করার জামায়েত।আর যে জামায়াতে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করা হয় ফেরেশতারা সে জামায়াত কে ঘিরে থাকেন।আল্লাহ তাআলা বলেন,**“**বল,যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো,আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দিবেন।আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু**”** [সূরা আলে ইমরান,**৩১**]

## ☐ ৪.সীরাহশাস্ত্র ও হাদীসশাস্ত্রের পার্থক্য

সীরাহ ও হাদীসশাস্ত্র জ্ঞানের দুটি ভিন্ন শাখা।কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই দুটি শাখার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়,কিন্তু এই দুইটি শাখার নিয়মনীতি একে অপর থেকে অনেকাংশে আলাদা।হাদীসের আলিমগন নিয়মনীতির ব্যাপারে বেশ কঠোরতা অবলম্বন

করেন।কিন্তু সীরাহর আলিমগন এ ব্যাপারে বেশ ছাড় দেন।এর কারণ হলো হাদিসের সত্যতা বা যাচাই করার পর তা থেকে হুকুম আহকাম প্রতিপাদন করতে হয় তাই মুহাদ্দিসগণ সর্বদা হাদিসের সত্যতা যা তা যাচাইয়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকার চেষ্টা করেন যেন হাদিসগুলোর ইসনাদ ঠিক থাকে।কিন্তু সীরাহের ক্ষেত্রে ব্যাপার টি এমন নয়।সীরাহ কে ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে দেখা হয়,তাই হুকুম আহকাম এর উপর এর কোন প্রভাব থাকে না।

## ❑ ৬.নবুওয়াত পূর্ববতী আরব

### ♣ইবরাহীমের আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাহিনি:

যমযম কূপের উদ্ভব-ইবরাহীম (আ) ও তার স্ত্রী হাজেরা (আ) ও ও সদ্য জাত পুত্র ইসমাইলকে নিয়ে হিজায এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।তিনি তাদেরকে যে জায়গাটিতে নিয়ে যান সেই জায়গাটি এখন মক্কা নামে পরিচিত।ওই সময় মক্কা ছিল জনমানব শূন্য তবে যে স্থানে কাবা নির্মাণ করা হয়েছিল তার সৃষ্টি শুরু থেকেই পবিত্র ছিল।আল্লাহর নির্দেশে ইবরাহীম (আ) তার স্ত্রী ও পুত্র কে অল্প কিছু পানি ও এক থলে খেজুর নিরিবিলি জায়গায় রেখে আসেন।চলে আসার সময় আল্লাহর কাছে একটি চমৎকার দুয়া করেন-“হে আমাদের রব,আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে অনুর্বর উপত্যকায় আবাদ করেছি।হে আমাদের রব, যাতে তারা সালাত কায়েম রাখে।আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং তাদের রিজিক প্রদান করুন ফলফলাদি থেকে,যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।”[সূরা ইবরাহীম:৩৭]

ইবরাহীম (আ) চলে গেলেন।মা হাজেরা(আ)কাছে অল্প যে খাবার ছিল তা কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল।আর ইসমাঈল (আ) তখনো ছিলেন দুধের শিশু।হাজরা তার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াছিলেন কিন্তু সেই দুধও একসময় শুকিয়ে গেল।ইসমাঈল

প্রচন্ড ক্ষুধায় কাঁদছে।সন্তানের কান্না সহ্য করতে না পেরে মা খাদ্যের খোঁজে বের হলেন।একটি পাহাড় বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন,এ পাহাড় ই পরে আস সাফা নামে পরিচিত হয়েছিল।একদিকে পুত্র ইসমাইল প্রচন্ড ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে,অন্যদিকে হাজেরা কিছু পাওয়ার আশায় আস সাফাও আল মাওয়া পাহাড় দুটির মাঝে ছোটাছুটি করছেন।এভাবে ইতিমধ্যে সাতবার দুই পাহাড়ে ওঠানামা করে ফেলেছেন।সপ্তম বার তিনি যখন পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন তখন একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন।তিনি দেখতে পেলেন শিশু ইসমাইলের পায়ের কাছ থেকে আওয়াজটি আসছে।আল্লাহ তায়ালা নির্দেশে জিবরাঈল (আ) সেখানে জমজম কূপ খনন করে দিয়েছেন আর হাজেরা ওই কুপের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন।মরুভূমিটি শুষ্ক ছিল তাই পানি শুকিয়ে যেতে পারে চিন্তা করে হাজেরা পানি ধরে রাখার জন্য কুয়ার মত একটি জায়গা তৈরি করলেন।এই ঘটনা বর্ণনা করার সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ বলছিলেন,ইসমাঈলের (আ) মায়ের উপর আল্লাহতালা রহম করুন।তিনি যদি এভাবেই তা ফেলে রাখতেন তাহলে সেখানে নদী প্রবাহিত হয়ে যেত,অর্থাৎ তিনি কুয়া বানিয়ে পানি ধরে না রাখতেন তাহলে তা থেকে একটি নদী প্রবাহিত হতো।

**❑ মক্কায় জনবসতি স্থাপন:**

জমজম কূপ সৃষ্টি হল,মরুভূমিতে পানির অভাব দূর হলো,আর স্বাভাবিকভাবেই শুরু হলো প্রাণের সমাগম।পাখিরা কুপের চারপাশে উড়তে লাগল।সেখানে তখন জুরহুম নামে একটি যাযাবর গোত্র ছিল।এদের আদি নিবাস ছিল ইয়েমেন,কিন্তু তারা ইয়েমেন ত্যাগ করে এখানে চলে আসে।জুরহুম গোত্রের লোকেরা মা হাজেরা কে প্রশ্ন করল,”আমরা কি এখানে বসতি স্থাপন করতে পারি?” হাজেরা (আ) বললেন ‘ঠিক আছে,তোমরা থাকতে পারো,তবে আমার একটি শর্ত আছে আর তা হলো এই কূপ আমার অধীনে থাকবে।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,’হাজেরা মনে মনে চাইছিলেন এই গোত্র এখানে বসতি স্থাপন করুক’ তিনি চাচ্ছিল্রন এখানে একটা জনবসতি গড়ে উঠুক,কিন্তু এটাও চাচ্ছিলেন যেন

বিষয়টা যথাযথভাবে হয়।অবশেষে জুরহুম গোত্র যমযম কূপের নিকটস্থ এলাকায় বসতি স্থাপন করে আর এ এলাকাটি পরবর্তীতে মক্কা নামে পরিচয় লাভ করে।

## ☐ মক্কার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস:

জাহেলিয়াত যুগের আরব সমাজের সামাজিক অবস্থার ছিল স্থিরতা এবং কূপমন্ডুকতা ই সমাজ জীবনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।অজ্ঞতা,অশ্লীলতা,স্বেচ্ছাচারিতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল সমগ্র সমাজ।অসত্য ও অন্যায়ের নিকট সত্য ও ন্যায় হয়ে পড়েছিল সম্পূর্ণরূপে পর্যদস্ত।সাধারণ মানুষকে জীবন যাপন করতে হতো পশুর মত।বাজারে পণ্যের মতো ক্রয় বিক্রয় করা হতো মহিলাদের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করা হতো মাটি ও পাথরের মত।গোত্র কিংবা রাষ্ট্র যা ই বলা হোক না কেন প্রশাসনের মূল ভিত্তি ছিল শক্তিমত্তা।প্রশাসন পরিচালিত হতো শক্তিধর গনের স্বার্থে।দুর্বলতর শ্রেণীর সাধারণ লোকজনের কল্যাণের কথা কস্মিনকালেও চিন্তা করা হতো না।প্রজাদের নিকট হতে গৃহীত অর্থ সম্পদে কোষাগার ভরে তোলা হতো এবং প্রতিদ্বন্দ্বীগনের বিরুদ্ধে সৈন্যদলের মহড়া এবং যুদ্ধবিগ্রহের উদ্দেশ্যই তা সংরক্ষিত হত।

### ☐ অর্থনৈতিক অবস্থা:

জাহেলিয়াত যুগের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো এবং অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থাকে কোনক্রমে সামাজিক অবস্থার চেয়ে উন্নত বলা যেতে পারে না।প্রকৃতপক্ষে তেজারত বা ব্যবসা বাণিজ্য ছিল আরব অধিবাসীগণের জীবন ও জীবিকার প্রধান অবলম্বন।কিন্তু দেশ থেকে দেশান্তরে গমনাগমন,মালপত্র পরিবহন, বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ পর্যটনের জন্য নিরাপত্তা ও শান্তি শৃঙ্খলা ইত্যাদি ব্যাপার গুলো এতই সমস্যা সংকলন সংকুল ছিল যে নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা ছিল এক দুষ্কর ব্যাপার। মানুষের দারিদ্র দূরীকরণের মাধ্যমে জীবন মান উন্নয়ন, মহামারী ও রোগ ব্যাধি দূরীকরণ কিংবা অন্য কোন কল্যাণমূলক কাজে অর্থ সম্পদের খুব সামান্য অংশই ব্যয়িত হতো।সম্পদের

সিংহভাগই ব্যয়িত হতো যুদ্ধবিগ্রহের কাজে।কাজেই জনজীবনে সুখ শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ বলতে তেমন কিছুই ছিল না।সমাজে এমন এক শ্রেণীর লোক ছিল যাদের দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন এবং দেহাবরণের জন্য নূন্যতম প্রয়োজনীয় বস্ত্র খন্ডের সংস্থান ও সম্ভব হতো না।

## ◻ আরবের তৎকালীন ধর্মীয় পটভূমি:

ইসমাঈল (আ) ছিলেন আরবের নবী,আর ইসমাঈল (আ) এর দাওয়াহ ছিল তাওহীদের দাওয়াহ,তাই আরবরা প্রথমত মুসলিমই ছিল কিন্তু কালের পরিক্রমায় তারা একটা সময়ে এসে মুশরিক হয়ে যায়।ইবরাহীম (আ) প্রবর্তিত সত্য ধর্মের অনুসারী বলে দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে দ্বীনি ইবরাহিম (আ) এর কোন বৈশিষ্ট্য তাদের চিন্তা চেতনা ও ধ্যান ধারণায় ছিল না।তারা নানা প্রকার অশ্লীলতা ও পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে।পৌত্তলিকতা,অশ্লীলতা,শিরক,বিদআত ও বহুত্ববাদের জমাট অন্ধকার ভেদ করে চিরভাস্বর ও চির জ্যোতির্ময় ইসলাম নামক সূর্য যখন নবায়িত আলোর বন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করল।তখন প্রচলিত সকল বিশ্বাস এবং মতবাদের অনুসারীগণ একদম হতচকিত হয়ে পড়ল।

## ◻ আবরাহা ও হস্তি বাহিনী:

আবরাহাহ বিন সাবাহ হাবশী যখন দেখলেন যে,আরববাসীগন কাবা গৃহে হজ্জব্রত পালন করছেন এবং একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ থেকে লোকজন সেখানে আগমন করছেন তখন সানআয় তিনি একটি বিরাট গির্জা নির্মাণ করলেন এবং আরববাসীগনের হজ্জব্রত কে সেদিকে ফিরিয়ে আনার জন্য আহ্বান জানালেন।কিন্তু বনু কিনানাহ গোত্রের এক ব্যক্তি যখন এই সংবাদ অবগত হলেন তখন এক রাতে তিনি গোপনে গির্জার প্রবেশ করে তার সামনের দিকে মলের প্রলেপন নিয়ে একদম নোংরা করে ফেললেন।এ ঘটনায় আবরাহাহ ভয়ানক ক্রোধান্বিত হন এবং প্রতিশোধ গ্রহণ কল্পে

কাবাহ গৃহ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ৬০ হাজার অস্ত্র সজ্জিত সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী সহ মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হন।তিনি নিজে একটি শক্তিশালী হস্তীপৃষ্ঠে আরোহন করেন সৈন্যদের নিকট মোট নয়টি অথবা তেরটি হস্তি ছিল।আবরাহাহ ইয়ামেন হতে অগ্রসর হয়ে মুগাম্মাস নামক স্থানে পৌঁছলেন এবং সেখানে তার জন্য বাহিনীকে প্রস্তুত করে নিয়ে মক্কায় প্রবেশের জন্য অগ্রসর হলেন।তারপর যখন মুজদালিফা এবং মিনার মধ্যবর্তী স্থান ওয়য়া দিয়ে মুহাসসিরে পৌঁছলেন তখন তার হাতি মাটিতে বসে পড়ল। মর্যাদা এমন সময় আল্লাহ তা'আলা এক ছোট ছোট পাখি প্রেরণ করলেন। সেই পাখিগুলো ঝাকে ঝাকে পাথরের ছোট ছোট টুকরো শূন্যদের উপর নিক্ষেপ করতে লাগলো।প্রত্যেকটি পাখি তিনটি করে পাথরের টুকরো বা কঙ্কন নিয়ে আসতো একটি ঠোঁটে এবং দু’টি দু’পায়ে।কঙ্কর গুলোর আকার আয়তন ছিল ছোলার মত,কিন্তু কংকর গুলো যার যে অঙ্গে লাগতো সেই অঙ্গ ফেটে গিয়ে সেখান থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে হতে সে মরে যেত।কংকরাঘাতে ছিন্নভিন্ন এবং পদতলে পিষ্ট হয়ে এক পলকে বীরপুরুষগণ মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়তে লাগলো। আবরাহার উপর আল্লাহ তালা এমন এক মুসিবত প্রেরণ করলেন যে,তার আঙ্গুলসমূহের জোর খুলে গেল এবং সানআ নামক স্থানে যেতে না যেতেই তিনি পাখির বাচ্চার মত হয়ে পড়লেন।তারপর তার বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে হৃদপিণ্ড বেরিয়ে এলো এবং তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হলেন।হস্তী বাহিনীর এই ঘটনা ছিল আগামী দিনের নবী সাল্লাল্লাহু ﷺ এবং কাবাহ শরিফের জন্য আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও সাহায্যের এক সুস্পষ্ট নিদর্শন।রাসুলুল্লাহ ﷺ জন্মের বছরে ঘটনা ঘটেছিল।তাই তার জন্মের বছরকে ‘হাতির বছর’বলা হয়।

## □ ৬.রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সৌভাগ্যময় আবির্ভাব-তার পবিত্র জীবনের ৪০টি বছর:

### ♣ সৌভাগ্যময় জন্ম:

রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার বিখ্যাত বনু হাশিম বংশে ৯ ই রবিউল আউয়াল সোমবার দিবস রজনীর মহাসন্ধিক্ষণে সুবহে সাদিকের সময় জন্ম লাভ করেন।ইংরেজি পঞ্জিকা মতে তারিখটি ছিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে ২০ অথবা ২২ শে এপ্রিল।সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পর ই বিবি আমিনা আব্দুল মুত্তালিবের নিকট তার পুত্রের জন্মগ্রহণের শুভ সংবাদটি প্রেরণ করেন।এই শুভ সংবাদ মাত্রই তিনি আনন্দচিত্তে সুতিকাগারে প্রবেশ করে নবজাতককে কোলে তুলে নিয়ে কাবা গৃহে নিয়ে উপস্থিত হন,আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করতে থাকেন এবং তার সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করতে থাকেন।আনন্দের এই মুহূর্তেই তিনি এটাও স্থির করে ফেললেন যে এই নবজাতকের নাম রাখা হবে মোহাম্মাদ। আরববাসী গানের নামের তালিকায় এটা ছিল অভিনব একটি নাম।

### ♣ বনু সা'দ গোত্রে লালন পালন:

দুগ্ধপোষ্য শিশুদের লালন-পালনের ব্যাপারে তৎকালীন নগরবাসী আরব গনের মধ্যে একটি বিশেষ প্রথা প্রচলিত ছিল।সেই প্রথাটি ছিল শহর-নগরের জনাকীর্ণ ও পরিবেশ জনিত আধি-ব্যাধির কুপ্রভাব থেকে দূরে উন্মুক্ত গ্রামীণ পরিবেশে শিশুদের লালন পালন করার মাধ্যমে তারা যাতে বলিষ্ঠ দেহ এবং মজবুত মাংসপেশীর অধিকারী হয় এবং বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শিখতে সক্ষম হয়।তার উদ্দেশ্যে দুগ্ধ পানের জন্য বেদুইন পরিবারের ধাত্রীগনের হাতে শিশুদের সমর্পণ করা। এ প্রথা অনুযায়ী আব্দুল মুত্তালিব শিশু মুহাম্মাদ ﷺ কে দুগ্ধ পান করানোর উদ্দেশ্যে ধাত্রী অনুসন্ধান করেন এবং শেষ পর্যন্ত হালিমা বিনতে আবূ যুয়াইব আব্দুল্লাহ বিন হারিসের নিকট তাকে সমর্পণ করেন।দুগ্ধপানকালে হালিমা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর অলৌকিক ও বরকতময় অনেক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে আশ্চর্যজনিত তো হতবাক হয়ে যান।

## ♣বক্ষ বিদারণ:

দুগ্ধপানের সময় সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও বালক মুহাম্মদ ﷺ বনু সা'দ গোত্রে অবস্থান করতে থাকলেন।বনু সা'দ গোত্রে অবস্থানকালে কয়েক মাস পর জন্মের ৪র্থ কিংবা ৫মে বছরে তার বক্ষ বিদারনের ঘটনাটি ঘটে।একদিন বালক মুহাম্মদ ﷺ যখন সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে খেলাধুলা করছিলেন এমন সময় জিবরাঈল (আ)সেখানে এসে উপস্থিত হন।তারপর তাকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে চিৎ করে শুয়ে দিলেন এবং তার বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃদপিণ্ড বের করে আনলেন।তারপর তার মধ্য থেকে কিছুটা জমাট রক্ত বের করে নিয়ে বললেন,'এটা হচ্ছে শয়তানের অংশ যা তোমার মধ্যে ছিল'।তার হৃদপিণ্ড দুটিকে একটি সোনার তস্তুরীতে রেখে জমজমের পানি দ্বারা তা ধুয়ে তা যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করে কাটা অংশ জোড়া লাগিয়ে দিলেন।এই সময় তার খেলার সঙ্গীসাথীগন দৌড়ে গিয়ে দুধ মা বিবি হালিমাহকে বলল যে মুহাম্মদ ﷺ নিহত হয়েছেন।বিবি হালিমা এবং তার স্বামী এই কথা শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে মুহাম্মদের ﷺ এর মুখ মন্ডলে মালিন্য এবং পেরেশানির ভাব লক্ষ্য করলেন।এ অবস্থার মধ্যে তারা তাকে বাড়িতে নিয়ে এসে তারা সেবা যত্নে লিপ্ত হলেন।

## ♣বাহীরা রাহিব:

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বয়স যখন ১২ বছর সেই সময়ে ব্যবসা উপলক্ষে চাচা আবু তালিবের সাথে তিনি শাম দেশে সিরিয়া গমন করেন এবং সফরের এক পযার্য়ে বসরায় গিয়ে উপস্থিত হন।বসরা শহরে জারজীস নামক একজন খ্রিস্টান ধর্মযোজক রাহিব বসবাস করতেন।মক্কার ব্যবসায়ী দল যখন বসরা শিবির স্থাপন করেন তখন রাহিব গির্জা থেকে বেরিয়ে তাদের নিকট আগমন করেন।অথচ এর আগে কখনো তুমি এভাবে গির্জা থেকে বেরিয়ে কোন বাণিজ্য কাফেলা সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি।তিনি কিশোর নবী রাসুলুল্লাহ ﷺ এর অবয়ব আচরণ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দেখে বুঝতে পারেন যে ইনি

হচ্ছেন বিশ্ব মানবের মুক্তির দিশারী আখেরি নবী ﷺ.আবূ তালিব এবং কুরাইশের লোকজন বললেন,'আপনি কিভাবে অবগত হলেন যে তিনিই হবে আখেরি নবী?' বাহিরা বললেন,গিরিপথের ওই প্রান্ত থেকে তোমাদের আগমন যখন ধীরে ধীরে দৃষ্টিগোচর হয়ে আসছিল আমি প্রত্যক্ষ করলাম যে, সেখানে এমন কোন বৃক্ষ কিংবা প্রস্তর খন্ড ছিল না যা তাকে সেজদা করেনি।এ সকল জিনিস নবী রাসুল ছাড়া সৃষ্টিরাজের অন্য কাউকে কখনো সিজদা করে না।অধিকন্তু,'মোহরে নবুওয়াত'দেখেও আমি তাকে চিনতে পেরেছি।তার কাঁধের নিচে কড়ি হাড্ডির পাশে আপেল আকৃতির একটি দাগ রয়েছে,সেটাই হচ্ছে "মোহরে নবুওয়াত"।আমাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল সূত্রে আমরা এসব কিছু অবগত হতে পেরেছি অতঃপর তিনি তাদেরকে আপ্যায়িত করেন।এরপর বাহীরা আবূ তালিব কে বললেন,'একে সঙ্গে নিয়ে শামে ভ্রমণ করবেন না। শীঘ্রই একে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যান।কারণ,এর পরিচয় অবগত হলে ইহুদী ও রুমিগণ একে হত্যা করে ফেলতে পারে।

## ♣ফিজার যুদ্ধ:

রাসুলুল্লাহ ﷺ বয়স যখন ২০ বছর তখন ওকাশ বাজারে একটি সংঘটিত হয়।এই যুদ্ধে রাজপক্ষে ছিলেন কুরাইশগন এবং তাদের মিত্র ও বনু কিনানাহ।বিপক্ষে ছিলেন ক্বায়স আয়লান।এ যুদ্ধ 'ফিজার যুদ্ধ' হিসেবে খ্যাত।কেননা বনু কিনানাহ বারায নামে এক ব্যক্তি ক্বায়স আয়লানের তিন লোককে হত্যা করে।কুরাইশ-কিনানাহ মিত্র পক্ষের সেনাপতি ছিলেন হারব বিন উমাইয়া। কারণ,প্রতিভা এবং প্রভাব প্রতিপত্তির ফলে তিনি কুরাইশ ও কিনানাহ গোত্রের মধ্যে নিজেকে মান মর্যাদার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।একে ফিজার যুদ্ধ এজন্য বলা হয় যে,এতে নিষিদ্ধ বস্তু সমূহ এবং পবিত্র মাসের পবিত্রতা উভয়ই বিনষ্ট করা হয়।রাসূলুল্লাহ ﷺ কিশোর বালক অবস্থায় এ যুদ্ধে গমন করেছিলেন এই যুদ্ধে তিনি তীরের আঘাত থেকে তার চাচাদের রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

## ♣হিলফুল ফুযূল বা ন্যায়নিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা:

ফিজার যুদ্ধে নিষ্ঠুরতা ও ভয়াবহতা সুচিন্তাশীল ও সদিচ্ছা পরায়ণ আরববাসিগণকে দারুণভাবে বিচলিত করে তোলে।এ যুদ্ধে কত যে প্রানী ঘটে,কত শিশু ইয়াতিম হয়,কত নারী বিধবা হয় এবং কত সম্পদ বিনষ্ট হয় তার ইয়ত্তা করা যায় না।ভবিষ্যতে আরববাসীগণকে যাতে এরকম অর্থহীন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে না হয় সেজন্য কুরাইশের বিশিষ্ট গোত্র প্রতিকগণ আব্দুল্লাহ বিন জুদ’আন তাইমীর গৃহে একত্রিত হয়ে আল্লাহর নামে একটি অঙ্গীকারনামা সম্পাদনা করেন।আব্দুল্লাহ বিন জুদ'আন ছিলেন তৎকালীন মক্কার একজন অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি।অধিকন্ত সততা দানশীলতা এবং অতিথি পরায়ণতার জন্য সমগ্র আরব ভূমিতে তার বিশেষ প্রসিদ্ধি থাকার কারণে আরববাসীগণের উপর তার যথেষ্ট প্রভাব ও ছিল।তখনকার সময় নিয়ম ছিল গোত্রীয় কিংবা বংশীয় কোন ব্যক্তি, আত্মীয়স্বজন অথবা সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ কোন ব্যক্তি শত অন্যায় অনাচার করলেও সংশ্লিষ্ট সকলকে তার সমর্থন করতেই হবে তা সে যত বড় বীভৎস অন্যায় হোক না কেন।এই পরামর্শ সভায় এটি স্থায়ীকৃত হয় যে জাতীয় নীতি হচ্ছে ভয়ংকর অন্যায়,অমানবিক ও অবমাননাকর।কাজেই,এ ধরনের জঘন্য নীতি আর কিছুতেই চলতে দেয়া যেতে পারে না।তার প্রতিজ্ঞা করলেন-

ক)দেশের অশান্তি দূর করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব

খ)বিদেশি লোকজনের ধন-প্রাণ ও মান সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

গ)দরিদ্র দুর্বল ও অসহায় লোকদের সহায়তা দানে আমরা কখনোই কুণ্ঠাবোধ করব না।

ঘ)অত্যাচারী ও অনাচারের অন্যায় অত্যাচার থেকে দুর্বল দেশবাসীদের রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব।

এটা ছিল অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে সত্য ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকার নামা।এজন্য এই অঙ্গীকারনামা ভিত্তিক সেবা সংঘের নাম দেওয়া হয়েছিল 'হিলফুল ফুযূল' বা 'হলফ-উল ফুযূল'।

## ♣দুঃখময় জীবন যাপন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বাল্য, কৈশোর এবং প্রথম যৌবনের পেশাভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কোন কাজকর্মের কথা পাওয়া যায় না।তবে নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে,বনু সা'দ গোত্রে দুধমা'র গৃহে থাকা অবস্থায় অন্যান্য বালকদের সঙ্গে ছাগল চরানোর উদ্দেশ্যে মাঠে গমন করতেন।মক্কাতেও কয়েক কিরাত অর্থের বিনিময়ে তিনি ছাগল চড়াতেন।তারপর যখন তিনি ২৫ বছর বয়সে পদার্পণ করেন তখন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর সম্পদ নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে শাম দেশে গমন করেন।খাদীজাহ বিনতে খুওয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন সম্ভ্রান্ত সম্পদশালী ও ব্যবসায়ী মহিলা ছিলেন।যখন তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সত্যবাদিতা,উত্তম চরিত্র,সদাচার এবং আমানত হেফাজতের নিশ্চয়তা সম্পর্কে অবগত হলেন তখন তিনি মুহাম্মাদ ﷺ এর নিকট এক প্রস্তাব পেশ করলেন যে,তিনি তার অর্থ নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে তার দাস মায়সারাহর সঙ্গে শাম দেশের গমন করতে পারেন।তিনি স্বীকৃতি ও প্রদান করেন যে অন্যান্য ব্যবসায়ীগণকে যে হারে লভ্যাংশ বা মুনাফা প্রদান করা হয় তাকে তার চেয়ে অধিক মাত্রায় মুনাফা প্রদান করা হবে।রাসূলুল্লাহ ﷺ এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং তার অর্থ সম্পদ নিয়ে দাস মায়সারাহর সঙ্গে শাম দেশে গমন করলেন।

## ♣খাদীজাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে বিয়ে:

সিরিয়া থেকে যুবক রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রত্যাবর্তনের পর ব্যবসা বাণিজ্যের খতিয়ান করা হল।হিসাব-নিকাশ করে আমানতসহ এত বেশি পরিমাণ অর্থ তিনি পেলেন আগে কোনদিনই তা পাননি এতে খাদীজাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার অন্তর তৃপ্তির আমেজে ভরে উঠে।মায়সারাহর কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশংসায় পঞ্চমুখ।তিনি বলেন,'এই মানুষটার সততা অবিশ্বস্ততা মুগ্ধ হওয়ার মত!'খাদীজাহ রাদিয়াল্লাহু আনিহা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কথা যত শুনেছেন ততই তার প্রতি আগ্রহ বোধ করেছেন।রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চারিত্রিক গুণাবলী এমনই ছিল যে সবাইকে টানতো।রাসূলুল্লাহ কে বিয়ে করার কথা খাদীজাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার বান্ধবী নাফীসা বিনতে মুনাব্বিহ এর নিকট ব্যক্ত করেন এবং বিষয়টি নিয়ে রাসুলুল্লাহর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য তাকে অনুরোধ জানালেন।নাফীসা খাদীজাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রস্তাব সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সাথে আলোচনা করলেন।রাসুলুল্লাহ ﷺ এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করে বিষয়টি চাচা আবু তালিবের সঙ্গে আলোচনা করলেন।আবু তালিব এ ব্যাপারে খাদীজাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার পিতৃব্যের সাথে আলোচনার পর বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন এবং এক শুভক্ষণে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত দুটি প্রাণ বিশ্ব মানবের অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান।রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং বিবি খাদীজাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার মধ্যে শুভ বিবাহ পূর্ব অনুষ্ঠিত হয় শাম দেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের দুমাস পর।তিনি সহধর্মিনী খাদীজাহকে মোহরানা স্বরুপ উট প্রদান করেন।ওই সময় খাদীজাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বয়স হয়েছিল ৪০ বছর।

## ♣কা'বাহ গৃহপুনঃ নির্মাণ:

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর যখন ৩৫ বছরে পদার্পণ করেন তখন কুরাইশগন কাবাহ গৃহের পুনঃনির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন।কারণ,কাবাহ গৃহের স্থানটি চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিল মাত্র। দেয়ালের উপর কোন ছাদ ছিল না।এ অবস্থার সুযোগ

গ্রহণ করে কিছু সংখ্যক চোর এর মধ্যে প্রবেশ করে রক্ষিত বহু মূল্যবান সম্পদ এবং অলংকারাদি চুরি করে নিয়ে যায়।ঈসমাঈল (আ)এর আমল হতে ঘরের উচ্চতা ছিল ৯ হাত।গৃহটি পূর্বে নির্মিত হওয়ার কারণে দেয়ালগুলোতে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে কোন মুহূর্তে তা ভেঙে পড়ার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।এমন এক নাজুক অবস্থার প্রেক্ষাপটে কুরাইশগন সংকল্পবদ্ধ হলেন কাবা গৃহের স্থান ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে তা পুনঃনির্মাণের জন্য।কাবা গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে সকল গোত্রের কুরাইশগণ একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে কতিপয় নীতি নির্ধারণ করে নিলেন।সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে:কাবা নির্মাণ করতে গিয়ে শুধুমাত্র বৈধ অর্থ সম্পদ হালাল ব্যবহার করা হবে।সুদের অর্থ এবং হক নষ্ট করে সংগ্রহিত হয়েছে এমন কোন অর্থ নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা যাবে না।এই সকল নীতির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন করে নির্মাণ কাজ আরম্ভ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হলো।কুরাইশরা কাবার পুনঃনির্মাণের কাজ শুরু করার পর কালো পাথর বসানোর বিষয়টি সামনে এলে সমস্যা বেধে যায়।সবাই কালো পাথর যথাস্থানে রাখার মর্যাদা পেতে চায়।এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে বর্ষিয়ান নেতা আবু উমাইয়া মাখযূমী সমস্যা সমাধানের একটি সূত্র খুঁজে পেলেন।তিনি সকলকে লক্ষ্য করে প্রস্তাব করলেন যে আগামীকাল সকালে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবেন তার উপরেই এই বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব অর্পণ করা হোক।সকলেই এ প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করলেন।দেখা গেল সকল আরববাসীর প্রিয় পাত্র শ্রদ্ধেয় আল আমিন সর্বপ্রথম মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করেছেন।তাকে চাদর দেয়া হলে তিনি মেঝের উপর তা বিছিয়ে দিয়ে নিজের হাতে কৃষ্ণ প্রস্তর টি তার ওপর স্থাপন করলেন এবং বিবাদমান গোত্রপ্রতিগণকে আহ্বান জানিয়ে বললেন আপনারা সকলে চাদরের পার্শ্ব ধরে উত্তোলন করুন।তারা তাই করলেন।সবাই মিলে চাদর কে যখন কৃষ্ণপ্রস্তর রাখার স্থানে পৌঁছালো তখন তিনি সেও মোবারক হস্তে কৃষ্ণ প্রস্তরটি উঠিয়ে যথাস্থানে রেখে দিলেন।এ মীমাংসা সকলেই হৃষ্টচিত্তে মেনে নিলেন।অত্যন্ত সহজ,সুশৃংখলও সঙ্গত পন্থায় জ্বলন্ত একটি সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

## ◻ ৭.নবুওয়াতী জীবন

### পয়গম্বরী যুগ পবিত্র জীবনের মক্কাবস্থানকাল:দাওয়াতের সময়কাল ও স্তর

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নবুওয়াতী জীবন আমরা দুটি অংশে বিভক্ত করে আলোচনা করতে পারি।কাজকর্মে ধারা প্রক্রিয়া এবং সাফল্য।সাফল্যের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে এর এক অংশ ছিল ভিন্নধর্মী এবং ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যময়।অংশ দুটি হচ্ছে যথাক্রমে:

১.মক্কায় অবস্থান কাল প্রায় ১৩ বছর

২.মদিনায় অবস্থান কাল ১০ বছর

তারপর মাদানী উভয় জীবন তার বৈশিষ্ট্য ও কর্ম প্রক্রিয়ার ব্যাপারে ছিল স্তর ক্রমিক এবং ভিন্নধর্মী।তার পয়গম্বরী জীবনের উভয় অংশ পর্যালোচনা এবং পরীক্ষণ করলে অনুপ্রমিকে স্তর গুলো সমীক্ষা করে দেখা বহু অংশে সহজেতর হয়ে উঠবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মক্কায় অবস্থানকাল এবং কর্মপ্রক্রিয়াকে তিনটি অনুপ্রমিক স্তরে বিভক্ত করে নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।সেগুলো হচ্ছে:

১.সর্বসাধারণের অবগতির অন্তরালে গোপন দাওয়াতী কর্মকান্ডের স্তর(৩ বছর)।

২.মক্কাবাসীগণের নিকট প্রকাশ্য দাওয়াত ও তাবলীগী কাজের স্তর।(নবুওয়াতি চতুর্থ বছর থেকে মদিনায় হিজরত করা পর্যন্ত)।

৩.মক্কার বাইরে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ ও বিস্তৃতির স্তর (১০ম নবুওয়াতী বর্ষের শেষভাগ হতে মাদানী জীবন শুরু হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত)।

## ◻ হেরা গুহায় নির্জনাবাস/হেরা গুহার অভ্যন্তরে

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যখন চল্লিশে পদার্পণ করলেন ওই সময় তারা এত দিনের বিচার বিবেচনা,বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তা ভাবনা যা জনগণ এবং তার মধ্যে ব্যবধানের এক প্রাচীর

সৃষ্টি করে চলেছিল তা উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং ধীরে ধীরে তিনি নির্জনতা প্রিয় হয়ে উঠতে লাগলেন।রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হেরা পর্বতের গুহায় সময় কাটাতে চলে গেলেন।তিনি সাথে কিছু খাবার ও পানীয় নিতে এবং হেরা পর্বতের নির্জনতায় আল্লার ইবাদত করতেন।তখন হেরা পর্বতের গুহা থেকে কাবাকে দেখা যেত।রাসুলুল্লাহ ﷺ তার নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে দিনরাত আল্লাহর ইবাদত করতে। তিনি আল্লাহকে চিনতেন এই সময়টা ছিল আল্লাহ সম্পর্কে ভাবার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এক সুবর্ণ সুযোগ।এর মাধ্যমে আল্লাহ তাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন,কেননা ধ্যান ও গভীর চিন্তা অন্তরকে শুদ্ধ করে।খাবার ও পানি সঙ্গে নিয়ে মক্কা নগরী হতে দু'মেইল দূরত্বে অবস্থিত জাবালে নূর পর্বতের হেরা গুহায় তিনি ধ্যান মগ্ন থাকতে লাগলেন।এটা হচ্ছে ক্ষুদ্র আকার আয়তনের একটি গুহা।এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার গজ এবং প্রস্থ দু গজ।এর নিচ দিকটা তেমন গভীর ছিল না।একটি ছোট্ট পথের প্রান্তভাগে অবস্থিত পর্বতের উপর অংশের একত্রে মিলেমিশে ঠিক এমন একটি আকার আকৃতি ধারণ করেছিল যা শোভাযাত্রার পুরো ভাগে অবস্থিত আরোহী শূন্য সুসজ্জিত অশ্বের মতো দেখায়।পুরো রমযান রাসূলুল্লাহ ﷺ হেরা গুহায় অবস্থান করে আল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকেন।

## ❑ নবুওয়াত প্রাপ্তি:

রাসূলুল্লাহ ﷺ হেরা পর্বতের গুহায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন।নিশ্চুপ, নিমগ্ন,নিবেষ্ট মনে আল্লাহর ইবাদত করতেন।চারপাশে সৃষ্টি নিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে যেতেন।হঠাৎ একদিন জিবরাইল (আ)তার কাছে হাজির হলেন।জিবরাইল (আ) সম্পর্কে উমর ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসে বলা আছে,"কুচকুচে কালো কেশ আর ধবধবে শুভ্র পোশাক পরা এক লোক তার মাঝে ভ্রমণের কোন ছাপ নেই।"অর্থাৎ তিনি মাঝে মাঝেই মানুষের বেশ ধরে আসতেন।কিন্তু সেদিন,ওয়াহী আনার সেই প্রথম দিনে কোন মানুষের রূপে নয় নিজের রূপেই মোহাম্মদ ﷺ এর সামনে নিজেকে প্রকাশ

করেন।প্রকাণ্ড সেই সত্ত,আচ্ছন্নকারী আবির্ভাব।কয়েকশো পাখা দিগন্ত ঢেকে ফেলেছে,তাতে শোভা পাচ্ছে নাম না জানা অগণিত মনিমুক্ত আর প্রবাল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বললেন,'ইক্করা' তিলাওয়াত করো।ইক্করা শব্দটার দুটি অর্থ আছে।তার মধ্যে একটি হল পড়া এবং আরেকটি হল তিলাওয়াত করা।এই প্রেক্ষিতে অর্থটা ছিল 'তিলাওয়াত করো'।

রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বলে উঠলেন,'আমি তো পড়তে জানি না!''

জিবরাইল (আ) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ শক্ত করে বুকে জড়িয়ে চাপ দিলেন,এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন,'ইক্করা'।

রাসুলুল্লাহ ﷺ আবারও বললেন,'আমি তো পড়তে জানি না!''

পুনরায় জিবরাইল তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিয়ে বললেন,''ইক্করা'।

এভাবে একবার,দুবার,তিনবার করার পর অবশেষে তিনি কুরআনের নাযিলকৃত প্রথম আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করেন,এগুলো ছিল সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

“পড়ুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।পড়ুন আপনার প্রতিপালক মহা দয়ালু।যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে(এমন জ্ঞানের),যা সে জানতো না”।(সূরা আলাক,৯৬:১-৫)

জিবরাইল (আ) সাথে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর প্রথম সাক্ষাৎ এমনই ছিল।পুরো ঘটনার আকস্মিকতায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বিহ্বল হয়ে পড়েন।ঘরে ফিরে এসেই সাথে সাথে স্ত্রী খাদীজাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা কে বলেন,''জাম্মিলুনি,জাম্মিলুনি'-আমাকে চাদর দিয়ে মুড়ে দাও!আমাকে চাদর দিয়ে মুড়ে দাও!রাসূলুল্লাহ ﷺ তখনও ভয়ে ঠকঠক করে কাপছিলেন।তার শীত করছিল।মা খাদীজাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে চাদরে ঢেকে দিলেন কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক হলে তিনি খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহার কাছে সব কথা খুলে বললেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আতঙ্কিত হওয়ার কারণ ছিল।তিনি জ্বীন,আত্মা,জাদু ইত্যাদি বিষয় মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন।তার সাথে যা ঘটেছে সেগুলোর সাথে জাদুকরদের জাদুর মিল আছে ভেবেই তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠছিলেন সব শুনে খাদিজাহ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু তাকে অভয় দিয়ে বললেন,**“**না,আল্লাহ তায়ালা আপনাকে কখনো ত্যাগ করবেন না।আপনি ন্যায়পরাণ, আত্মীয় স্বজনের হক আদায় করেন,অসহায়দের সাহায্য করেন,মেহমানদারি করেন,আপনার সাথে যা ঘটেছে তা কখনোই শয়তানের পক্ষ থেকে হতে পারে না।**”**

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উত্তম আচার আচরণ ও কাজের জন্য খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা নিশ্চিত জানতেন যে আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা’য়ালা তাকে অবশ্যই হেফাজত করবেন।

খাদীজাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফাল এর কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে নিয়ে যান।ওয়ারাকা আইয়ামে জাহেলিয়াতে খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী ছিলেন।কিন্তু তিনি শিক্ষিত লোক ছিলেন।তার কাছে বাইবেলের কিছু পান্ডুলিপি ও ছিল সেগুলো থেকে তিনি পড়াশোনা করতেন।খাদীজাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা তার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পুরো ঘটনা খুলে বললেন।ওয়ারাকা বললেন,“যিনি এসেছিলেন তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ ফেরেশতা জিবরাইল (আ) মুসা নবীর কাছে তিনি ই এসেছিলেন।”

ওয়ারাকা মুসা নবীর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ঘটনার সাদৃশ্য খুঁজে পেলেন।তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কিছু কথা বললেন।কথাগুলো বেশ কৌতুহলোদ্দীপক।তিনি বললেন,'হায়!যদি আমি সেই সময় তরুণ থাকতাম যখন তোমার কওম তোমাকে বের করে দেবে!'

রাসূলুল্লাহ ﷺ অবাক হয়ে বললেন,'আমার কওম আমাকে আমার দেশ থেকে বের করে দিবে?তা কি করে হয়!প্রশ্নটা তখনকার পরিস্থিতিতে খুবই স্বাভাবিক রাসূলুল্লাহ ﷺ সে সময় একজন সম্মানিত ও প্রশংসিত ব্যক্তি মক্কার সম্ভ্রান্ত গোত্র বনু হাশিমের সন্তান।না তিনি কখনো কারো সাথে ঝগড়া করেছেন না কোন বিবাদে লিপ্ত হয়েছেন।তার মত মানুষকে মক্কা থেকে বের করে দেয়া হবে এটা চিন্তারও বাহিরে।উপরন্তু,মক্কার সামাজিক ঐতিহ্য ছিল এমন যে,কাউকে তার কওম থেকে বের করে দেয়াটা চরম ঘৃণিত কাজ হিসেবে ধরা হতো।গোত্রতান্ত্রিক সেই সমাজে গোত্র ভিত্তিক একতাই ছিল মরুভূমির চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ার বেচে থাকার একমাত্র হাতিয়ার।তাই তার গোত্রের লোকদের মাঝে বিরাজ করতো বিশ্বাসের এক অটুট বন্ধন।

ওয়ারাকাহ বলেন,'যারাই তোমার মত এই ওহী লাভ করেছে তাদের সবার সাথে লোকেরা শত্রুতা করেছে,তাদেরকে ঘর ছাড়া করেছে।'এই একটি মন্তব্য ধারাই ওয়ারাকাহর অগাধ জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।ওয়ারাকাহ ইবন নওফালের প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিল।তার প্রতিটি অনুমান ছিল রাসুলুল্লাহর ﷺ এর পরবর্তী জীবনের জন্য সতর্কবার্তা।তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এটাই বুঝিয়ে দিলেন যে এই কাজগুলো সহজ কাজ নয়।

## ▢ ওয়াহী:আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ঐশী বাণীর বিভিন্ন রূপ:

ইবনুল কায়্যিম ওয়াহীর বিভিন্ন প্রকার আলোচনা করেছেন।তিনি বলেন প্রথম প্রকারের ওয়াহী হলো সত্য স্বপ্ন।এই উপায়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রথম ওয়াহি লাভ করা শুরু করেন।জিবরাইল কর্তৃক ওয়াহি নাযিলের পূর্বে টানা ছয় মাস ধরে রাসুলুল্লাহ

ﷺ নিয়মিত স্বপ্ন দেখতেন।রাতের বেলায় যে স্বপ্ন দেখতেন,পরদিন দিনের বেলায় সেই স্বপ্ন সত্যি হতো এভাবেই চলছিল প্রায় ছয় মাস।ওয়াহীর

প্রকৃতি এবং প্রকারভেদ সম্পর্কে ইবনুল কাইয়্যিম যে আলোচনা করেছেন তা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো:

**ওয়াহীর প্রথম প্রকার:সত্য স্বপ্ন**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,যেসব স্বপ্ন সত্য,সেগুলো নবুয়তের ৪৬ ভাগের এক ভাগ।রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নবুওয়াতের জীবন ছিল ২৩ বছর দীর্ঘ,আর তিনি সত্য স্বপ্ন দেখেছেন ৬ মাস ধরে।২৩ বছর সময়টাকে ছয় মাস দিয়ে ভাগ করলে অনুপাত দাঁড়ায় ১:৪৬,৪৬ ভাগের এক ভাগ।স্বপ্ন কেবল নবীরা নয় যে কেউই দেখে থাকে।পার্থক্য হল এই নবীদের স্বপ্ন এক ধরনের ওয়াহী হিসেবে বিবেচিত,অন্যদেরটা তা নয়।

**ওয়াহীর দ্বিতীয় প্রকার:**

এই প্রকার ওয়াহী হলো ফেরেশতাদের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর উপর ওয়াহী নাযিল হয়।ফেরেশতা দেখা না দিয়ে অর্থাৎ অদৃশ্য অবস্থান থেকেই রাসুলুল্লাহ ﷺ এর অন্তরে ওয়াহী প্রবেশ করিয়ে দেন।এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,“জিবরাইল (আ) ফেরেশতা আমার অন্তরে এ কথা নিক্ষেপ করলেন যে,কোন আত্মা সে পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না যে পর্যন্ত তার ভাগ্যে যতটুকু খাদ্যের বরাদ্দ রয়েছে পুরোপুরি তা পেয়ে না যাবে।অতএব তোমরা আল্লাহকে সমীহ করো এবং রুজি অন্বেষণের জন্য ভালো পথ অবলম্বন করো।রুজি প্রাপ্তিতে বিলম্ব হওয়ায় তোমরা আল্লাহর অসন্তোষের পথে অন্বেষণে যেন উদ্বুদ্ধ  না হও।কারণ,আল্লার নিকট যা কিছু রয়েছে তা তার আনুগত্য ছাড়া পাওয়া দুষ্কর।

**ওয়াহীর তৃতীয় প্রকার:**

ফেরেশতা মানুষের আকৃতি ধারণপূর্বক রাসুলুল্লাহ ﷺ কে সম্বোধন করতেন।তারপর তিনি যা কিছু বলতেন রাসূলাল্লাহ্ ﷺ মুখস্ত করে নিতেন।এ অবস্থায় সাহাবীগণ রাদিআল্লাহু আনহুম ও ফেরেশতা কে দেখতে পেতেন।

**ওয়াহীর চতুর্থ প্রকার:**

ওয়াহী হওয়ার সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট ঘন্টার টুনটুন ধ্বনির মতো ধ্বনি শোনা যেত।ওয়াহী নাজিলের এটাই ছিল সবচেয়ে কঠিন অবস্থা।টুনটুন ধ্বনির সংকেত প্রকাশ করতে করতে ফেরেশতা ওয়াহী নিয়ে আগমন করতেন এবং রাসূলুল্লাহর ﷺ এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন।ওয়াহী নাযিলের সময় কঠিন শীতেও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কপাল থেকে ঘাম ঝরতে থাকতো।

**ওয়াহীর পঞ্চম প্রকার:**

এই প্রকারের ওয়াহী নাযিলের সময় ফেরেশতা তার স্বরূপে আগমন করেন।এরকম দু’বার হয়েছিল।সূরা নাজমে এর উল্লেখ আছে।

**“**নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল,দূর দিগন্তের সিদরাহ-গাছের কাছে....।**”**(সূরা নাজম,৫৩:১৩-১৪)

জিবরাইল (আ) এর পাথা এত বড় ছিল যে সেগুলো দিগন্তে ছেয়ে ফেলতো,রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,যখন জিবরাইল (আ) তার স্বরুপে আসতেন,‘তিনি যেদিকে ই তাকাতেন,সেদিকেই জিবরাইলের পাখা দেখতে পেতেন।’

**ওয়াহীর ষষ্ঠ প্রকার:**

এই প্রকারের ওয়াহীতে আল্লাহ সুবহানাতায়ালা নিজে সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে কথা বলেছেন,কোন মাধ্যম ছাড়াই।এটা হয়েছিল মিরাজের সময়।মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথেও আল্লাহ এভাবে কথা বলেছিলেন।এই ছয় ভাবেই রাসুলুল্লাহর ﷺ কাছে ওয়াহী নাযিল হয়েছে।

## ▢ ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ:

**তিন বছর গোপনে প্রচার-**

সূরা মুদ্দাসসিরের প্রথম আয়াত প্রথম থেকে ষষ্ঠ আয়াত পর্যন্ত:১)ওহে বস্ত্র আবৃত ব্যক্তি।২)ওঠ,সতর্ক কর।৩)আর তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।৪)তোমার পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো।৫)অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো।৬)অনুগ্রহ করো না অধিক পাওয়ার উদ্দেশ্য।৭)তোমার প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধরো।

সূরাহ মুদ্দাসসিরের উপর্যুক্ত আয়াত সমূহ নাযিল হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ ﷺ পথ হারা মানুষদেরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়ার কাজ শুরু করলেন এমন অবস্থায় যে,তার জাতি কুরাইশদের মূর্তি ও প্রতিমার পূজা অর্চনা ব্যতীত কোন দ্বীন ছিল না,তবে তারা হজ করত যেভাবে তাদের পিতৃপুরুষদেরকে দেখেছে।তাদের আত্মমর্যাদায় ও বংশ গৌরব ব্যতীত কোন সৎ চরিত্র ছিল না।এ অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে ও প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কায় প্রচার ও তাবলীগের কাজকর্ম সন্তপর্ণে ও অতিগোপনে করার প্রয়োজন ছিল যাতে মক্কা বাসিগণের সামনে আকস্মিকভাবে বিপ্লবিক কিংবা উত্তেজনামূলক কোন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে না যায়।

## ▢ প্রকাশ্যে প্রচার দাওয়াত:

ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ ও পরস্পর সাহায্যে সহযোগিতার মাধ্যমে মুমিনদের যখন একটি দল সৃষ্টি হল এবং রিসালাতের বোঝা বহনের মত যোগ্যতা অর্জিত হলো ও ইসলাম তার নিজ অবস্থানকে কিছুটা শক্তিশালী করতে সক্ষম হলো তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রকাশ্যভাবে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া ও বাতিল দ্বীন,উপাস্যদের উত্তম পন্থায় প্রতিরোধ করতে আদিষ্ট হলেন।এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার এ বাণী অবতীর্ণ হয়-

وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الأَقْرَبِيْنَ

‘আর তুমি সতর্ক কর তোমার নিকট আত্মীয় স্বজনদের।’(আশ শু’আরা ২৬:২১৪)

এটি হচ্ছে সূরা শু'আরার আয়াতত এবং এই সুরাতে সর্বপ্রথম মুসা (আ) এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।রাসূলুল্লাহ ﷺ কে যখন দিনের প্রকাশ্য দাওয়াত পেশ করার নির্দেশ দেয়া হলো সেই প্রসঙ্গে মূসা আঃ এর ঘটনা বলে বিস্তারিত বিবরণাদিন এর কারণেই তুলে ধরা হলো যাতে প্রকাশে দাওয়াতের পর যেভাবে মিথ্যা এবং বাতিলের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়ে যায় এবং হকপন্থীদের কিভাবে অন্যায় অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয় তার একটি চিত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তার সাহাবি রাদিআল্লাহু আনহুমদের সম্মুখে বিদ্যমান থাকে।

এ সূরাহর মধ্যে নবী রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্নকারী জাতি সমূহ,যথা:ফিরাউন ও তার দল ব্যতীত নূহ (আ) এর সম্প্রদায় আদ,সামুদ,ইবরাহিম (আ) এর সম্প্রদায় লূতের সম্প্রদায় এবং আযাবুল আইকার পরিণতির কথা উল্লেখিত রয়েছে।

**☐ বিরুদ্ধাচরণের বিভিন্ন পন্থা:**

কুরাইশগন যখন দেখলেন যে,রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তার দ্বীনের দাওয়াত এবং তাবলীগ থেকে নিবৃত্ত করার কোন কৌশল কার্যকর হচ্ছে না তখন তারা পুনরায় চিন্তাভাবনা করে তার তাবলীগী কর্মকান্ডকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য নানামুখী পন্থা প্রক্রিয়া অবলম্বন শুরু করলেন।সামগ্রিকভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া কে নিম্নোক্তভাবে সাজানো যেতে পারে:

১.উপহাস,ঠাট্টা-তামাশা,ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ,মিথ্যা প্রতিপন্ন,অকারণ হাসাহাসি:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সূরা আল ফুরক্বানে বলেন,"তারা যখন আপনাকে দেখে, তখন আপনাকে কেবল বিদ্রুপের পাত্ররূপে গ্রহণ করে,বলে এ-ই কি সেই যাকে আল্লাহ 'রাসূল' করে প্রেরণ করেছেন?" (সূরা ফুরক্বান,২৫:৪১)

তারা বলতো আল্লাহর কাছে কি রাসূল হিসেবে প্রেরণ করার জন্য এর চেয়ে যোগ্য কেউ ছিল না?তারা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা, তাকে ব্যঙ্গ করা,ছোট করা কোন কিছুই বাদ দেয়নি।রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন কুরাইশের সবচেয়ে অভিজাত পরিবারের সন্তানদের উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তাকে দেখলে স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতি সম্ভ্রম

তৈরি হয়।তারপরও কুরাইশরা তাকে নিয়ে মজা উড়াতো,কারণ তিনি ধনী ছিলেন না ক্ষমতাও ছিল না।মানুষ সাধারণত ধন-সম্পদ প্রভাব প্রতিপত্তি দেখে বেশি প্রভাবিত হয় যার ধন সম্পদ ক্ষমতা প্রতিপত্তি আছে তার ব্যাপারে সবার বেশি আগ্রহ থাকে।

২.সংশয় সন্দেহের উস্কানি ও মিথ্যা দাওয়াতের মুখোশ উন্মোচন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়াদি বিকৃত করে দেখানো,রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে যেন মনে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করা এবং মিথ্যা ও অপপ্রচার করা।রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শিক্ষা- দীক্ষা,ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি সবকিছুকে অর্থহীন ও আজেবাজে প্রশ্নের সম্মুখীন করা এসবগুলো অনবরত এত অধিক পরিমাণে করা যাতে জনসাধারণ তার দ্বীন প্রচারের দিকে ধীরস্থির ভাবে মনোযোগ দেয়া কিংবা চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ না পায়।মুশরিকদেরর সবচেয়ে বেশি সন্দেহ ছিল প্রথমত তাওহীদ বিষয়ে,দ্বিতীয় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নবুওয়াত রিসালাত,তৃতীয় মৃতদের পুনরুজ্জীবিত হওয়া ও কিয়ামত দিবসের হাশরের ময়দানে একত্রিত হওয়া নিয়ে।কুরআন তাওহীদ বিষয়ে তাদের সকল প্রকার সন্দেহের যথোপযুক্ত জবাব তো দিয়েছেই বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশি ও বিস্তারিত আকারে আলোচনা করেছে যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে।শুধু তাই নয় তাদের বাতিল মাবুদের অসারতা সম্পর্কে এত বেশি সমালোচনা করেছে যে,এ বিষয়ে আর কোন আলোচনার অবকাশ নেই সম্ভবত দ্বীন ইসলাম বিষয়ে তাদের ক্রোধ আক্রোশের পরিমাণ এত বেশি।

৩.অতীত কালের ঘটনাবলী এবং উপখ্যান সমূহ এবং কুরআনুল কারিমে বর্ণিত বিষয়াদির মধ্যে অর্থহীন ঝগড়া বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ধূম্রজাল সৃষ্টি করে জনগণের ধাঁধার সৃষ্টি করা এবং মুক্ত চিন্তাভাবনার সুযোগ না দেওয়া:উপর্যুক্ত সন্দেহের বশীভূত হয়ে মুশরিকগণ মানুষদেরকে তাদের সাধ্যমতো কুরআন ও ইসলামের দাওয়াতের কথা শ্রবণ করতে বাধা প্রদান করত।তারা যখন দেখত যে,রাসুলুল্লাহ ﷺ লোকদের দ্বীনের পথে আহবান করছে বা সালাত আদায় করছে,কুরআন তেলাওয়াত করছে,তখন তারা মানুষদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিত,হইচই হই-হুল্লোড়, দাঙ্গা-হাঙ্গামা,হট্টগোল

পাকিয়ে দিত,গান গাইতো এবং নানা খেলতামাশায় মেতে উঠতো।এ বিষয়ে কুরআনের বাণী,

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لاَ تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ-

‘কাফিররা বলে-এই কুরআন শুনো না,আর তা পড়ার কালে শোরগোল করো যাতে তোমরা বিজয়ী হতে পারো।’(হা-মীম সাজদাহ ৪১:২৬)

অবস্থা এমন করে ফেলত যে রসুলুল্লাহ ﷺ সেখানে আর লোকদের কুরআন তেলাওয়াত শোনাতে পারতেন না।এই অবস্থায় পঞ্চম নবুওয়াতি বর্ষের শেষ অবধি চলে এলো।অনেক সময় রাস্তাঘাটে তার তিলাওয়াত করার উদ্দেশ্যে না থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ করে মুশরিকরা এমন হট্টগোল বাধাত।

৪.অন্যায় অত্যাচার:নবুওয়াতের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে অপবাদ,লাঞ্ছনা,গঞ্জনা,অপমান,ক্ষয়-ক্ষতি এসব কিছু সহ্য করতে হলেও অত্যাচার নির্যাতন কখনো সহ্য করতে হয়নি এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসুলুল্লাহর জন্য একটি বিশেষ সুরক্ষা।প্রথমে আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চাচা আবু তালিবের এর মাধ্যমে তাকে নিরাপত্তা দান করেন। আবু তালিবের মৃত্যুর পরেও আল্লাহ তাকে নিরাপদ রেখেছেন।তবে তার অনুসারী মুসলিমরা নানা রকম অত্যাচার নিপীড়নের শিকার হন।সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের প্রতি অত্যাচার তাকে প্রচন্ড পীড়া দিত,তিনি তাদের কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না।

## ☐ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ব্যাপারে মুশরিকদের অবস্থান:

তাদের প্রকৃত সমস্যা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ কে নিয়ে।কেননা ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন। বংশ মর্যাদার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন বৈশিষ্ট্যময় ব্যক্তিত্বের অধিকারী।শত্রু মিত্র পক্ষের কেউ তার নিকট আগমন করলে তাকে মান-মর্যাদা বা ইজ্জতের ভূষণে ভূষিত হয়েই সেখানে আগমন করতে হতো।কোন দুষ্টু দুরাচার কিংবা অনাচারের পক্ষে তার সম্মুখে কোন অশ্লীল বা জঘন্য কাজ করার মতো ধৃষ্টতা প্রদর্শন

কখনোই সম্ভব হতো না।রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপরযুক্ত গুনাবলী এবং ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য প্রসূত প্রভাব প্রতিপত্তির সঙ্গে যুক্ত হলো চাচা আবু তালিবের সাহায্য,সহযোগিতা ও সমর্থন।ব্যক্তিগত সমষ্টিগত উভয় ক্ষেত্রে আবু তালিব এত মর্যাদা সম্পন্ন এবং প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ছিলেন যে তার কথা অমান্য করা কিংবা তার গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর হস্তক্ষেপ করার মত দুঃসাহসিকতা কারোই ছিল না।এমন এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে অন্যান্য কুরাইশগণকে কঠিন দুশ্চিন্তা এবং টানা পোড়নের মধ্যে নিপতিত হতে হলো।সাত পাঁচ এজাতীয় নানা কথা নানা প্রশ্ন এবং নানা যুক্তি তর্কের প্রশ্ন নিয়ে তারা আবু তালিবের নিকট যাওয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।তবে তা খুব হিকমত ও নম্রতার সঙ্গে এবং মনে মনে চ্যালেঞ্জ ও প্রীতি প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা গোপন করে যাতে করে তাদের বক্তব্য আবু তালিব খুব সহজেই মেনে নেয়।কুরাইশ গোত্রের কয়েকজন নেতা একত্র হয়ে আবু তালিবের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন,"হে আবু তালিব,ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের দেব-দেবীগণকে গালিগালাজ করছেন,আমাদের ধর্মের নিন্দা করছেন আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি ও বিচার বিবেকহীন মূর্খ বলছেন এবং আমাদের পর পূর্বপুরুষগণকে ধর্মভ্রষ্ট বলছেন।অতএব,তাই আপনি তাকে এ জাতীয় কাজকর্ম থেকে বিরত রাখুন অথবা আমাদের এবং তার মধ্যে থেকে আপনি দূরে সরে যান।কারণ আপনিও আমাদের মতই তার বক্তব্য মতে ভিন্ন ধর্মের অনুসারী তার ব্যাপারে আমরাই আপনার জন্য যথেষ্ট হব।কুরাইশ প্রধানের এমন কঠোর বাক্য বিনিময় এবং আস্ফালনে আবু তালিব অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন।তিনি সেই মুহূর্তে তার কর্তব্য স্থির করতে না পেয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ কে ডেকে পাঠালেন।আবু তালিব তার নিকট কুরাইশ প্রধান গনের আলোচনা ও আচরণ সম্পর্কে সবিস্তার বর্ণনা করার পর তাকে লক্ষ্য করে বললেন,'বাবা! একটু বিচার বিবেচনা করে কাজ করো।যে ভার বহন করার শক্তি আমার নেই সে ভার আমার উপর চাপিয়ে দিও না।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ ধারণা করলেন মানব কূলের মধ্যে তার একমাত্র আশ্রয়দাতা ও সহায় চাচাও বোধহয় আজ থেকে তার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন এবং তাকে সাহায্য তাদের ব্যাপারেও তিনি বোধহয় দুর্বল হয়ে পড়লেন।তবুও আল্লাহ তা'য়ালার উপর অবিচল

আস্থা রেখে তিনি বললেন,"চাচাজান,আল্লাহর শপথ!যদি এরা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদ এনে দেয় তবুও শাশ্বত এ মহাসত্য প্রচার সংক্রান্ত আমার কর্তব্য থেকে এক মুহূর্তের জন্যও আমি বিচ্যুত হবো না।এ মহামহীন কাজে হয় আল্লাহ আমাকে জয়যুক্ত করবেন না হয় আমি ধ্বংস হয়ে যাব।কিন্তু চাচাজান!আপনি অবশ্যই জানবেন যে মুহাম্মদ ﷺ কখনোই কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবেন না।"।

## ☐ প্রথম হিজরত আবিসিনিয়া:

অন্যায় অত্যাচারের উল্লেখিত বিভীষিকাময় ধারা প্রক্রিয়া ও কার্যক্রম সূচিত হয় নবুওয়াত চতুর্থ বর্ষের মধ্যভাগে কিংবা শেষের দিক থেকে।জুলুম নির্যাতনের শুরুতের মাত্রা ছিল সামান্য।কিন্তু দিনের পর দিন মাসের পর মাস সময় যতই অতিবাহিত হতে লাগলো জুলুম নির্যাতনের মাত্রা ততই বৃদ্ধি পেতে পেতে পঞ্চম বর্ষের মধ্যভাগে তা চরম পৌছলো এবং শেষ পর্যন্ত এমন এক অবস্থা সৃষ্টি হলো যে মক্কার মুসলিমদের টিকে থাকা এক রকম অসম্ভব হয়ে উঠলো।তাই এই বিভীষিকার কবল থেকে পরিত্রান লাভের উদ্দেশ্যে তারা বাধ্য হলেন পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত হতে।অনিশ্চয়তা এবং দুঃখ-দুর্দশা এই ঘর অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে অবতীর্ণ হল যুমার।এতে হিজরতের জন্য ইঙ্গিত প্রদান করে বলা হয় যে,'আল্লাহর জমিন অপ্রশস্থ নয়।'

"হে ঈমানদারগন!তোমরা তোমাদের প্রতিপালকে ভয় কর।এই দুনিয়ায় যারা ভালো কাজ করবে তাদের জন্য আছে কল্যাণ।আল্লাহর জমিন প্রশস্ত (এক এলাকায় ইবাদত বন্দেগী করা কঠিন হলে অন্যত্র চলে যাও)আমি ধৈর্যশীলদের তাদের পুরস্কার অপরিমিতভাবে দিয়ে থাকি।"(আয-যুমার ৩৯:১০)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বহু পূর্ব থেকে আবিসিনিয়া সম্রাট আসহামা নাজাশীর উদারতা এবং ন্যায়পরায়ণতার সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।অধিকন্ত,সেখানে কারো প্রতি যে কোন অন্যায় অত্যাচার করা হয় না সে কথাও তিনি জানতেন।মুসলিম সেখানে গমন করলে নিরাপদে থাকার এবং নির্বিঘ্নে ধর্ম কর্ম করার সুযোগ লাভ করবে।এসব কিছু বিচার বিবেচনা

করে তাদের জীবন এবং ঈমানের নিরাপত্তা বিধান এবং নির্বিঘ্নে ধর্ম কর্ম করার সুযোগ লাভের উদ্দেশে হিজরত করে আবিসিনিয়ায় গমনের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগন রাদিয়াল্লাহু আনহুম কে নির্দেশ প্রদান করেন।এদিকে মুহাজিরগন সম্পূর্ণ নিরাপদে আবিসিনিয়ায় বসবাস করতে থাকলেন।

## □ কেন আবিসিনিয়া?ইরাক বা সিরিয়া কেন নয়?:

**প্রথমত**,রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই বলেছেন,'আবিসিনিয়ায় যাও,সেখানে এক রাজা আছেন যিনি কাউকে অত্যাচার করেন না।'।সুতরাং মুসলিমদের আল হাবাসা যাওয়ার পেছনে একটি প্রধান কারণ ছিল আন- নাজ্জাশীর ন্যায়পরায়ণতা।

**দ্বিতীয়ত**,আবিসিনিয়ানরা ছিল খ্রিস্টান আর মুসলিমরা তাদেরকে কুরাইশ মূর্তিপূজক বা পারস্যের অগ্নিপূজোকারীদের তুলনায় খ্রিস্টানদেরকে আপন মনে করত।

**তৃতীয়ত**,আন-নাজ্জাশী ও জাফরের যোগাযোগ করার ভাষা ছিল সম্ভবত আরবি।কিছু বর্ণনায় এসেছে,আন-নাজ্জাশী হিজাজে কিছু বছর কাটিয়ে ছিলেন,তাই তিনি আরবিতে কথা বলতে পারতেন।যদিও তিনি আরবে থাকতেন না কিন্তু আরব ও আবিসিনিয়ানদের মধ্যকার ব্যবসায়িক সম্পর্কের কারণে এটা অস্বাভাবিক নয় যে আবিসিনিয়ানরা আরবি বলতে বা বুঝতে পারতো।যেহেতু নাজ্জাশী কুরআন তিলাওয়াতের সময় কুরআনের বাণী শুনে কেঁদেছিলেন তার মানে নিশ্চয়ই তিনি আরবি আয়াতের অর্থ বুঝতে পেরেছিলেন।

আন-নাজ্জাশী মুসলিম হয়েছিলেন।তার ইসলামের প্রত্যাবর্তনের ঘটনা সবার কাছে গোপন রাখা হয়েছিল।তিনি জাফর ইবনে আবু তালিব থেকে গোপনে ইসলাম শিখতেন।যখন আন-নাজ্জাশী মারা গেলেন,বুখারীতে বর্ণিত আছে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,"আজকের দিনে আবিসিনিয়ার একজন পুণ্যবান মানুষ মারা গেছেন,আসো আমরা তার জন্য দোয়া করি।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য জানাযার সালাত পড়েছিলেন।আন-নাজ্জাশীর মৃত্যুর সঠিক দিন সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ জানতেন,জিবরাইল (আ)তাকে এ মৃত্যুর ব্যাপারে জানিয়েছিলেন যা প্রমাণ করে এটা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।আরেকটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘আল্লাহর কাছে আন-নাজ্জাশীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।’

## ☐ মক্কায় সাহাবীদের (রা) সাহসিকতার দৃষ্টান্ত:

**উসমান ইবন মাযউন রাদিআল্লাহু আনহু**-তিনি ছিলেন একজন মুহাজির।প্রথম হিজরতের পর তিনি আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় ফিরে আসতে চান।যেহেতু তিনি মক্কা ছেড়ে হিজরত করেছিলেন তাই কারো পক্ষ থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস ব্যতীত মক্কায় নিরাপদে প্রবেশ করতে পারছিলেন না।ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা তাকে নিরাপত্তা দান করল।সে ছিল মক্কার বয়স্ক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একজন।ওয়ালিদ ইবনে মুগীরার নিরাপত্তায় উসমান ইবনে মাযউন মক্কায় প্রবেশ করেন।মক্কায় ফিরে এসে আবিষ্কার করেন যে তিনি ছাড়া অন্য সব মুসলিমরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে!নিজের নিরাপদ জীবন তাকে এতটুকু খুশি করলো না মজলুম মুসলিমরা তাকে ঈর্ষান্বিত করে তুলল!তার কাছে মনে হলো তিনি বাদে অন্য সবার গুনাহ মাফ হয়ে যাচ্ছে আর তিনি কিছুই করতে পারছেন না।তাই তিনি ওয়ালিদ এর কাছে ফিরে গিয়ে বললেন যে তার নিরাপত্তার কোন দরকার নেই তিনি সেটা ফিরিয়ে দিতে এসেছেন।ওয়ালিদ বললেন,

-তুমি কেন এটা করছো?

-আমি শুধু আল্লাহর নিরাপত্তা চাই,তোমার নিরাপত্তা চাই না।

-ঠিক আছে যেহেতু আমি প্রকাশ্যে তোমাকে নিরাপত্তা দেয়ার কথা ঘোষণা করেছি,সেহেতু এই নিরাপত্তা ফিরিয়ে দেওয়ার ঘোষণা ও প্রকাশেই দিতে হবে।

তারা কাবা ঘরে গেলেন।আল ওয়ালিদ ইবন মুগীরা বলল,’উসমান ইবন মাযউন আমার নিরাপত্তা আর চায় না,সে ফিরিয়ে দিয়েছে।’উসমান ইবন মাযউন বললেন,’হ্যাঁ,আমি

ওয়ালিদ ইবন মুগীরাকে অত্যন্ত বিশ্বস্ত সৎ লোক হিসেবে পেয়েছি,কিন্তু আমি একমাত্র আল্লাহ নিরাপত্তার মধ্যে আসতে চাই।''

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল উসমান ইবনে মাযউন একটা সমাবেশে এসেছেন।সেখানে তখন আরবের বিখ্যাত কবি লাবীদ তার একটি কবিতা আবৃত করছিল।''আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই অসার!''

উসমান তাল মেলালেন,বললেন,''ঠিক!ঠিক! ও-ই সমাবেশে অনেক লোক জমা হয়েছিল।

কবি লাবীদ একটা ধাক্কা খেল।সে তার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না যে তার শ্রোতাদের মধ্যে কেউ এভাবে তার ভুল ধরিয়ে দেবে!কুরাইশদের উদ্দেশ্য বলল,'কে এই লোক?তোমাদেরকে এভাবে হেলো করার সাহসে কোথা থেকে পেল?'তাদের মধ্যে কেউ একজন বলল,'বাদ দিন,সে হচ্ছে এক মাথামোটা,মোহাম্মদের ধর্ম অনুসরণ করে।এর কথায় আপনি কিছু মনে করবেন না।উসমান ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন!তিনি এই কথার জবাব দিয়ে বসলেন।ব্যস!শুরু হয়ে গেল তাদের মধ্যে হাতাহাতি মারামারি এক পর্যায়ে কুরাইশরা উসমানের চোখে ঘুষি মেরে বসে।

একজন কাফের বা মুশরিক কিছু হারালে সেটা ক্ষতির খাতায় ফেলে দেয়,কষ্ট ব্যথা বেদনাকে ক্ষতি বাদে অন্য কোন নজরে দেখার ক্ষমতা তাদের নেই।কিন্তু একই ঘটনা একজন মুসলিমের জন্য সুসংবাদ।মার খেয়ে,ফোলা চোখ নিয়ে উসমান ইবনে মাযউন ভাবছেন ব্যথার বিনিময়ে কিছু গুনাহ মাফ হলো।এটাই মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি,ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি।

**আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-**

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু আবিসিনিয়ায় হিজরত করেননি।মক্কায় তাকে বেশ কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছিল।তাই তিনি রাসুলুল্লাহর কাছে হিজরতের অনুমতি চাইলেন।রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন।আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কা ছেড়ে ইয়েমেন গেলেন।সেখানে পৌঁছে তিনি সাইয়েদ আল হাবিশ গীত্রের কাছে যান।আল

হাবিশ মক্কার নিকটবর্তী একটা গোত্র।আবু বকর সেখানে ইবনে দুগায়নার সাথে দেখা করলেন।ইবন দুগায়না তাকে বললো,

-আবু বকর,তুমি কোথায় যাচ্ছো?

-আমার স্বজাতির লোকেরা আমাকে কষ্ট দিয়েছে, খুব খারাপ হবে আঘাত করেছে এ কারণে আমি চলে আসতে বাধ্য হয়েছি।

-তোমার মতো একজন মানুষ তো তার স্বজাতির একটা সম্পদ।এভাবে তো তুমি চলে আসতে পারো না।তুমি দুঃখীদের সাহায্য করো,গরিবদের প্রতি সহানুভূতিশীল।তারা তোমাকে তাড়িয়ে দিতে পারে না।তুমি মক্কায় ফিরে যাও,আমি তোমাকে নিরাপত্তা দেব।

তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে নিয়ে মক্কায় আসেন এবং মক্কার সমস্ত মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন,'আবু বকর আমার নিরাপত্তার মধ্যে আছেন।আমি বুঝি না এরকম একজন মানুষকে তোমরা কিভাবে দেশ থেকে তাড়িয়ে দাও?সে তোমাদের সম্পদ,তোমরা কিভাবে তার মত একটা মানুষকে তাড়িয়ে দিতে পারলে?আজকে থেকে তিনি এখানে থাকবেন এবং আমার নিরাপত্তার অধীনে থাকবেন।''

কুরাইশরা ইবনে দুগায়নার কাছে এসে বলল,'ঠিক আছে, আমরা তোমায় নিরাপত্তা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আমরা চাই না আবু বকর প্রকাশ ইবাদত করুক।সুতরাং দয়া করে এটা নিশ্চিত করো যে,সে এই কাজ করবে না।' তাই ইবনে দুগায়না আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে প্রকাশ্যে ইবাদত করতে মানা করেন।আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাজি হন।কিছুদিন পর আবু বকর তার বাড়িতে গোপনে ইবাদত করেন।কিন্তু এরপর তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে,তিনি তার বাড়ির উঠোনে একটি মুসল্লা বানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।তাই যদিও তিনি বাড়ির ভিতরেই ইবাদত করছিলেন কিন্তু লোকজন সেটা বাইরে থেকে দেখতে পেত।লোকজন জড়ো হয়ে তার ইবাদত দেখল।কুরাইশরা রেগে আবার ইবনে দুগায়নার কাছে গেলো।বলল,'আমরা তোমাকে বলেছি,আমরা চাই না সে প্রকাশ্যে ইবাদত করুক, কিন্তু সে তো সেটাই করছে!' ইবনে দুগায়না আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে এ কথা তুললে আবু বকর বললেন,'থাক,আমি

আপনার নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমার এর প্রয়োজন নেই।আমি আল্লাহর দেয়া নিরাপত্তায় থাকবো’ শেষ পর্যন্ত তিনি ইবনে দুগায়নার নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিলেন।

## ☐ বয়কট:

যখন কুরাইশরা আবিষ্কার করল ঈমানদারদের মধ্যে কিছু লোক আবিসিনিয়া হিজরত করে সেখানে নিরাপদে আছে আর মক্কায় ওমর ইসলাম গ্রহণ করেছেন,তারা বুঝতে পারল যে ইসলাম দ্রুততার সাথে প্রসার লাভ করতে শুরু করেছে।তারা সিদ্ধান্ত নিল যে রাসুলুল্লাহ ﷺ কে মেরে ফেলা ছাড়া আর কোন সমাধান নেই।মরিয়া হয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ উপর সামাজিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল।ইতিমধ্যেই তারা আনুষ্ঠানিকভাবে বনু হাশিম কে অনুরোধ করেছিল যেন মুহাম্মদকে তাদের হাতে হস্তান্তর করা হয়।স্বাভাবিকভাবেই বনু হাশিম কুরাইশদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।এরপর কুরাইশের বিভিন্ন গোত্র বনু হাশিম এবং বনু আল মুত্তালিব দুটো গোত্রের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করার ব্যাপারে চুক্তিতে আবদ্ধ হলো।তবে আবু লাহাব রাসুলুল্লাহর ﷺ আপন চাচা ও একই গোত্রের একজন হওয়া সত্ত্বেও তাকে বয়কট করা হয়নি,কারণ সে নিজেও ইসলামের একজন প্রধান শত্রু।

মাক্কী জীবনের সপ্তম বছরে মুহাররম মাসে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।চুক্তি অনুযায়ী বনু হাশিম ও বনু আল মুত্তালিব এর সাথে সকল প্রকার ব্যবসায়িক লেনদেন নিষিদ্ধ করা হয়।চুক্তিতে ঠিক হলো তাদের সাথে কোন বাণিজ্য করা হবে না,তাদের কাউকে কেউ বিয়ে করবে না অথবা তাদের কাছে কেউ বিয়ে দিবে না,যতক্ষণ না তারা মোহাম্মদকে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের হাতে হস্তান্তর করছে।

গোত্র দুটো চারদিক থেকে ঘেরাও করে রাখা।কুরাইশরা নিশ্চিত করতে চায় যেন বনু হাশিম ও বনু আল মুত্তালিব এর কাছে যেন কোন খাবার না পৌঁছে।কুরাইশদের উদ্দেশ্যে এই দুই গোত্রের উপর চাপ সৃষ্টি করে রাসুলুল্লাহ ﷺ কে তাদের হাতে তুলে

দিতে বাধ্য করা।কাবা ঘরের ভেতরে বয়কট চুক্তি দলিল টাঙিয়ে দেওয়া হয়।তবে দুই গোত্রের মাঝে সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।কঠিন সময়ও তারা একে অপরের পাশে দাঁড়াতো।পরিস্থিতি বেশ মারাত্মক আকার ধারণ করে।বনু হাশিম ও বনু আল মুত্তালিব গোত্রের নারী পুরুষ শিশু ক্ষুধায় কষ্ট পেতে থাকে।সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস সেই অবস্থা বর্ণনা করেন,"আমরা এত ক্ষুধার্ত ছিলাম যে গাছের পাতা খেয়ে বাঁচতে হতো"।বনু হাশিম ও বনু আল মুত্তালিবের অধিকাংশ লোক মুসলিম ছিল না। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে পুরো গোত্রের উপর ছিল।

**☐ বয়কটের অবসান:**

বয়কট চুক্তির বিরোধিতায় যে লোকটি উঠে দাঁড়ান তিনি হিশাম ইবনে আমর।তিনি ছিলেন বনো হাশিমের মাতৃসম্পর্কে ও আত্মীয়।চুক্তি বাতিল করার পিছনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।খাবারে বোঝাই একটি উট নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যেতেন,বনো হাশিম গোত্রের কাছাকাছি গেলে উটি ছেড়ে দিতেন যেন সেটা চড়তে চড়তে পাহাড়ের নিচে বনু হাশেম এর কাছে গিয়ে পৌঁছে,যেন খাবারগুলো তারা পায়।

একদিন যুহাইর ইবনে আবি উমাইয়ার কাছে গিয়ে বললেন,'যুহাইর!তোমার আপন মামারা নিদারুণ যন্ত্রণায় প্রতিটি মুহূর্ত কাটাচ্ছে,আর তুমি খেয়ে-পড়ে আনন্দের মধ্যে বসে আছো কিভাবে?আমি শপথ করে বলছি যদি মানুষগুলো আবুল হাকামের নিজের মামা হতো,সে তাদের সাথে কখনো এরকম করত না।' যুহাইর ইবন আবি উমাইয়া জবাব দিলেন,

-তুমি আমাকে দোষারোপ করছো?আমি একা একজন মানুষ আমি কি করতে পারি বলো?আল্লাহ শপথ,যদি আমার পাশে আর একটি লোক থাকতো,আমি নিষেধাজ্ঞার দলিল বাতিল করে আসতাম।

-বেশ,তোমার সাথে একজন আছে,হিশাম জানালেন।

-কে সে?

-আমি আছি তোমার সাথে।

-তাহলে চলো তৃতীয় একজনকে খুঁজে বের করি।

হিশাম তৃতীয় একজনকে খোঁজ করতে বেরিয়ে গেলেন।দেখা পেলেন মুতইম ইবন আদীর,চতুর্থজন কেউ এভাবে খুঁজে পাওয়া গেল তিনি হলেন আবুল বাখতারী।

পরদিন সকালে যুহাইর ইবনে আবি উমাইয়া এক বিশেষ পোশাক পরে কাবা ঘরে তাওয়াফ করলেন। সময়টি ছিল কুরাইশ নেতাদের সাক্ষাতের সময়।তাদের এই সমাবেশ হত আন নাদওয়াতে।যুহাইর সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন,

“হে কুরাইশের লোকসকল!তোমাদের কি খুব আনন্দ হচ্ছে যে তোমরা ভালো খেয়ে-পড়ে আরাম-আয়াশে সেদিন কাটাচ্ছো,ওদিকে বনু হাশিম আর বনু মুত্তালিব দুর্দশার জীবন পার করছে?আল্লাহ শপথ করে বলছি এই দলিল ছেড়ার আগ পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হবো না।”

পূর্ব পরিকল্পনার মতে,ওই পাঁচজনের দ্বিতীয় ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,’হ্যাঁ!আমিও কখনোই এই দলিলের সাথে একমত ছিলাম না।’এরপর তৃতীয় জন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,’আমি শপথ করে বলছি আমি এই দলিলের সাথে নেই এবং আমি এ ধরনের যুক্তির অংশ হতে চাই না”।এরপর চতুর্থ জন দাঁড়িয়ে নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে কথা বলল এবং সবশেষে হিশাম ইবনে আমর উঠে দাঁড়িয়ে কথা বললেন।

তখন আবু জাহেল উঠে দাঁড়িয়ে বললো,’এই ঘটনা সাজানো,তোমরা রাতে এসব পরিকল্পনা এঁটেছিলে!’ কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়, বিষয়টি নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল,দলিল ছেড়ার জন্য আল মুতইম ইবনে আদী কাবা ঘরের দিকে ছুটে যান।তিনি আবিষ্কার করলেন সেই দলিলটি ইতিমধ্যে উইপোকা খেয়ে ফেলেছে শুধুমাত্র “আমাদের রবের নামে” এই বাক্যটি ছাড়া!

দুই বা তিন বছর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকার পর এভাবেই নাটকীয়তার সাথে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।উইপোকা দলিল খেয়ে ফেলা একটি বিষয় ইঙ্গিত করে তা হলো,আল্লাহর সৈনিকরা সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে এমনকি উইপোকা ও আল্লাহর সৈনিক হতে পারে।

"কেউ জানেনা আল্লাহর সৈনিকের ব্যাপারে কিন্তু একমাত্র তিনিই জানেন।"

(সূরা আল মুদ্দাসিসর,৭৪:৩১)

## ☐ শোকের বছর:

### ♣আবু তালিবের মৃত্যু:

বার্ধক্য,দুশ্চিন্তা,অনিয়ম ইত্যাদি নানাবিধ কারণে আবু তালিব এর অসুস্থতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সহীহ বুখারীতে মুসাইইব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,আবু তালিবের মৃত্যুর সময় হলে রাসুলুল্লাহ ﷺ তার নিকটে আগমন করে সেখানে আবু জাহল ও উপস্থিত ছিল।রাসুলুল্লাহ ﷺ আবু তালিবের পাশে বসে বললেন,

'চাচা,আপনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন।আপনি স্বীকার করে নিন আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আপনি আমাকে এ কথাগুলো বলে যান যেন আমি শেষ বিচারের দিন আপনার পক্ষ হয়ে আল্লাহর কাছে সাক্ষ্য দিতে পারি।আপনার শাস্তি মওকুফের জন্য আমার রবের কাছে আবেদন করতে পারি আপনি শুধু বলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ,এছাড়া আমি আপনার কাছে আর কিছুই চাই না।'

আবু জাহল এবং আব্দুল্লাহ বিন উমাইয়া বলল,আবু তালিব আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম হতে কি তাহলে শেষ পর্যন্ত বিমুখ হয়েই যাবেন?তারপর এরা উভয়েই অবিরাম তার সঙ্গে কথা বলতে থাকে।সবশেষে আবু তালিব যে কথাটি বলছিলেন তা হচ্ছে,'আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর"। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,'আমি যতক্ষণ বাধা প্রাপ্ত না হব ততক্ষণ আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবো'এই প্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, 'নবী ও মুমিনদের জন্য এটা শোভনীয় নয় যে,তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে তারা আত্মীয়-স্বজন হলেও,যখন এটা তাদের কাছে সুস্পষ্ট যে,তারা জাহান্নামের অধিবাসী।' (সূরা তাওবাহ ৯:১১৩)

রাসুলুল্লাহ ﷺ কে আবু তালিব এর জন্য দোয়া করতে নিষেধ করা হলো।রাসূলুল্লাহ ﷺ তার চাচাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার জন্য বারবার অনুরোধ করছিলেন।কিন্তু তার চাচার কথা ছিল ‘কুরাইশরা যদি আমাকে এ ব্যাপারে অপমান না করতো তারা যদি না বলত যে আমি মৃত্যুর ভয় কালেমা পাঠ করেছি তবে তোমাকে খুশি করার জন্য আমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতাম।’

আরো অবতীর্ণ হয়,

“তুমি যাকে ভালোবাসো তাকে সৎ পথ দেখাতে পারবে না।তবে আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সৎ পথে আনয়ন করেন।কে সৎ পথে আসবে,সে সম্পর্কে তিনি ভালো জানেন ” (সূরা ক্বাসাস ২৮:৫৬)

হেদায়েত শুধুমাত্র আল্লাহর হাতে।কে হেদায়েত পাবে তা শুধু তিনি নির্ধারণ করেন।এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও এ ব্যাপারে কিছুই করার ছিল না। তার কাজ ছিল কেবল আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া।কোনো ব্যক্তির অন্তর কে পরিবর্তন করার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলারই রয়েছে,কোন মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব নয় কারণ ঈমান আনার ব্যাপারে কারো উপর কোন ধরনের জবরজস্তি বা বাধ্যবাধকতা ইসলাম সমর্থন করে না।

কারোর অন্তরে কোন কিছু জোর করে চাপিয়ে দেয়া যায় না।কে কোন ধর্ম গ্রহণ করবে সে ব্যাপারে প্রত্যেককে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দেওয়া হয়েছে আর এই ইচ্ছা শক্তিকে কিভাবে ব্যবহার করলো তার জন্য সবাইকে আল্লাহ তায়ালা সামনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

### ☐ আল্লাহর অনন্ত রহমতের পথে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা:

আবু তালিবের মৃত্যুর দু মাস পর খাদীজাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা মৃত্যুমুখে ও পতিত হন।তার মৃত্যু নবুয়াত দশম বর্ষে রমযান মাসে।মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন অতিবাহিত করেছিলেন তার জীবনের ৫০ তম বছর।এক মৃত্যুর শোক কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যু আরও একটি দুঃখময়

ঘটনার মুখোমুখি হতে হয় প্রিয় নবী রাসুলুল্লাহ ﷺ কে।তাই এ বছরকে বলা হয় শোকের বছর।

এ বছরটি ছিল তার জীবনের সবচেয়ে কষ্টকর বছর,কারণ ওই সময় তিনি তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অপ্রিয় দুইজন মানুষকে হারিয়েছেন।তারা দীর্ঘদিন ধরে রাসুলুল্লাহ ﷺ কে তার দায়িত্ব পালনে সর্বতোভাবে সাহায্য করে আসছিলেন।খাদীজাহ রাদিআল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে যেমন মানসিকভাবে সমর্থন যুগিয়েছেন ঠিক তেমনি নিজের ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দিয়ে তাকে সাহায্য করেছেন।অন্যদিকে,আবু তালিব রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কুরাইশদের অত্যাচার ও ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন।যে দুজন মানুষ সুখে-দুখে,বিপদে আপদে,তার পাশে দাঁড়িয়েছে,তাকে সমর্থন দিয়েছেন,তারা হঠাৎ করেই চলে গেলেন এ দুনিয়া থেকে।শুধু তাই নয়,সে বছরে কুরাইশের ইসলাম বিরোধীতার মাত্রা ও বেড়ে গেল।

আবু তালিব যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন রাসুলুল্লাহ ﷺ তেমন গুরুতর কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়া ই ইসলাম প্রচার করতে পেরেছিলেন।কিন্তু আবু তালেবের মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহর ﷺ পক্ষে আগের মত দাওয়াতের কাজ চালানো কঠিন হয়ে পড়ে।কুরাইশদের বিভিন্ন কটুক্তি অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে তিনি যখন ক্লান্ত অবস্থায় বাড়ি যেতেন,তখন তার পাশে থাকবেন খাদিজা রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা।তিনি তাকে সাহস ও স্বস্তি দিয়েছেন,জীবনের কঠিনতম মুহূর্ত গুলো রাসুলুল্লাহ ﷺ তার প্রিয় স্ত্রীকে পাশে পেয়েছিলেন।কিন্তু খাদীজাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার মৃত্যুর পর তিনি একেবারেই একা হয়ে পড়েন।খাদীজাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার মৃত্যুর পর রাসূলাল্লাহ ﷺ প্রায় দুই তিন বছর পর্যন্ত বিয়ে করেনি তখন তিনি বেশ কঠিন সময়ের মধ্যে ছিলেন।

## ❑ মক্কা ভূমির বাইরে ইসলামের দাওয়াত

### ♣ত্বায়িফে রাসুলুল্লাহ ﷺ

আবু তালিবের মৃত্যুর সাথে সাথে রাসুলুল্লাহ ﷺ তার নিরাপত্তার ঢাল টি হারিয়ে ফেলেন।মক্কা ইসলামী দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।এই অবস্থায় তিনি মক্কার বাইরে দাওয়াতের কাজ সম্প্রসারণ করার চেষ্টা করতে লাগলেন।রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিতে তায়েফে যান।তার সাথে ছিল যায়েদ ইবনে হারিসা (রা)।রাসুলুল্লাহ ﷺ তাইফের নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠীর সাক্বীফের নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন।তারা ছিল তিন ভাই।রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করলেন,তাদের সমর্থন ও সাহায্য কামনা করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আহবানে তিনজন লোকের প্রতিক্রিয়া ছিল রীতিমতো জঘন্য।প্রথমজন বললো,'তুমি যদি আল্লাহর প্রেরিত নবী হয়ে থাকো তাহলে আমি কাবা ঘরের গিলাব ছিড়ে ফেলবো' ।কাবার গিলাফ তাদের কাছে খুবই পবিত্র ছিল।দ্বিতীয় জন বলেছিল,'আল্লাহ কি তোমার চেয়ে ভালো আর কাউকে পেলেন না?' আর তৃতীয় ভাই বলেছিল,'তোমার সাথে আমি কোন কথাই বলবো না।যদি তুমি সত্যিই নবী হয়ে থাকো তাহলে আমি মনে করি না তোমার সাথে কথা বলার যোগ্যতা আমার আছে।আর যদি তুমি আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত রাসূল না হয়ে থাকো তাহলে তুমি মিথ্যাবাদী এবং আমার পক্ষে কোন মিথ্যুকের সাথে কথা বলা সম্ভব না।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে দশ দিন অবস্থান করলেন,দশ দিন ধরে তিনি তাইফের শীর্ষ স্থানীয় লোকদের কাছে যান এবং প্রত্যেকে দ্বীনের দাওয়াত দেন কিন্তু তাদের এক কথা,'বের হয়ে যাও'।তাদের প্রতিক্রিয়া দেখে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন,'ঠিক আছে,আপনারা যদি আমার আহবানে সাড়া না দেন সেটা আপনাদের ব্যাপার। তবে আমি চাই আমাদের মধ্যে যে আলাপ হয়েছে তা আপনারা মক্কার লোকদের কাছে গোপন রাখবেন''

কিন্তু এই সাক্বিফের লোকেরা ছিল এতটাই খারাপ যে তারা কিছু উশৃংখল ছেলেপেলেকে রাসুলুল্লাহর ﷺ এর পেছনে লেলিয়ে দিল।তারা গালাগাল করতে করতে রাসুলুল্লাহ ﷺ ও যায়েদ ইবনে হারিসাকে লক্ষ্য করে পাথর ছুটতে লাগল,তাদেরকে ধাওয়া করতে লাগলো।রাসূলুল্লাহ ﷺ কে পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য যায়েদ ইবনে হারিসা নিজের শরীরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।দৌড়াতে দৌড়াতে তারা একটি আবাদি জমিতে গিয়ে আশ্রয় নেন।রাসূলুল্লাহ ﷺ গুরুতর আহত।তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন সাক্বীফের অধিবাসীদের পাথরের আঘাতে তার দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছিল,তার পায়ের রক্তে দ্রুত ভিজে গিয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আশ্রয় নেন মক্কার একটি বাগানে, তিনি দেয়ালে হেলান দিয়ে আঙ্গুর গাছের ছায়া বসলেন।তার মন প্রচন্ড খারাপ,তাইফে তিনি এভাবে প্রত্যাখ্যাত হবেন আশা করেননি।প্রচন্ড কষ্ট আর মনোবেদনা থেকে তিনি আল্লাহর কাছে হাত তুলে দোয়া করলেন,অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী আর আবেগময় একটি দোয়া,যা মুস্তাদআফিনে দোয়া নামে পরিচিত।

‘হে আল্লাহ,আমি তোমার কাছে আমার দুর্বলতা, অসহায়ত্ব এবং মানুষের কাছে আমার মূল্যহীনতা সম্পর্কে অভিযোগ করছি।দয়ালু দাতা,তুমি দুর্বলদের রব,তুমি আমারও রব,তুমি আমাকে কার কাছে ন্যস্ত করছো?আমাকে কি এমন কারো কাছে ন্যস্ত করছো যে আমার সাথে রুক্ষ ব্যবহার করবে?নাকি কোন শত্রু হাতে ন্যস্ত করছো যাকে তুমি আমার বিষয়ে মালিক করে দিয়েছো?যদি তুমি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না হও তবে আমার কোন দুঃখ ও নেই,আফসোস ও নেই।তোমার ক্ষমাশীলতা আমার জন্য প্রশস্ত ও প্রসারিত করো। আমি তোমার ক্রোধ ও অভিশাপ থেকে তোমার সেই আলো আশ্রয় চাই যা ধারা সকল অন্ধকার দূর হয়ে যায়।দুনিয়া ও আখিরাতে সকল বিষয় তোমার হাতে ন্যস্ত।সকল ক্ষমতা এবং শক্তি শুধু তোমারই তোমার শক্তি ছাড়া আর কোন শক্তি নেই।’

আল্লাহ তাআলা এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য সাহায্য পাঠান।রাসূলুল্লাহ ﷺ সে সময় বেশ ক্ষুধার্ত ছিলেন।তার এই অবস্থা দেখে সেই আবাদি জমির মালিকেরা তার প্রতি

সহানুভূতিশীল হয়।তারা তাদের খ্রিস্টান ক্রীতদাসকে আদ্দাস কে আদেশ ছিল যেন সে মোহাম্মদকে ﷺ কে কিছু আঙ্গুর খেতে দেয়।এ জমির মালিকরা ছিল মক্কা থেকে আগত।তারা রাসুলুল্লাহর ﷺ বিরোধী মতাদর্শের ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও এক এলাকার লোকের মানুষ হওয়ায় তারা সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সাহায্য করা সিদ্ধান্ত নেয়।

এদিকে ক্রিস্টান ক্রীতদাস আদ্দাস রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য আঙ্গুর নিয়ে যায়।রাসুলুল্লাহ ﷺ খাওয়ার পূর্বে বললেন,''বিসমিল্লাহ' আদ্দাস বেশ অবাক হলেন।তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বললেন,'আপনি যা বললেন তা এই দেশের লোকেরা বলে না' ।রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পেরেছিলেন যে আদ্দাস একজন ভিনদেশী এবং অন্য ধর্মের অনুসারী।তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন,'তুমি কোথা থেকে এসেছ?তোমার দ্বীন কী?''আদ্দাস উত্তর দিল,আমি খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী।আমার বাড়ি ইরাকের নিনেভাতে।''এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,'তুমিতো ইউনূস ইবনে মাত্তার গ্রাম থেকে এসেছো তিনি আল্লাহ তায়ালার নবী ছিলেন।''আদ্দাস বললো,'আপনি কিভাবে মাত্তার পুত্র ইউনুস সম্পর্কে জানলেন?' ।রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন,'তিনি আমার ভাই' ।তিনি একজন নবী ছিলেন আর আমিও একজন নবী।এ কথা শোনা মাত্র আদ্দাস সম্মানবশত নিচু হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পায়ে চুম্বন করে।এরপর তার হাত ও মাথায় চুম্বন করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খ্রিষ্টান ক্রীতদাস আদ্দাসের মধ্যকার ঘটনাটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।একজন মুসলিমের সাদাসিধে এবং একটি আমল ও যে দাওয়াতের আমলে রূপান্তরিত হতে পারে এই ঘটনা তার একটি চমৎকার উদাহরণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাইফবাসীর কাছে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখন কেউ তার ডাকে সাড়া দেয়নি,উল্টো তাকে বের করে দেয়।কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ একটি কথা বলে গেছেন,'ভাল কাজ করে যাও,কেননা তুমি কখনোই জানো না তোমার কাজের ফলাফল অর্থাৎ একটি ভাল কাজ কারো চোখে হয়তো তুচ্ছ লাগতে পারে কিন্তু সেই কাজের ফলাফল হতে পারে অনেক বড় কিছু আর সেটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না তাই কোন সৎকাজ কেই তুচ্ছ করা উচিত নয়।

## ▢ আল ইসরা ওয়াল মিরাজ:কষ্টের সাথে আছে স্বস্তি

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর তাবলীগ ও দাওয়াতের কৃতকার্যতা এবং অন্যায় ও উৎপীড়নের মধ্য পর্যায়ে অতিক্রম করে চলছে। সুদূর আকাশের প্রান্তে আশার ক্ষীণ আলো এবং ধূলিযুক্ত ঝলক দৃষ্টি গোচর হতে আরম্ভ করেছে। ঠিক এমন সময়ে নৈশ ভ্রমণ ও উর্ধ্বগমনের ঘটনাটি সংঘটিত হয়। (একে আরবী ভাষায় বলা হয় মি'রাজ এবং এ নামেই ঘটনাটির সমধিক প্রসিদ্ধ রয়েছে)।

মি'রাজের এ বিশ্ববিশ্রুত অলৌকিক ঘটনাটি কোন সময় সংঘটিত হয়েছিল সে ব্যাপারে জীবনচরিতকারগণের মধ্যে যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায় তা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল,

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ কে যে বছর নবুওয়াত প্রদান করা হয়েছিল সে বছর মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল (এটা তাবারীর কথা)।

২. নবুওয়াতের পাঁচ বছর পর মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল (ইমাম নাবাবী এবং ইমাম কুরতুবী এ মত অধিক গ্রহণযোগ্য বলে স্থির করেছেন)।

৩. দশম নবুওয়াত বর্ষের ২৭শে রজব তারীখে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল। (আল্লামা মানসূরপুরী এ মত গ্রহণ করেছেন)।

৪. হিজরতের ষোল মাস পূর্বে, অর্থাৎ নবুওয়াত দ্বাদশ বর্ষের রমযান মাসে মি'রাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

৫. হিজরতের এক বছর দু'মাস পূর্বে অর্থাৎ নবুওয়াত হয়েছিল। ত্রয়োদশ বর্ষের মুহাররম মাসে মি'রাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

৬. হিজরতের এক বছর পূর্বে অর্থাৎ নবুওয়াত ত্রয়োদশ বর্ষের রবিউল আওয়াল মাসে মি'রাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ইবনুল কাইয়্যেম লিখেছেন প্রাপ্ত তথ্যাদি মোতাবেক প্রকৃত ব্যাপারটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সশরীরে বুরাকের উপর আরোহন করিয়ে জিবরাঈল (আ) মসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে অবতরণের পর সেখানে সমাগত নাবীগণ (আ)এর জামাতে

ইমামত সহকারে সালাত আদায় করেন এবং বুরাককে মসজিদের দরজায় আংটার সঙ্গে বেঁধে রাখেন। সালাত আদায়ের পর পুনরায় তাঁকে বুরাকে আরোহন করিয়ে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য প্রথম আসমানের দরজা খোলার আবেদন জানালে দরজা খোলা হল। সেখানে মানুষের আদি পিতা আদম (আ)এর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানান। আদম (আ) আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে সালামের জবাব দিয়ে তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করলেন এবং আল্লাহ তা'আলা ডান দিকে আল্লাহর নেককার বান্দাগণের এবং বাম দিকে বদকার বান্দাগণের আত্মসমূহ তাঁকে প্রদর্শন করালেন।

এরপর তাঁকে দ্বিতীয় আসমানে নিয়ে যাওয়া হল। দরজা খোলা হলে সেখানে ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া এবং ঈসা বিন মরিয়ম (আ)এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পরিচয় পর্বের পর তিনি তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানান। উভয়েই সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারাকবাদ ও উষ্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে

তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করেন। তৃতীয় পর্যায়ে তাঁকে তৃতীয় আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ইউসুফ (আ)এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানান। তিনিও সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মোবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করেন। তারপর তাঁকে চতুর্থ আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি ইদরীস (আ) কে দেখেন এবং শ্রদ্ধাভরে সালাম জানান। তিনি সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মোবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করেন।

আসমানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তিনি হারুন বিন ইমরান (আ) কে দেখতে পান এবং তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানান। তিনি যথারীতি সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মোবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করেন।

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কে ৬ষ্ঠ আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মূসা বিন ইমরান (আ)এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানিয়ে কুশলাদি বিনিময়

করেন। মূসা (আ) সম্ভ্রমের সঙ্গে সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মোবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করেন।

অগ্রযাত্রার পরবর্তী পর্যায়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সপ্তম আসমানে। সপ্তম আসমানে তাঁর সাক্ষাৎলাভ হয় ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-এর সঙ্গে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম ও মোবারকবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনিও সসম্ভ্রমে সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মোবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর তাকে সিদরাতুল মুনতাহায় উঠিয়ে নেয়া হয়। তথাকার কূল বৃক্ষের এক একটা ফল 'হাজার' অঞ্চলের কুল্লাহ'র ন্যায়। আর তার পত্র-পল্লবগুলো হাতির কানের মতো। অতঃপর সেই বৃক্ষকে স্বর্ণের প্রজাপতি, জ্যোতি ও বিভিন্ন বিচিত্র রং আচ্ছন্ন করে ফেলল। ফলে তা এমন রূপে পরিবর্তীত হলো যে, কোন সৃষ্টির পক্ষেই তার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

চলার শেষ পর্যায়ে তাঁকে বায়তুল মা'মুরে নিয়ে যাওয়া হয়। এ বায়তুল মা'মূর এমন এক ঘর যাতে প্রত্যেক দিন সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে। অতঃপর তারা আর সেখানে দ্বিতীয়বার প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করেনা। এরপর তিনি ﷺ জান্নাতে প্রবেশ করেন। সেখানে রয়েছে মোতি নির্মিত রশি,জান্নাতের মাটি হলো মেশক নামক সুগন্ধির তৈরি।অতঃপর তাঁর নিকট এমন বিষয় পেশ করা হয় যে,শেষ পর্যন্ত তিনি কলমের খসখস শব্দ শুনতে পান।

সর্বনিম্ন আসমানের তুলনায় কুরসি কতটা বিশাল তার কোনো ধারণাই মানুষের নেই। আমরা যে দুনিয়ায় আছি তা সর্বনিম্ন আসমানের মধ্যে অবস্থিত, কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আমরা সর্বনিম্ন আসমানকে নক্ষত্ররাজি দিয়ে সজ্জিত করেছি", অর্থাৎ সমস্ত নক্ষত্ররাজি সর্বনিম্ন আসমানে অবস্থিত, আর সমস্ত নক্ষত্ররাজির সর্বশেষ সীমানায় মানুষ এখনো পৌঁছতে পারেনি। আর রাসূলুল্লাহ এই সুবিশাল সৃষ্টি দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। এটি ছিল অসাধারণ এক সফর। সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম করে

সামনে যাওয়ার পর তিনি আরো ওপরে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এটাই ছিল তাঁর ভ্রমণের চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আমি ফিরে আসছিলাম, পথিমধ্যে মূসার (আ) সাথে দেখা। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ আপনাকে কী বলেছেন? আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা আমার উম্মাতকে প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার হুকুম দিয়েছেন। মূসা বললেন, আপনার উম্মত তা পালন করতে পারবে না। আমি আপনার আগে অনেক লোককে দেখেছি এবং আমার ক্বওম বনী ইসরাইলের সাথে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি। মানুষের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা আছে। আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে যান, সালাতের সংখ্যা কমিয়ে দিতে বলুন যাতে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ রাসূলের কথা অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, 'সালাতের সংখ্যা কিছু কমিয়ে দিন।' আল্লাহ তাআলা সালাতের সংখ্যা দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। মুহাম্মাদ ﷺ নতুন নির্দেশ নিয়ে নিচে নেমে আসছিলেন। তাঁর সাথে আবার মূসার দেখা হলো। মূসা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে?', রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে খুলে বললেন । তখন মূসা বললেন, 'আবার ফিরে যান। সালাতের সংখ্যা আরও কিছু কমিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলাকে বলুন।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার আল্লাহ তাআলার কাছে গেলেন, আরও দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দেওয়া হলো। ফিরতি পথে মূসা তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জানালেন যে, আল্লাহ তাআলা সালাতের সংখ্যা কমিয়ে তিরিশ ওয়াক্তের নির্দেশ দিয়েছেন। মূসা সালাতের সংখ্যা আরও কমিয়ে আনার জন্য ফিরে যেতে বললেন। মুহাম্মাদ আবারও ফিরে গেলেন এবং আরও দশ কমিয়ে দেওয়া হলো। মূসা একথা শুনে আবারও ফিরে যেতে বললেন। এবার কমিয়ে দশ ওয়াক্ত করা হলো। মূসার উপদেশ অনুযায়ী মুহাম্মাদ আবার গেলেন। এবার কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারণ করা হলো। তিনি ফিরে এসে মূসাকে তা জানালেন। মূসা বললেন, 'মুহাম্মাদ, মানুষ সম্পর্কে আমার অনেক অভিজ্ঞতা আছে, আমি বনী ইসরাইলের সাথে ছিলাম। আপনার

উম্মাতের জন্য এটাও কষ্টকর হবে। আপনি আবার ফিরে যান এবং আরও কমিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলাকে অনুরোধ করুন।' মুহাম্মাদ ﷺ বললেন, 'আবার অনুরোধ করতে আমি লজ্জাবোধ করছি। আমি আর পারব না।'।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মিরাজের রাতে আল্লাহ তা আলার সাথে দেখা করেন।এবং দ্বিতীয় বারের মতো জিবরাইল (আ) সাথে সিদরাতুল মুনতাহায় নিকট আসল রুপে দেখা করেন।সেই একই রাতে রাসুলুল্লাহ ﷺ দুনিয়াতে ফিরে আসেন।

## ☐ আক্কাবাহর প্রথম বায়আত (আনুগত্যের শপথ):

আক্কাবার অর্থ পাহাড়ের সুরঙ্গ বা সংকীর্ণ পাহাড়ি পথ।মক্কা থেকে মিনায় যাতায়াতের জন্য মিনার পশ্চিম দিকে একটি সংকীর্ণ পাহাড়ি পথ দিয়ে যাতায়াত করতে হতো।এই সুরঙ্গ পথের স্থানটি একা বা নামে প্রসিদ্ধ।

বাইয়াতের প্রথম শপথ সেই ছয়জন পুণ্যবান লোক ইসলাম গ্রহণ করলো এবং তারা রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললো, 'আমরা দেশে ফিরে গিয়ে আমাদের লোকদের ইসলামের পথে আসার জন্য আহ্বান করবো।' মদীনায় ফিরে যাওয়ার আগে তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে পরের বছর হাজ্জের মৌসুমে দেখা করার কথা দিল। বছর ঘুরে আবার ফিরে এল হাজ্জের মৌসুম।এবার ছয়জনের পরিবর্তে এলো বারোজন, ছয়জন ছিল আগের বছরের আর বাকি ছয়জন নতুন। প্রথম বছরে ইসলাম গ্রহণকারী ছয়জন ছিলেন আল খাযরাজ গোত্রের; অন্য আরেকটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে পাঁচজন ছিলেন আল খাযরাজ গোত্রের আর বাকি একজন এসেছিলেন আল আওস থেকে। দ্বিতীয় বছরে আল খাযরাজ থেকে ছিলেন দশজন এবং আল আওস থেকে দুইজন। তাঁরা রাসূলুল্লাহর কাছে এসে বাইয়াত দিলেন। বাইয়াতের ভাষ্য ছিল এমন:

'আক্কাবার প্রথম বৈঠকের রাতে রাসূলুল্লাহর কাছে এই মর্মে বাইয়াত দেওয়া হয় যে, আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবো না। আমরা ব্যভিচারের ধারে কাছে যাবো না,সন্তান হত্যা করবো না, কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেব না এবং ভালো কাজে

তাঁর বিরোধিতা করবো না। তিনি আমাদেরকে বলেছেন, যদি তোমরা এগুলো মেনে চলতে পার তাহলে জান্নাতে যেতে পারবে। আর যদি কোনো পাপ করে ফেল এবং সেই পাপের শাস্তি যদি এই দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেই পাপ মাফ করে দেওয়া হবে। কিন্তু যদি দুনিয়াতে পাপের শাস্তি না দেওয়া হয় তাহলে আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে ওই পাপের জন্য শেষ বিচারের দিন শাস্তি দিতেও পারেন আবার ক্ষমাও করে দিতে পারেন।'

**আক্বাবার দ্বিতীয় শপথ:**

ইসলামের প্রথম বায়াত অনুষ্ঠিত হয়েছিল আল-আক্বাবায়, এই ঘটনা বায়াত আল উলা নামে পরিচিত। মদীনায় ইসলাম প্রচারে মুসআব ইবন উমায়ের অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে মানুষ সেখানে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে এবং পরবর্তী হাজ্জ মৌসুম চলে আসার আগে এমন অবস্থা হয় যে মদীনার প্রতিটি বাড়িতে একজন হলেও ইসলাম গ্রহণ করে। হাজ্জের সময় রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে মদীনার নও-মুসলিমদের সাক্ষাতের নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে আসলো। সত্তরের অধিক মুসলিম নিজ গোত্রের লোকেদের সাথে হাজ্জের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। মদীনা থেকে আসা প্রতিনিধি দলটির সাথে মুসলিম ও অমুসলিম উভয়েই ছিল। যদিও গোপন বৈঠকটি ছিল শুধুমাত্র মুহাম্মাদ ও মুসলিমদের মধ্যে, কিন্তু তাঁরা মদীনা থেকে যাত্রা করার সময় তাঁরা তাদের গোত্রের অমুসলিম সদস্যদের সাথে একসাথে এসেছেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে সাক্ষাত করতে আসে সত্তরের অধিক মুসলিম পুরুষ ও দুইজন মুসলিম নারী।

**বাইয়াতের দফাসমূহ-**

ইমাম আহমদ জাবির (রা) হতে বাইয়াতের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। জাবির বলেছেন, 'আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার নিকট কোন শপথ গ্রহণ করব?' তিনি বললেন, 'তোমরা যে কথার উপর শপথ গ্রহণ করবে তা হচ্ছে,

১. সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় কথা শুনবে ও মেনে চলবে।

২. অভাবে ও স্বচ্ছলতায় একই ধারায় খরচ করবে।

৩. ভাল কাজের জন্য আদেশ করবে এবং মন্দকাজ থেকে বিরত থাকতে বলবে।

৪. আল্লাহর পথে দণ্ডায়মান থাকবে এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরওয়া করবে না।

৫. যখন আমি তোমাদের নিকট হিজরত করে যাব তখন আমাকে সাহায্য করবে এবং যেমনভাবে আপন জান মাল ও সন্তানদের হেফাজত করছ সেভাবেই আমার হেফাজত করবে। এ সব করলে তোমাদের জন্য জান্নাত রয়েছে।

## ☐ হিজরতের সর্বপ্রথম বাহিনী:

'আকাবার দ্বিতীয় অঙ্গীকার যখন সুসংবাদ ও সুসংগঠিত রূপ লাভ করল তখন নাস্তিকতা ও মূর্খতার তৃণ শ শস্য বিহীন মরুভূমিতে ইসলাম মহীরূহের ভিত্তিমূল বহুলাংশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠল। ইসলামী দাওয়াতের জন্মলগ্ন হতে অদ্যাবধি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যতটা সফলতা অর্জন সম্ভব হয়েছিল তার মধ্যে এটাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য সফলতা। এরপরই রাসূলুল্লাহ) মুসলিমগণকে এ নতুন দেশে হিজরত করার (দেশত্যাগ করার) অনুমতি প্রদান করেন।

হিজরতের অর্থ ছিল সকল প্রকার সুখ-সুবিধা ও আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে এবং ধন-দৌলত ও সহায়-সম্পদ সবকিছু পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র প্রাণ রক্ষা করা। আর এটা মনে রাখতে হবে যে, মুশরিকবেষ্টিত মুসলিমগণের জীবন যে কোন মুহূর্তে বিপদগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল অধিক। অধিকন্তু পথের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেকোন স্থানে বিপদ ঘনিয়ে ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আর ভ্রমণ ছিল এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পানে। জানা ছিল না আগামীতে কোন ধরণের বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন তাঁদের হতে হবে। মুসলিমগণ এ সব জেনে শুনে হিজরত আরম্ভ করে দিলেন। এদিকে

মুশরিকরা তাঁদের যাত্রাপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে শুরু করল।কারণ তারা বুঝতে পারছিল যে,এর মধ্যে বিপদ লুকায়িত রয়েছে। হিজরতের কয়েকটি নমুনা পেশ করা হল।

১. সর্ব প্রথম মুহাজির ছিলেন আবূ সালামাহ )। ইবনু ইসহাকের মতে, তিনি 'আক্বাবার বড় শপথের পূর্বেই হিজরত করেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা। যখন তিনি মক্কা শরীফ থেকে যাত্রা করতে চাইলেন তখন তাঁর শ্বশুর পক্ষ বলল, 'আপনার নিজ প্রাণের ব্যাপারে আপনি আমাদের উপর জয়ী হলেন।

২. সুহাইব বিন সিনান রুমী রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পর হিজরত করেন। তিনি যখন হিজরতের ইচ্ছে করলেন, তখন কুরাইশ গোত্রের কাফিরগণ বলল, 'তুমি যখন আমাদের নিকট এসেছিলে তখন নিকৃষ্ট ভিক্ষুক ছিলে। কিন্তু এখানে আসার পর তোমার অনেক ধন সম্পদ হয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। এখন তুমি চাচ্ছ যে, তোমার ধনসম্পদ নিয়ে এখান থেকে চলে যাবে। আল্লাহর কসম! এ কিছুতেই হতে পারে না।' সুহাইব (আ) বললেন, 'ঠিক আছে, আমি যদি আমার ধন-সম্পদ ছেড়ে যাই, তবে কি তোমরা আমার পথ ছেড়ে দিবে? তারা বলল, 'হ্যাঁ'

সুহাইব বললেন, 'বেশ ঠিক আছে। চলো আমার ধন-সম্পদ যা কিছু আছে তোমাদেরকে দিয়ে দিই।' (তারপর তিনি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ এর মহব্বতে তার সমস্ত সম্পদ কাফিরদের হাতে তুলে দিলেন)। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এ খবর জানতে পারলেন তখন আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'সুহাইব লাভবান হয়েছেন, সুহাইব লাভবান হয়েছেন'।

৩. 'উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু  'আইয়াশ বিন আবী রাবী'আহ), হিশাম বিন 'আস বিন ওয়ায়িল (রা) নিজেদের মধ্যে এটা স্থির করলেন যে, সারিফ-এর তানাযুব স্থানে খুব সকালে একত্রিত হয়ে সেখানে থেকে মদীনা হিজরত করা হবে। 'উমার (রা) 'আইয়াশ (রা) যথাসময়ে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হলেন, কিন্তু হিশাম বন্দি হয়ে গেলেন।

## ☐ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হিজরত:

## আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার ইচ্ছে ও কুরাইশদের প্রচেষ্টা:

মুশরিকরা যখন দেখলো মুসলিমরা একে একে পরিবার-পরিজন নিয়ে ধন-সম্পদ ফেলে মদীনায় জমা হচ্ছে তারা অস্থির হয়ে গেল। মুসলিমদের মদীনায় হিজরতের ফলাফল কী হতে পারে তা তাদের অজানা ছিল না। তারা টের পেয়েছিল আওস এবং খাযরাজ গোত্র রাসূলুল্লাহর ﷺ নেতৃত্বে এক হচ্ছে এবং তাদের মিলিত শক্তির সাথে পেরে ওঠা সহজ কথা নয়। মদীনায় মুসলিমদের ঘাঁটি গড়ার অর্থ হলো, তাদের দীর্ঘদিনের বাণিজ্যিক পথ অনিরাপদ হয়ে যাওয়া, কেননা কুরাইশদের ব্যবসা ছিল ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত যে দীর্ঘ উপকূলীয় পথ রয়েছে সে পথেই কুরাইশদের কাফেলা চলাচলা করতো আর মদীনা থেকে সে পথ খুব দূরে নয়। কুরাইশরা দীর্ঘদিন ধরে আরবের একচ্ছত্র ক্ষমতার যে স্বপ্ন দেখে আসছিল, মদীনায় মুসলিমদের উত্থান হলে সে স্বপ্নে মুসলিমরা ব্যাঘাত ঘটাবে। অত্যাচার-নির্যাতন, প্রলোভন, সমঝোতা, মিডিয়া ক্যাম্পেইন, হত্যার হুমকি, বয়কট-কিছুই যখন কাজ হলো না তখন কুরাইশরা ক্ষুব্ধ ষাঁড়ের মত ফুঁসলে উঠলো। ব্যর্থ, পরাজিত মানুষের মত বেপরোয়া, মরিয়া, অস্থির-উন্মাদপ্রায় কুরাইশরা গুপ্তহত্যার পরিকল্পনা করলো: মুহাম্মাদকে ﷺ তারা মারবেই-যে করেই হোক।

দারুন নাদওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন বসলো, শিরোনাম: মুহাম্মাদকে ﷺ কীভাবে থামানো যায়। কুরাইশদের বড় বড় নেতারা এ অধিবেশনে অংশ নিল। .বেশ কিছু প্রস্তাব এলো। কেউ প্রস্তাব করলো তাঁকে কারাগারে আটকে রাখা হোক। কিন্তু এ প্রস্তাব খুব একটা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। কারণ তারা খুব ভালো করে জানতো যে, রাসূলুল্লাহকে ﷺ কারাগারে প্রেরণ করলে সাহাবীগণ তাঁকে ছাড়িয়ে নিতে পারবেন, এমনকি তাঁরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করে বসতে পারেন। প্রস্তাব হলো,রাসূলুল্লাহকে মক্কা থেকে বের করে দেওয়া। কিন্তু এ প্রস্তাবও খুব একটা হালে পানি পেল না, কারণ রাসূলুল্লাহর ﷺ কথাবার্তা ছিল খুবই চমৎকার, তাঁর সুন্দর কথা

শুনে মক্কার বাইরের লোকেরা তাঁকে বিশ্বাস করে তাঁর দলে যোগ দিয়ে মক্কায় আক্রমণ চালাতে পারে।

সর্বশেষ এবং সবচেয়ে জঘন্য প্রস্তাব ছিল নবীজিকে হত্যা করা। এই প্রস্তাব আর কারো নয়, এই প্রস্তাব কুখ্যাত আবু জাহেলের।সে প্রস্তাব করলো, প্রত্যেক শক্তিশালী অভিজাত বংশের একজন করে শক্তসমর্থ কাউকে পাঠানো হবে। তাদের সবার হাতে থাকবে একটি করে ধারালো তলোয়ার।রাসূলুল্লাহকে ﷺ হত্যা করবে। ফলে হত্যার দায় নির্দিষ্ট কাউকে বহন করতে হবে না, মক্কার সমস্ত গোত্র এই হত্যার দায়ভার নেবে। সেক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহর ﷺ পরিবার মক্কার সব গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াতে পারবে না, তারা রক্তপণ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হবে। মুশরিকরাও খুশি মনে রক্তপণ দিয়ে দিবে। প্রস্তাবটি জঘন্য হলেও বেশ কার্যকরী ছিল, মক্কার সংসদে হত্যার বিল পাস হলো।

"আর কাফেরেরা যখন প্রতারণা করতো আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেয়ার জন্য তখন তারা যেমন পরিকল্পনা করতো তেমনি, আল্লাহও পরিকল্পনা করতেন। বস্তুতঃ আল্লাহর পরিকল্পনাই সবচেয়ে উত্তম।" (সূরা আনফাল, ৮: ৩০)

মুশরিকদের পরিকল্পনা ছিল রাসূলুল্লাহকে ﷺ গোপনে হত্যা করা, কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল তাঁকে তিনি রক্ষা করবেন। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল তাঁর নবী মুহাম্মাদকে ﷺ শিখিয়ে দিলেন একটি দুআ।

"বলুনঃ হে আমার রব, যেখানে গমন শুভ ও সন্তোষজনক, আপনি আমাকে সেখানে নিয়ে যান এবং যেখান হতে নির্গমন শুভ ও সন্তোষজনক সেখান হতে আমাকে বের করে নিন এবং আপনার নিকট হতে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি।" (সূরা আল-ইসরা, ১৭: ৮০)

"আমাকে সেখানে নিয়ে যান, যেখানে আমার গমন শুভ" এখানে মদীনার কথা বোঝানো হচ্ছে; "যেখান হতে নির্গমন শুভ সেখান হতে আমাকে বের করে নিন" - এখানে বলা হচ্ছে মক্কার কথা এবং "আপনার নিকট হতে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি"

এখানে বলা হচ্ছে শাসনকর্তৃত্ব বা রাজনৈতিক ক্ষমতার কথা। আল্লাহ তাআলা শিক্ষা দিচ্ছেন এই দ্বীনকে টিকিয়ে রাখতে চাই শাসনকর্তৃত্ব বা শক্তি।

## ♣হিজরতের সিদ্ধান্ত:

আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে হিজরতের অনুমতি পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকরকে বিষয়টি জানানোর জন্য তাঁর বাড়ির উদ্দেশ্যে বের হলেন। আ'ইশা সেদিনের কথা বর্ণনা করেন, 'আমরা দেখলাম একজন মানুষ মুখ কাপড়ে ঢেকে আমাদের বাড়ির দিকে আসছেন।' আবু বকর তাঁকে দেখেই বুঝতে পারলেন যে তিনি আল্লাহর রাসূল। আবু বকর বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপার, তা না হলে তিনি এ অসময়ে এভাবে আসতেন না।' দুপুর বেলা বিশ্রামের সময়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ এভাবে আসার কথা না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে ঢুকেই আবু বকরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার পরিবারের সবাই কি চলে গেছে?' আবু বকর বললেন, 'এখানে যারা আছেন তাঁরা তো সবাই আপনার পরিবারের সদস্য।' আবু বকর বুঝাতে চাইলেন, আমার পরিবার তো আপনার নিজের পরিবারের মতোই, তাই আপনি তাদের বিশ্বাস করতে পারেন এবং তাদের সামনেই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে পারেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকরকে জানালেন, 'আবু বকর, আল্লাহ তাআলা আমাকে মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দিয়েছেন!' আবু বকর বললেন, 'আল্লাহর রসূল, আমি কি আপনার সাথে যেতে পারি?" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই!' রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে আবু বকর কাঁদতে লাগলেন। আ'ইশা বলেছেন, 'সেদিন আমার পিতা খুশিতে যেভাবে কেঁদেছিলেন আমি কোনোদিন কাউকে আনন্দে এভাবে কাঁদতে দেখিনি।'

## বাসভবন ঘেরাও-

গুপ্তহত্যার অপারেশনের জন্য নির্বাচিত করা হলো এগারো জনকে, এদের মধ্যে আবু জাহেল এবং আবু লাহাবও ছিল। তারা সবাই রাসূলুল্লাহর ﷺ বাসার চারদিকে ওঁৎ পেতে রইল। রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করলো, রাসূলুল্লাহ শুয়ে পড়লেই তাঁর বাসায় একযোগে হামলা চালাবে। তারা নিশ্চিত মনে হাসাহাসি করছিল, এবারের মিশন সফল হবেই, কেউ তাদেরকে থামাতে পারবে না। নির্ঘুম চোখে তারা অপেক্ষা করছিল সেই 'বিজয়' মুহুর্তের।

## রাসূলুল্লাহর ﷺ ঘরে:

রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করছেন কুরাইশরা। সেই রাতে আলী ইবন আবু তালিবকে রাসূলুল্লাহ তাঁর কাছে রাখা কুরাইশদের আমানত বুঝিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'তুমি আমার এই সবুজ হাদরামাউতি চাদর গায়ে দিয়ে আমার বিছানায় শুয়ে থাকো। ওদের হাতে তোমার কিছুই হবে না।' আলী নিজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ কথামতো বিছানায় শুয়ে থাকলেন। সাহাবারা আগ্রহের সাথে তাদের এই দায়িত্বগুলো পালন করতেন। এমনকি নিজেদের জীবনের ঝুঁকিও নিয়েছেন খুশিমনে।

এদিকে কুরাইশরা ব্যস্ত নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-তামাশায়। আবু জাহেল তার সঙ্গীদের বললো, 'আরে তোমরা জানো মুহাম্মাদ কী বলে! সে বলে তার দ্বীন মানলে তোমরা নাকি আরব অনারবের বাদশাহ হবে! মরার পর তোমাদের নাকি বাগান থাকবে, জর্ডানের বাগানের মতো বাগান! আর তোমরা যদি তাকে না মানো, তাহলে তোমাদের মেরে ফেলা বৈধ হয়ে যাবে আর মরার পর তোমরা আগুনে পুড়বে!'

'হ্যাঁ, আমি এ কথাই বলেছি আর আগুনেই পুড়বে তুমি'- রাসূলুল্লাহ হাতে এক মুঠো মাটি নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন এবং তাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ,কেউ তাঁকে আর দেখতে পেল না। সকলের

অগোচরে তিনি ঘর ত্যাগ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন আবৃত্তি করছিলেন সূরা ইয়াসীনের আয়াত

'আমি ওদের সামনে ও পেছনে প্রাচীর স্থাপন করে দিয়েছি এবং আবৃত করে দিয়েছি, ফলে ওরা দেখতে পায় না।" (সূরা ইয়াসিন, ৩৬: ৯)

এদিকে কুরাইশদের সেই এগারো জন মাথায় মাটি নিয়ে বসে থাকলো নির্ধারিত সময়ের আশায়। কিন্তু তারা তার আগেই জানতে পারলো আল্লাহর রাসূল আগেই বাসা ছেড়ে চলে গেছেন। তবু দুরাশা নিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলো কেউ একজন বিছানায় শুয়ে আছে। তারা ভাবলো বুঝি রাসূলুল্লাহ ﷺ শুয়ে আছে। ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারা দেখলো শুয়ে আছে আলী। প্রচণ্ড হতাশ হয়ে আলীকে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় মুহাম্মাদ?' আলী বললেন, 'জানি নাহ।'

## মদীনার পথে-

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা ইতিমধ্যেই মদীনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে বেশ অনেক পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্মভূমি মক্কাকে খুব ভালোবাসতেন। তাই তিনি মক্কা ত্যাগ করার সময় বারবার পিছনে ফিরে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'আল্লাহর নামে বলছি, মক্কা আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় নগরী। আমাকে যদি এখান হতে বের করে দেওয়া না হতো তাহলে আমি কখনো এ নগরী ছেড়ে যেতাম না। এখানে থেকে যাওয়ার কোনো সুযোগ থাকলে আমি মক্কা ত্যাগ করতাম না।' মদীনা অভিমুখে তাদের যাত্রা শুরু হলো। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ ﷺ খেয়াল করলেন

আবু বকর কিছু সময় তাঁর আগে-আগে হাঁটছেন আবার কিছু সময় তাঁর পিছন-পিছন হাঁটছেন। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার? কখনো তুমি আমার সামনে চলছো,কেন?

- আমার যখন মনে হয় কেউ আপনাকে সামনের দিক থেকে হঠাৎ আক্রমণ করতে পারে তখন আমি আপনার সামনে চলে যাই। আবার যখন মনে হয় কেউ আপনাকে পেছন থেকে আক্রমণ করতে পারে তখন আমি আপনার পিছন-পিছন হাঁটি।

- আবু বকর, তুমি - কোনটা চাও, আমার ক্ষতি নাকি তোমার ক্ষতি?

আল্লাহর রাসূল, আমার ক্ষতি হলে হোক, কিন্তু আপনার ক্ষতি হোক এটা আমি হতে দিতে চাই না।

"এমন দু'জন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয় সঙ্গী হচ্ছেন আল্লাহ?"

এরপর তাঁরা একটি গুহার কাছে পৌঁছালেন। প্রথমে আবু বকর গুহার ভেতরে ঢুকে সবকিছু ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখলেন যে, সেখানে কোনো সাপ, বিছা অথবা কোনো শত্রুদল ঘাপটি মেরে আছে কিনা। সবকিছু নিরাপদ দেখে তিনি রাসূলুল্লাহকে • ভিতরে আসতে বললেন। কিন্তু কুরাইশ মুশরিকরা তাদের গতিবিধি নজরদারি করতে সক্ষম হয় এবং গুহার খুব কাছে চলে আসে। আবু বকর রাসূলুল্লাহকে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, যদি মুশরিকদের কেউ মাথা নিচু করে পা বরাবর তাকায় তাহলে তারা আমাদের দেখে ফেলবে।' রাসূলুল্লাহ খুব নির্ভীক কণ্ঠে বললেন, 'আবু বকর, এমন দু'জন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয় সঙ্গী হচ্ছেন আল্লাহ? তুমি কি তাদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হবে?' গুহার খুব কাছে এসেও মুশরিকদের ফিরে যাওয়ার কারণটি ছিল খুবই অদ্ভুত। একটি অতি ঠুনকো মাকড়শার জাল।

"... আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক দুর্বল..." (সূরা আনকাবুত, ২৯: ৪১)

যে মাকড়শার জালকে একটি আঙ্গুল দিয়ে ছিঁড়ে ফেলা যায়, সেই দুর্বল মাকড়সার জালই হয়ে গেল এখানে আল্লাহ তাআলার সৈনিক। এটিই গুহায় মুশরিকদের সৈনিকদের ঢুকতে বিরত রেখেছিল। আল্লাহ যদি চান, তিনি তাঁর সুবিশাল সৃষ্টির মধ্য থেকে সবচেয়ে দুর্বলতম সৃষ্টিকেও সৈনিক হিসেবে কাজে লাগাতে পারেন। হিজরতের দিনে রাসূলুল্লাহর ﷺ সঙ্গী হিসেবে ছিলেন শুধু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা সাহাবাদের

কেউই সেখানে ছিলেন না। তার উপর মুশরিকরা তাদের ঘিরে রেখেছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহকে ﷺ সেই ভয়ানক পরিস্থিতি থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তাআলা নিজেই যথেষ্ট ছিলেন।এই ঘটনার পর আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন,

"যদি তোমরা তাঁকে (রাসূলুল্লাহকে) সাহায্য না কর তাহলে আল্লাহই তাঁকে সাহায্য করবেন যেমন তিনি তাকে সাহায্য করেছিলেন সেই সময়ে যখন কাফিরেরা তাঁকে দেশান্তর করেছিল। তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তাঁরা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি তাঁর আপন সঙ্গীকে বলেছিলেন, বিষন্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রতি তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুতঃ আল্লাহ কাফেরদের মাথা নীচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তাওবাহ, ৯: ৪০)

আবু বকরের জন্য এই আয়াত একটি বিরাট সম্মান। কারণ এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা আবু বকরকে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গী বা সাহাবি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকরের সাথে সেই গুহাতে তিনদিন অবস্থান করেন। আবু বকরের ছেলে আবদুল্লাহ তাদের সাথে রাতের বেলা গুহায় অবস্থান করতো কিন্তু দিনের বেলা মক্কায় গিয়ে খোঁজ নিত মুশরিকরা রাসূলুল্লাহর ﷺ ব্যাপারে কী পরিকল্পনা করছে। মুশরিকরা যাতে আবদুল্লাহর গুহায় যাওয়া-আসার বিষয়ে টের না পায় এজন্য সে আবু বকরের আযাদকৃত দাস আমির ইবন ফুহাইরাহকে বলে দিত সে যেন তার ভেড়ার পাল নিয়ে আবদুল্লাহর অনুসরণ করে। এতে দুটো সুবিধা, প্রথমত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর ভেড়ার দুধ পান করতে পারতেন। এতে তাদের খাবারের প্রয়োজন পূরণ হতো। দ্বিতীয়ত, ভেড়ার পাল আবদুল্লাহ ও আমিরের যাত্রাপথে তাদের পায়ের ছাপ নষ্ট করে দিত, ফলে তাদের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে কেউ আঁচ করতে পারতো না।

## □ মদীনায় প্রবেশ:

জুমআর সালাত শেষে রাসুলুল্লাহ ﷺ মদীনায় প্রবেশ করলেন।এই দিন থেকেই এ শহরের নাম ইয়াসরিবের পরিবর্তে মদীনাতুররাসূল বা রাসূলের শহর হয়ে যায় সংক্ষেপে একে মদীনা বলা হয়ে থাকে। এটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ঐতিহাসিক দিবস। মদীনার অলিতে গলিতে সর্বত্র সেদিন তাকদীস ও তাহমীদের (পবিত্রতা ও প্রশংসার) গুঞ্জণ ধ্বনি শ্রুত হচ্ছিল। আনসারদের ছেলেমেয়েরা আনন্দ উদ্বেল কণ্ঠে নিম্নের কবিতার চরণগুলো সুর ও ঝংকার সহকারে গেয়ে বেড়াচ্ছিল।

طلع البدر علينا - من ثنيات الواع

وجب الشكر علين -ما دعا لله داع

أيهاالمبعوث فينا - جىءت بالأمر المطاع

'দক্ষিণ পাশের পাহাড় হতে পূর্ণিমার চন্দ্র আমাদের উপর উদিত হয়েছে।'

'কি উত্তম ধর্ম ও শিক্ষা! আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের প্রতি ওয়াজেব।' তোমার নির্দেশ অনুসরণ করা ফরয। তোমার প্রেরণকারী হচ্ছেন কিবরিয়া (মহাপ্রভু)

আনসারগণ যদিও ধনী ছিলেন না, তবুও সকলের আশা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার বাসাতেই অবস্থান করুন। ফলে তার উটনী আনসারদের যে বাড়ি কিংবা মহল্লার পাশ দিয়ে অতিক্রম করত সেখানকার লোকজন উটনীর লাগাম ধরে নিতেন এবং অনুরোধ করতেন যে, আসবাবপত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা প্রস্তুত রয়েছে, আগমন করুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন 'উটনীর পথ ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত রয়েছে। ফলে উটনী একটানা চলতে থাকল এবং ঐ স্থানে এসে বসে পড়ল যেখানে মসজিদে নাবাবী রয়েছে। কিন্তু তিনি নীচে অবতরণ করলেন না। তারপর উটনী পুনরায় উঠে দাঁড়াল এবং কিছু দূরে গিয়ে ঘুরে ফিরে দেখার পর পূর্বের জাগাতেই এসে বসে পড়ল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নীচে অবতরণ করলেন। এটা ছিল তাঁর নানীর, অর্থাৎ বনু নাজ্জার গোত্রের মহল্লা। আর উটনীর জন্য ছিল এটা আল্লাহর তরফ থেকে

নির্দেশনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ চেয়েছিলেন তাঁর নানার গোত্রে অবস্থান করে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে, সেই জন্যই এ ব্যবস্থা।

এখন বনু নাজ্জার গোত্রের লোকজনেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে নিজ নিজ গৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর নিকট আবেদন নিবেদন শুরু করে দিলেন। কিন্তু আবূ আইউব আনসারী উষ্ট্রের পালান উঠিয়ে নিলেন এবং বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতে লাগলেন মানুষ তার পালানের সঙ্গে রয়েছে। এদিকে আস'আদ বিন যুরারাহ এসে উটনীর লাগাম ধরে নিলেন, ফলে উটনী তার নিকটেই রয়ে গেল।

সহীহুল বুখারী শরীফে আনাস (আ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'কোন্ লোকের বাড়ি আমার থেকে নিকটে"?

আইউব আনসারী বলেন, 'আমার বাড়ি, হে আল্লাহর রাসূল (স) এটা আমার বাড়ি আর এটা আমার দরজা।'তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, 'যাও এবং আমার বিশ্রামের জায়গা ঠিক কর।' বললেন, কওমের উপর আল্লাহর বরকত হোক।

## □ মদীনার জীবন:দাওয়াত,জিহাদ ও পরিত্রাণের যুগ:

মদীনার জীবনকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে।

১. প্রথম পর্যায়:ইসলামী সমাজ নির্মাণের ও ইসলামের দাওয়াত প্রতিষ্ঠালাভের যুগ। এ পর্যায়ে ফিতনা ও অশান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। শহরের মধ্য হতে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বের থেকে শত্রুরা আক্রমণ চালিয়েছে। যাতে মদীনায় ইসলামের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছে ৬ হিজরী সনে যুল ক্বা'দাহ মাসে হুদায়বিয়ার সন্ধিতে।

২. দ্বিতীয় পর্যায়:এ পর্যায়ে মূর্তি পূজারী নেতাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হয়, এটার সমাপ্তি ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের দ্বারা ঘটে। এ পর্যায়কে বিশ্বের রাজন্যবর্গের নিকট ইসলামের দাওয়াত প্রেরণের পর্যায়ও বলা যেতেপারে।

৩. তৃতীয় পর্যায় : এ পর্যায়ের বিস্তৃতি ঘটেছিল একাদশ হিজরীর রবিউল আওয়াল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পবিত্র জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। এ সময়ে বিভিন্ন দেশ ও গোত্রের মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। এ পর্যায় বিভিন্ন জাতি ও গোত্রসমূহের মুখপাত্রগণের মদীনায় আগমনের পর্যায়।

## □ ৮.মদীনার উপকণ্ঠে রাসূলুল্লাহ:নতুন যুগের সূচনা-

## মদীনার প্রথম দিনগুলো-

মদীনার প্রত্যেকেই চাইছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ যেন তাদের বাড়িতে থাকেন। তারা প্রত্যেকে তাদের বাসায় থাকার জন্য নবীজিকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু নাজ্জারের সাথে থাকতে চান। কারণ বনু নাজ্জারের সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। হাশিম বনু নাজ্জারের একজন মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। বনু নাজ্জার এসেছিল খাযরাজ থেকে, সে হিসেবে মদীনার বনু নাজ্জার ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ মায়ের গোষ্ঠী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু নাজ্জারের সাথে থাকার ইচ্ছার কথা সবাইকে জানিয়ে দেন। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করেন যে, তাঁর কাছাকাছি বনু নাজ্জারের কার ঘর আছে। আবু আইয়ুব আল আনসারী জানান তাঁর ঘর কাছাকাছি আছে। এরপর আবু আইয়ুব আনসারী রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান। আবু আইয়ুব আনসারী রাসূলুল্লাহ ﷺ কে উপরের ঘরে থাকার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ নিচের ঘরেই থাকতে চাইলেন। অনেকেই রাসূলুল্লাহর সাথে দেখা করতে। আসতেন, এক্ষেত্রে তাঁর নিচ তলায় থাকার সিদ্ধান্ত সবার জন্যই সুবিধাজনক ছিল। অবশেষে আবু আইয়ুব রাজি হন। আবু আইয়ুব বলেন, 'একদিন আমাদের একটা পানির পাত্র মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল। আমরা খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম, এই পানি মেঝে চুইয়ে যদি রাসুলুল্লাহকে ﷺ ভিজিয়ে দেয়, তখন কী হবে? আমাদের একটিমাত্র কম্বল ছিল, আমরা সেই কম্বল মেঝের পানি শুকানোর জন্য ব্যবহার করলাম। সে রাতে আমি আর আমার স্ত্রী কম্বল ছাড়াই ঘুমালাম। এই ঘটনাটি দেখিয়ে দেয়,রাসূলুল্লাহর ﷺ সামান্যতম কষ্টও সাহাবারা

সহ্য করতে পারতেন না। তাঁরা নিজেরা কম্বল ছাড়া ঘুমিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহর রাসূলের ﷺ গায়ে এক ফোঁটা পানি তাঁরা পড়তে দেননি।

যাইদ ইবন সাবিত (রা)বলেন, 'আমিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহকে ﷺ উপহার দিয়েছিলাম। সেটি ছিল দুধ, মাখন ও রুটি দিয়ে পরিপূর্ণ বড় একটি কাঠের বাটি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন আবু আইয়ুবের বাসায়, আমি নিজে সে উপহার তাঁর কাছে নিয়ে যাই। আমি নবীজিকে জানাই যে, আমার মা তাঁর জন্য এ খাবার পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহ তোমার মায়ের মঙ্গল করুন।' এরপর তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে ডেকে সবাই একসাথে খেলেন। এরপর খাবার নিয়ে আসেন সাদ ইবন উবাদা। তিনি আনেন মাংসের ঝোল আর রুটি। আবু আইয়ুবের বাড়িতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাত মাস থেকেছিলেন। এই সাত মাস ধরে প্রতিদিন সন্ধ্যায় কেউ না কেউ, অন্তত তিন-চার জন রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে খাবার নিয়ে দেখা করতে আসতো।' এই সাহাবীদের অধিকাংশই ছিলেন দরিদ্র। কিন্তু তারপরও তাঁরা রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য নিজেদের খাবারটুকু পর্যন্ত দিয়ে দিতেন।রাসূলুল্লাহকে ﷺ তাঁরা এতটাই ভালবাসতেন।

আল্লাহ আযযা ওয়াজাল এই অসাধারণ হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষগুলোকে রাসূলুল্লাহর ﷺ আনসার তাঁর জীবনের শেষভাগে বলেছেন, 'যদি না হিজরত করতাম, তাহলে আমি নিজেকে আল-আনসারের একজন সদস্য হিসেবেই ভাবতাম।'

## □ ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

চারটি প্রজেক্ট-

মদীনায় পৌঁছে রাসূল চারটি প্রজেক্ট হাতে নেন এগুলো হলো:

১) মসজিদ নির্মাণ।

২) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা।

৩) মদীনার বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক কেমন হবে সে ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট দলিল বা সনদ প্রণয়ন।

৪) মুসলিম সেনাবাহিনী গড়ে তোলা।

## প্রথম প্রজেক্ট:মসজিদ নির্মাণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় পৌঁছেই প্রথমে মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কুবাতে অবস্থানকালেও একই কাজ করেছিলেন। মসজিদ হলো মুসলিমদের শিক্ষাকেন্দ্র। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ সবকিছুর আগে মসজিদ নির্মাণের দিকে দৃষ্টি দেন। মক্কায় তিনি দার-উল-আরকামে মুসলিমদের প্রশিক্ষণের কাজ চালাতেন। পরবর্তীতে মদীনায় মসজিদ নির্মাণের মধ্য দিয়ে দার-উল-আরকামের কার্যক্রম ব্যাপকতা লাভ করে। তবে মক্কার দার-উল-আরকাম ছিল একটি গোপন জায়গা। সেখানে মুসলিমরা সালাত আদায় করতে আসত এবং কুরআন শিক্ষা করতো। কিন্তু মদীনাতে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ায় আর গোপনীয়তার প্রয়োজন ছিল না। তাই নির্মিত হয় 'মসজিদ-ই-নববী।'

### মসজিদের জন্য জায়গা নির্বাচন

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটে চড়ছিলেন আর লোকজন যার যার দিকে উটটিকে টানছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এটিকে ছেড়ে দাও, কারণ এটি আল্লাহর নির্দেশে চলছে।' উটটি মদীনার রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলো। এটি থামলো একটি শুকনো খেজুরের মাঠে। সেই মাঠের মালিক ছিল দুই এতিম ছেলে। উটটি থামলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এটিই হলো আমাদের মসজিদের জায়গা।' অতঃপর সেই জায়গাটি মসজিদের জন্য এবং রাসূলুল্লাহর ﷺ থাকার জায়গা হিসেবে নির্বাচন করা হলো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জায়গাটি এতিম বালকদের কাছ থেকে কিনে নিতে চাইলেন। কিন্তু তারা বিক্রি করতে রাজি হলো না বরং তারা সেই জায়গাটি কোনো টাকা ছাড়াই রাসূলুল্লাহকে দিতে চাইল। অবশেষে মসজিদ-ই-নববীর নির্মাণ কাজ শুরু হলো। মসজিদের দেয়াল

তৈরি করা হয়েছিল কাদামাটির ইট দিয়ে আর ছাদ নির্মাণ করা হয়েছিল তালপাতা দিয়ে। বৃষ্টি হলে পাতা চুইয়ে বৃষ্টির পানি তাদের মাথায় পড়তো, আর মেঝেতে ছিল শুধু বালি। মসজিদটি ছিল খুবই সাদামাটা কিন্তু এটি হলো ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে বরকতময় মসজিদ। এখানেই মুসলিমদের প্রথম ও সেরা প্রজন্মটি দ্বীনের শিক্ষা লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও সাহাবাদের মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজ কাঁধে ইট বহন করেছিলেন।

## আযানের সূচনা

মসজিদ-ই-নববীর নির্মাণকাজ পুরোপুরি শেষ হওয়ার পর আলোচনা শুরু হয় কীভাবে সবাইকে সালাতের দিকে আহ্বান করা যায়। কেউ পরামর্শ দিল, খ্রিস্টানদের মতো ঘণ্টা ব্যবহার করা অথবা মদীনায় ইহুদিরা যেভাবে হর্ন ব্যবহার করতো সেরূপ কিছু করা। কোনো প্রস্তাবই রাসূলুল্লাহর ﷺ মনঃপুত হলো না। এমন সময়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ একজন সাহাবী, আবদুল্লাহ ইবন যাইদ একটি স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন, একটি লোক একটি ঘণ্টা বহন করছে। তা দেখে তিনি ওই লোকের কাছে ঘণ্টাটির দাম জানতে চান। লোকটি আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কেন ঘন্টাটি চাও?' আবদুল্লাহ স্বপ্নের মধ্যে উত্তর দিলেন যে, তিনি এটা দিয়ে মানুষকে সালাতের দিকে আহ্বান করবেন। লোকটি উত্তরে বললো যে, তার কাছে দেওয়ার মতো এর চেয়েও ভালো কিছু আছে। আবদুল্লাহ জানতে চাইলেন সেটি কী। লোকটি তাঁকে বলতে বললো,

আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!

আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!

আশ-হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

আশ-হাদু আল্লা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

আশ-হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ

আশ-হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ

হাইয়্যা 'আলাস-সালাহ

হাইয়্যা 'আলাল-ফালাহ

হাইয়্যা 'আলাল-ফালাহ

আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

আবদুল্লাহ ইবন যাইদ রাসূলুল্লাহকে ﷺ এই স্বপ্নের কথা জানান। স্বপ্নের বর্ণনা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পারলেন যে এই স্বপ্ন সত্য স্বপ্ন। এরপর তিনি আবদুল্লাহকে বললেন বিলালকে এই আযান দেওয়া শিখিয়ে দিতে। বিলালের কণ্ঠস্বর ছিল খুব জোরালো আর সুন্দর। আযানের শব্দ শুনতে পেয়ে উমার দ্রুত মসজিদে আসেন। তিনি বললেন যে, তিনিও স্বপ্নে এই কথাগুলো শুনেছেন। একাধিক ব্যক্তি একই স্বপ্ন দেখার অর্থ হলো স্বপ্নটি সত্য।

সেই থেকে আযান ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকসমূহের একটি। যে সব জায়গায় প্রকাশ্যে আযান দেওয়া হয়, সেসব জায়গায় ইসলাম ও মুসলিমদের উপস্থিতি আছে এমনটা ধরে নেওয়া হয়।

## দ্বিতীয় প্রজেক্ট:মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা:

মসজিদে নাবাবীর নির্মাণ কাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মুসলিমগণ যেভাবে পারস্পরিক বোঝাপড়া, সাহায্য সহযোগিতা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তেমনভাবে মুসলিমগণের মধ্যে এমন অপূর্ব এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন যার তুলনা মানব জাতির ইতিহাসে কোথাও মিলে না। মুসলিমগণের এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে 'মুহাজির ও আনসারগণের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন' নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইবনুল কাইয়্যেম লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনাস বিন মালিকের গৃহে মুহাজির

ও আনসারগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করিয়েছিলেন। এ সভায় সর্বশেষ নব্বই জন মুসলিম উপস্থিত ছিলেন, অর্ধেক সংখ্যক ছিলেন মুহাজির এবং অর্ধেক সংখ্যক আনাসার। 'মুহাজির আনসার ভ্রাতৃত্বের' মূলনীতি গুলো ছিল, 'একে অন্যের দুঃখে দুঃখিত হবেন এবং মৃত্যুর পর নিজ আত্মীয়ের মতো একে অন্যের ওয়ারেস বা উত্তরাধিকারী হবেন। ওয়ারাসাত বা উত্তরাধিকারের এ ব্যবস্থা বদর যুদ্ধ পর্যন্ত চালু ছিল। তারপর যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন উক্ত উত্তরাধিকরের পদ্ধতি বাতিল হয়ে গেল।

وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٥]

'কিন্তু আল্লাহ্র বিধানে রক্ত সম্পর্কীয়গণ পরস্পর পরস্পরের নিকট অগ্রগণ্য।' (আল-আনফাল ৮: ৭৫)

বলা হয়ে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবলমাত্র মুহাজিরীনদের মধ্যে আরও এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু প্রথম মতটিই অধিক প্রামাণ্য ও গ্রহণযোগ্য। কেননা, মুহাজিরীনগণ এমনিতেই পরস্পর ইসলামী ভ্রাতৃত্বে, দেশীয় ও গোত্রীয় ভ্রাতৃত্বে এবং আত্মীয়তার বন্ধনের কারণেই তাঁদের মধ্যে নতুন করে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আনসারদের ব্যাপারটি ছিল ভিন্ন।'

আল্লাহ আযযা ওয়াজাল আনসারদের অন্তর থেকে যাবতীয় কার্পণ্য দূর করে দিয়েছিলেন। এই আয়াতে যদিও সাধারণ ভ্রাতৃত্ববোধের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু মুহাজির ও আনসারদের মধ্যকার ভ্রাতৃত্ববোধ অন্য পর্যায়ের, অতুলনীয়। আস-সুহাইলি থেকে জানা যায়, কিছু ব্যক্তি বলেছেন যে, এই ভ্রাতৃত্ববোধের সূচনা হয় হিজরতের পাঁচ মাস পরে। আবার কেউ বলেছেন হিজরতের ৯ মাস পরে। অন্যান্যরা বলেছে মসজিদ-ই-নববী নির্মাণের পর পরই এই ভ্রাতৃত্ববোধের সূচনা হয়।

## তৃতীয় প্রজেক্ট: মদীনার সনদ বা চুক্তিপত্র-

মদীনায় ছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বসবাস। এ ধরনের বহুত্ববাদী একটি সমাজে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, আনুগত্য পারস্পরিক বিবাদ ইত্যাদি সাধারণ সমস্যা। এ ধরনের জটিলতা নিরসনে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি সনদ প্রণয়ন করলেন যাতে এসব বিষয়ে কোনো জটিলতার অবকাশ না থাকে এবং মদীনা একটি স্থিতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে পরিচালিত হতে পারে। তিনি এ সনদে বিভিন্ন গোত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক কীরূপ হবে,কোনো বিবাদ হলে কীভাবে তার মীমাংসা হবে, যুদ্ধে কে কার পক্ষ নেবে বা সাহায্য করবে, কারা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হবে এ বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করলেন।চুক্তিপত্রের কয়েকটি ধারা এখানে উল্লেখ করা হলো।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

১. এটি নিরক্ষর নবী মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পাদিত। কুরাইশ ও ইয়াসরিবের মু'মিন ও মুসলিমদের মাঝে লিখিত। এটি তাদের জন্যও প্রযোজ্য যারা তাদের অনুসারী, মিত্র এবং সহযোগী।

২. এরা সকলে এক উম্মাত, অন্যদের থেকে আলাদা।

৩. কুরাইশের মুহাজিরগণ তাদের আগের অবস্থায় থাকবে। নিজেদের মাঝে পূর্বের রীতিতে রক্তপণ আদায় করবে এবং নিজেদের বন্দীর মুক্তিপণ বহন করবে। আর তা করবে মু'মিনদের মাঝে স্বীকৃত নীতি ও ইনসাফ অনুসারে।

৪. বনু আউফ তাদের আগের অবস্থায় থাকবে। নিজেদের মাঝে আগের রীতিতে রক্তপণ লেনদেন করবে এবং নিজেদের বন্দীর মুক্তিপণ বহন করবে। আর তা করবে মু'মিনদের মাঝে স্বীকৃত নীতি ও ইনসাফ অনুসারে।

[একই ধারা অন্য কিছু গোত্রের জন্য পুনরাবৃত্তি করা হয়।]

৫. যারা বাড়াবাড়ি করবে, সকল সত্যনিষ্ঠ মুসলিম তাদের বিরোধিতা করবে, যদিওবা তাদের সন্তান হয়।

৬. এক মু'মিন অন্য মু'মিনকে কোনো কাফিরের বদলে হত্যা করবে না এবং কোনো কাফিরকে কোনো মুমিনের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে না।

৭. কোনো মুসলিম কাফির কুরাইশদের জানমালের নিরাপত্তা বা আশ্রয় দেবে না।

৮. কোনো মু'মিন,যে এই লিপির ধারাগুলো স্বীকার করেছে এবং আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান এনেছে তার জন্য বৈধ নয়,কোনো দুষ্কৃতিকারীকে সাহায্য করা বা তাকে আশ্রয় দেওয়া।

৯. আর যে বিষয়েই তোমাদের মাঝে মতভেদ হবে তা আল্লাহর সমীপে ও মুহাম্মাদের ﷺ সমীপে উপস্থাপিত হবে।

১০. বনু আউফের ইহুদিরা মু'মিনদের সাথে এক দলভুক্ত ইহুদিদের জন্য ইহুদিদের ধর্ম, মুসলিমদের জন্য মুসলিমদের ধর্ম।

[একই ধারা ইহুদিদের অন্যান্য গোত্রগুলো জন্য পুনরাবৃত্তি করা হয়।]

১১. ইহুদিরা মুহাম্মাদের অনুমতি ছাড়া (যুদ্ধার্থে) বের হবে না।

১২. ইহুদিরা বহন করবে তাদের নিজেদের ব্যয়ভার ও মুসলিমরা তাদের নিজেদের। তাদের কেউ বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে একে অপরকে সাহায্য করবে এবং বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

১৩. মদীনাকে পবিত্র স্থান বলে গণ্য করা হবে।

১৪. এই সনদভুক্ত পক্ষগুলোর মাঝে যদি কোনো সমস্যা বা বিবাদ সৃষ্টি হয়, যা থেকে হানাহানি বেধে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তাহলে তার নিষ্পত্তিতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

১৫. নিরাপত্তা দেওয়া যাবে না কুরাইশকে, আর না তাকে যে কুরাইশের সাহায্য করে।

১৬. চুক্তির সকল পক্ষ মদীনায় আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে পরস্পর সাহায্য করবে।

## চতুর্থ প্রজেক্ট: মুজাহিদ বাহিনী গঠন-

## জিহাদের সূচনা-

মাদানী যুগ মানেই জিহাদের যুগ। তাই রাসূলুল্লাহর ﷺ সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে জানার আগে জিহাদ কী তা বোঝা জরুরি। মাদানী যুগ ছিল ১০ বছর স্থায়ী আর এই অল্প সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে ১৯টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ৫৫টির বেশি সামরিক অভিযান পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ এই ১০ বছরের মধ্যে ৭০টিরও বেশি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, বছরে গড়ে ৭টি করে যুদ্ধ। যুদ্ধ মানেই ব্যাপক প্রস্তুতি, অর্থায়ন, অস্ত্রায়ণ এবং সেনাবাহিনীকে সুসংগঠিত করা- এই প্রতিটি কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়সাপেক্ষ। এছাড়াও তখনকার প্রযুক্তিতে আকাশপথের ব্যবহার ছিল না তাই একেকটি অভিযান বা যুদ্ধস্থলে পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় করে পৌঁছাতে এবং সেখান থেকে ফিরে আসতে অনেক সময় লেগে যেতো। এর থেকে বোঝা যায় মদীনার যুগ ছিল কেবলই যুদ্ধের যুগ এবং এই যুদ্ধগুলোর পেছনে অনেক শ্রম, সময় ও অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ কেন এসব যুদ্ধের পেছনে এত সময় ও শক্তি ব্যয় করলেন।

আল্লাহ আযযা ওয়াজালের পথে যুদ্ধ ব্যতীত অন্য সকল যুদ্ধ হলো অন্যায় ও অসত্যের পক্ষে যুদ্ধ। কাজেই ইসলামের দৃষ্টিতে সকল প্রকার রক্তপাত নিষিদ্ধ, শুধু ব্যতিক্রম হলো জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ।এর পক্ষে দলীল হলো, "যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা কুফরী করেছে তারা লড়াই করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।”(সূরা নিসা,৪:৭৬)

এই আয়াতে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল সকল যুদ্ধকে দুইভাগে ভাগ করেছেন,একটি যুদ্ধ হলো আল্লাহর পথে ঈমানদারদের যুদ্ধ এবং অপরটি তাগুতের পক্ষে কাফিরদের যুদ্ধ।সংক্ষেপে তাগূত হলো সেই সত্তা বা উপাস্য যাকে আল্লাহর পাশাপাশি ইবাদাত

করা হয় অথবা সেই সীমালঙ্ঘনকারী যে নিজেকে এমন আনুগত্য বা কর্তৃত্বের আসনে দাবি করেছে যা কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট।

## জিহাদ হলো আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার একটি কৌশল

“আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ের যিম্মাদার নন! আর আপনি মু'মিনদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ শক্তি- সামর্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন ৮৪) শাস্তিদাতা।" (সূরা নিসা, ৪:

মক্কায় যারা ঈমান এনেছিলেন তাদের উপর কাফেররা নানাভাবে অত্যাচার করতো তবুও তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি। নিজেদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখাটা আরবদের জন্য খুব একটা সহজ ছিল না, কারণ তাদের গোত্রভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় যুদ্ধ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। গোত্রের কেউ আক্রান্ত হলে কেউ ছেড়ে দিত না। তাই নিজেদেরকে যুদ্ধ থেকে সংযত রাখা মক্কার মুসলিমদের জন্য খুবই কষ্টকর ছিল। এটা ছিল তাদের ধৈর্যের পরীক্ষা। জিহাদের হুকুম আসার পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'আমি জানতাম জিহাদের হুকুম আসবে। একদিন না একদিন আমাদেরকে লড়তে হবেই। আমরা যে পরিস্থিতিতে আছি তাতে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ছাড়া উত্তরণের আর কোনো পথ নেই।' মদীনার প্রাথমিক দিনগুলোতে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়। কেউ কেউ বলে যে হিজরতের আগেই এ ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু জিহাদের আসল প্রশিক্ষণ মদীনাতে শুরু হয়। আল্লাহ তাআলার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই প্রস্তুতি, আর তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ শুরু থেকেই মুসলিমদেরকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এই প্রশিক্ষণ ছিল শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকারের প্রশিক্ষণ। এটিই ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ এ নেওয়া চতুর্থ প্রকল্প।

## মুজাহিদ বাহিনী গঠন

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও যে বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন তাকে ঠিক প্রচলিত অর্থে সেনাবাহিনী বলা যায় না। কারণ তাঁরা পেশাদার সৈনিক ছিলেন না। বরং তাদেরকে বলা চলে মিলিশিয়া বা বেসামরিক যোদ্ধা তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল কিন্তু তাঁরা নিয়মিত সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য সবাইকে পাঁচটি শর্ত পূরণ করতে হতো। শর্তগুলো হলো:

১) ইসলাম

২) বয়ঃপ্রাপ্ত হতে হবে।

৩) মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে

৪) এমন কোনো শারীরিক ত্রুটি না থাকা যা থাকলে যুদ্ধে অংশ নেওয়া সম্ভব হবে না।

৫) আর্থিক সামর্থ্য থাকা, এই ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ প্রত্যেক যোদ্ধার খরচ বহন করার মতো সামর্থ্য রাসূলুল্লাহর ﷺ ছিল না। প্রত্যেককে নিজের খরচ নিজেকেই বহন করতে হতো।

একই সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহিনীকে আধ্যাত্মিকভাবে প্রস্তুত করছিলেন। কুরআনে জিহাদ বিষয়ক অসংখ্য আয়াত আছে যা একজন মুসলিমকে জিহাদের ময়দানের জন্য আত্মিকভাবে প্রস্তুত হতে সাহায্য করে।

"নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং যে সওদা তোমরা (আল্লাহর সাথে) করেছো, সে সওদার জন্য

আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য।" (সূরা আত-তওবা, ৯: ১১১)

## □ ৯.গাযওয়ায়ে বদরে কুবরা-ইসলামের প্রথম ফায়সালাকারী যুদ্ধ

### যুদ্ধের কারণ

গাযওয়ায়ে উশায়রার আলোচনায় এটা উল্লেখিত হয়েছে যে, একটি কুরাইশ কাফেলা মক্কা হতে সিরিয়া যাওয়ার পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পাকড়াও হতে বেঁচে গিয়েছিল। এ কাফেলাটি যখন সিরিয়া থেকে মক্কায় ফিরে যাচ্ছিল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ত্বালহাহ ইবনু উবাইদুল্লাহ রাদিআল্লাহু এবং সায়দ ইবন যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহা কে তাদের অবস্থা ও অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য উত্তর দিকে প্রেরণ করেন। এ সাহাবীদ্বয়কে 'হাওরা' নামক স্থান পর্যন্ত গমন এসব জানে এবং সেখানে অপেক্ষমান থাকেন। আবু সুফইয়ান যখন কাফেলাটি নিয়ে ঐ স্থানটি অতিক্রম করছিলেন তখন সাহবীদ্বয় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বিষয়টি অবহিত করেন।

এ কাফেলায় মক্কাবাসীদের প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল। এক হাজার উট ছিল এবং এ উটগুলো কম পক্ষে পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা মূল্যের মালপত্র বহন করছিল। শুধুমাত্র এগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কাফেলার সঙ্গে চল্লিশ জন কর্মী ছিল।

মদীনাবাসীদের ধনদৌলত লাভের জন্য এটা ছিল অপূর্ব এক সুযোগ। পক্ষান্তরে এ বিশাল পরিমাণ ধনমাল থেকে বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারটি ছিল মক্কাবাসীদের জন্য সামরিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট ক্ষতি। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন যে, 'সিরিয়া থেকে মক্কা প্রত্যাবর্তনকারী এক কুরাইশ কাফেলার সঙ্গে প্রচুর ধনমাল রয়েছে। সুতরাং গণীমত হিসেবে এ সকল মালপত্র তোমাদের হাতে দিয়ে দিবেন। তোমরা এর জন্য বেরিয়ে পড়। হয়ত আল্লাহ পাক গনীমত হিসেবে এ সকল মালপত্র তোমাদের হাতে দিয়ে দিবেন।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এ উদ্দেশ্যে গমন কারো উপর জরুরী বলে উল্লেখ করেননি। বরং এটাকে তিনি জনগণের ইচ্ছে এবং আগ্রহের উপর ছেড়ে দেন। কেননা এ ঘোষণার সময় এটা মোটেই ধারণা করা হয়নি যে, এ কাফেলার সঙ্গে বুঝাবুঝির পরিবর্তে

শক্তিশালী কুরাইশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে বদর প্রান্তরে ভয়াবহ এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মোকাবালা করতে হবে। আর এ কারণেই বহু সাহাবী মদীনাতেই রয়ে গিয়েছিলেন। তাদের অভিযানগুলোর মতই সাধারণ একটা কিছু হবে। আর এ কারণেই যারা এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি তাদের অভিযোগও উত্থাপিত হয় নি।

## □ ১০.মক্কার পরিস্থিতি:

রাসূলুল্লাহর ﷺ ফুফু আতিকা বিনত আবদুল মুত্তালিব মক্কায় থাকতেন। তিনি সে রাতে একটি স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখলেন যে, এক লোক উটে চড়ে দ্রুত মক্কার দিকে আসছে এবং সে মক্কার অধিবাসীদেরকে চিৎকার করে ডাকছে। তার উট প্রথমে কাবাঘরের উপর, তারপর মক্কার এক পাহাড়ের চূড়ার উপর গিয়ে দাঁড়াল। তারপর সে কুরাইশদের সাবধান করে বললো, 'তিনদিনের মধ্যে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।' এ কথা বলে লোকটি একটি পাথর নিয়ে পাহাড়ের চূড়া থেকে ছুঁড়ে মারলো। পাথরটি মক্কার ভূমিতে পড়ামাত্র বিস্ফোরিত হলো। মক্কার প্রতিটি ঘরে সেই বিস্ফোরণ থেকে ছিটকে আসা বস্তু আঘাত হানলো।

আতিকা এই স্বপ্ন দেখে খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি তাঁর ভাই আল-আব্বাসকে স্বপ্নের কথা জানান এবং অন্য কাউকে এর কথা জানাতে নিষেধ করেন। আল-আব্বাস সব কিছু শুনে তাঁর বোনকে এ ব্যাপারে চুপ থাকতে বলেন। কিন্তু আল-আব্বাস নিজেই বন্ধু ওয়ালীদ ইবন উতবাকে এই স্বপ্নের কথা বলে দেন। আবার এও বলে দেন যেন সে অন্য কাউকে এই স্বপ্নের কথা না বলে। কিন্তু ওয়ালীদ তাঁর পিতাকে এই স্বপ্নের কথা জানিয়ে দেন। আর এভাবেই এই সংবাদ সারা মক্কায় ছড়িয়ে পড়ে। আল আব্বাস বলেছেন, 'আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে কাবা তাওয়াফ করতে গিয়ে দেখি সেখানে আবু জাহেল অন্যান্য কুরাইশ নেতাদের সাথে বসে আতিকার স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করছে।' আল-আব্বাসকে দেখে আবু জাহেল তাকে তাওয়াফ সেরে তাদের সাথে আলোচনায় বসতে বলে। তাওয়াফ শেষে আল-আব্বাস তাদের আলোচনায় যোগ দেয়।

তখন আবু জাহেল তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তা কতদিন ধরে তোমাদের পরিবারে এই মহিলা নবী আছে?' আব্বাস আবু জাহেলের কথা না বুঝার ভান করলেন। আবু জাহেল এরপর আতিকার স্বপ্নের প্রসঙ্গ তুলে প্রচণ্ড শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে বললো, 'তোমরা যারা আবদুল মুত্তালিবের পরিবার, তোমাদের তো একটা পুরুষ নবী আছেই, তাতেও দেখি তোমরা খুশি নও, এখন দেখছি মহিলা নবীও বানিয়ে নিয়েছ।' এরপর আবু জাহেল বললো, 'আতিকা তিনদিনের আল্টিমেটাম দিয়েছে, তো আমরা ভাবছি এই তিনদিন অপেক্ষা করে দেখবো আদৌ কিছু হয় কি না! এর মধ্যে সে যা বলেছে তা সত্যি না হলে তোমাদেরকে আরবের সবচেয়ে বড় মিথ্যুক বলে ঘোষণা দেওয়া হবে।'

আল আব্বাস বর্ণনা করেন, 'আতিকার স্বপ্ন দেখার তৃতীয় দিন সকালের কথা, এই ভেবে আমার মেজাজ প্রচণ্ড খারাপ হয়ে যাচ্ছিল যে আমি কেন আবু জাহেলকে সেদিন কোনো কথা না শুনিয়ে ছেড়ে দিলাম। আমি মসজিদে গিয়ে আবু জাহেলকে দেখলাম। তাকে দেখে মনে মনে ভাবছি, আজকে তাকে কথা শুনিয়েই ছাড়বো, এই ভেবে আমি তার দিকে এগোচ্ছি। আবু জাহেল ছিল ঘাগু মানুষ। ধারালো চেহারা, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর আর শাণিত তার চাহনি। কিন্তু তাকে মসজিদের দরজার দিকে দৌড়ে আসতে দেখে আমি মনে মনে ভাবলাম, এই লোকের আবার কী হলো? সে কি আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ভয়ে এরকম করছে? আসলে সে কিছু একটা শুনে ভয় পেয়েছিল যা আমি তখনও শুনতে পাইনি।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে তখন দামদাম ইবন আমর আল-ঘিফারী। এই লোককেই আবু সুফিয়ান জরুরি সংবাদসহ পাঠিয়েছিল। সে আতিকার স্বপ্নের তিনদিন পর মক্কায় এসে পৌঁছায়। সে মক্কায় এসে উট থেকে নেমে উটের নাক কেটে ফেলে এবং লাগামটি নিচে নামিয়ে নিজের জামা টেনে ছিঁড়ে ফেলে চিৎকার করে লোকজনকে ডেকে বলতে লাগলো, 'হে কুরাইশ! কাফেলা! কাফেলা! মুহাম্মাদ ও তাঁর লোকেরা আবু সুফিয়ানের কাছে রক্ষিত তোমাদের সম্পদ দখল করার জন্য আসছে। আমার মনে হয় না তোমরা তা রক্ষা করতে পারবে। সাহায্য! সাহায্য!'

তার এই কর্মকাণ্ড দেখে মক্কার সবার তখন দিশেহারা অবস্থা। আল-আব্বাস বলেন, 'এ কথা শোনার পর সবাই ব্যক্তিগত আক্রোশের কথা ভুলে গেল।' তখন সবার মনোযোগ পড়লো কাফেলা রক্ষার দিকে। কাফেলা রক্ষা করার জন্য কুরাইশের লোকেরা একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিতে লাগল।

## □ মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ও তাদের নেতৃত্বের বিন্যাস :

রাসূলুল্লাহ) বদর অভিযানে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গী হলেন তিন শতাধিক সাহাবী। তিন শতাধিক বলতে সে সংখ্যাটি হতে পারে ৩১৩, ৩১৪ কিংবা ৩১৭ যাদের মধ্যে ৮২, ৮৩ কিংবা ৮৬ জন ছিলেন মুহাজির এবং অন্যেরা ছিলেন আনসার। আনসারদের মধ্যে আবার ৬১ জন ছিলেন আউস গোত্রের এবং ১৭০ জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের লোক। যুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনীর যে প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজন এ রকম কোন প্রস্তুতিই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাহিনীর ছিল না। এমনকি যুদ্ধ প্রস্তুতির কোন ব্যবস্থাও ছিল না। তিন শতাধিক লোক বিশিষ্ট এ বাহিনীর জন্য মাত্র দুটি ঘোড়া ছিল। যুবাইর ইবনু 'আউওয়াম)-এর ছিল একটি এবং মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ কিনদী)-এর ছিল অপরটি। উট ছিল সত্তরটি, এক এক উটের উপর পালাক্রমে আরোহণ করতেন দু' কিংবা তিন জন লোক। রাসূলুল্লাহ ﷺ,আলী রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং মারসাদ ইবনু আবী মারসাদ গানাভী রাদিআল্লাহু আনহা এর জন্য বরাদ্দ ছিল একটি উট। তাঁরা তিন জন পালাক্রমে আরোহণ করতেন সেই উটটির উপর।

মদীনায় ব্যবস্থাপনা ও সালাতে ইমামত করার দায়িত্ব প্রথমে অর্পণ করা হয়েছিল ইবনু উম্মু মাকতুম রাদিআল্লাহু আনহা এর উপর। কিন্তু 'রাওহা' নামক স্থানে পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু লুবাবাহ ইবনু আবদিল মুনযির রাদিআল্লাহু আনহা কে মদীনার ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করে পাঠিয়ে দেন।

এরপর আসে যুদ্ধ পূর্ব অবস্থার কথা। সার্বিক নেতৃত্বের পতাকা প্রদান করা হয় মুস'আব ইবনু 'উমায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহা কে। এ পতাকার রঙ ছিল সাদা। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিম বাহিনীকে দুটি দলে বিভক্ত করেন:

১। মুহাজিরদের সমন্বয়ে গঠিত যার পতাকা দেয়া হয় 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব রাদিয়াল্লাহু আনহা কে। যাকে ইক্বাব বলা হয়।

২। আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত যার পতাকা দেয়া হয় সা'দ ইবনু মু'আয রাদিয়াল্লাহু আনহা কে। এ দুটি পতাকা ছিল বর্ণের।কালো সেনাবাহিনীর ডান দিকের দলপতি নিযুক্ত করা হয় যুবাইর ইবনু 'আউওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহা কে এবং বাম দিকের দলপতি নিযুক্ত করা হয় মিকদাদ ইবনু 'আমর রাদিয়াল্লাহু আনহা কে।কারণ, সমগ্র সেনাবাহিনীর মধ্যে মাত্র এ দুজনই ছিলেন অশ্বারোহী। সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগের দলপতি নিযুক্ত হন কায়স ইবনু আবী সা'সা'আহ রাদিআল্লাহু আনহা আর প্রধান সেনাপতি হিসেবে সমগ্র বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ।

## ☐ মক্কাবাসীগনের যুদ্ধ প্রস্তুতি:

কাফেলা আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ শ্রবণে সমগ্র মক্কা উপত্যকায় একদম হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। চতুর্দিক থেকে সকলে দৌড়ে এসে বলতে থাকল, মুহাম্মদ ﷺ এবং তার সঙ্গী সাথিরা কি মনে করেছে যে, এ কাফেলাও ইবনু হাযরামীর কাফেলার মতই? না, না, কখনই না। আল্লাহর শপথ! এ কখনই সেরূপ নয়। শীঘ্রই তারা জানতে পারবে যে, আমাদের ব্যাপারটি অন্য রকম।'

সমগ্র মক্কা শহরে তখন দু'শ্রেণীর লোক চোখে পড়ছিল। এক শ্রেণীর লোক যুদ্ধ প্রস্তুতি সহকারে যুদ্ধ গমন করছিল এবং অন্যদল নিজের পরিবর্তে অন্যকে যুদ্ধে প্রেরণ করছিল। আর এভাবে প্রায় সবাই ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। বিশেষ করে মক্কার সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কেউই পিছনে ছিলেন না। শুধু আবূ লাহাব নিজে না এসে তার একজন ঋণী ব্যক্তিকে পাঠিয়েছিলেন। আশে-পাশে অন্যান্য আরব

গোত্রগুলোকেও তারা নিজেদের দলভুক্ত করে নিল। কুরাইশ গোত্রসমূহের মধ্যে একমাত্র বনু 'আদী ছাড়া আর কোন গোত্রই পিছনে রইল না। বনু 'আদী গোত্রের কোন লোকই এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করল না।

## ☐ মক্কা সেনাবাহিনীর সংখ্যা:

প্রথমাবস্থায় মক্কা বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল তের শত। তাদের কাছে ছিল একশ ঘোড়া এবং ছয়শ লৌহবর্ম উটের সংখ্য এত বেশী ছিল যে, তার কোন হিসাব কিতাবই ছিল না। সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিল আবু জাহল ইবনু হিশাম। এ বাহিনীর রসদ পত্রের দায়িত্বে ছিল নয় জন সম্ভ্রান্ত কুরাইশ। কোন দিন নয়টি এবং কোন দিন দশটি এভাবে প্রতিদিন উট জবেহ করা হতো।

## ☐ রণক্ষেত্রে অবস্থান:

যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে। তিনি ভাবছেন কোন অবস্থানে থেকে যুদ্ধ করলে কৌশলগত সুবিধা হবে। তিনি ভেবেচিন্তে একটি অবস্থান নির্বাচন করলেন। তখন একজন আনসারী সাহাবি, আল হাব্বাব ইবন আল মুনযির রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ, আল্লাহ কি আপনাকে ওয়াহীর মাধ্যমে এই জায়গা নির্ধারণ করতে আদেশ দিয়েছেন নাকি আপনি কৌশলগত কারণে জায়গাটি পছন্দ করেছেন?

আল হাব্বাবের প্রশ্নের ধরনটি লক্ষণীয়। তিনি জানতে চাইছেন সেই নির্দিষ্ট জায়গাটি পছন্দ করার কারণ কী। যদি এটি আল্লাহর তরফ থেকে ওয়াহী হয়, তাহলে আল হাব্বাব তা নির্দ্বিধায় মেনে নিতেন, কিন্তু যদি যুদ্ধের কোনো কৌশল হয় তাহলে তাঁর কিছু বলার আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, 'না, এটা ওয়াহী নয়, এটা নিছক

যুদ্ধের কৌশল। আল মুনযির তখন প্রস্তাব করলেন যে, তাদের উচিত বদরের কুয়া পর্যন্ত পৌঁছানো এবং কুয়াকে পেছনে রেখে একটি জলাধার তৈরি করে কুয়ার সামনে অবস্থান নেওয়া। তিনি এর পেছনে যুক্তিও দেখালেন। মুসলিমরা যদি এই অবস্থানে

থাকে তাহলে কুরাইশরা পানির নাগাল পাবে না কিন্তু মুসলিমদের দখলে প্রচুর পানি থাকবে। রাসূলুল্লাহ তাঁর এই প্রস্তাব খুবই পছন্দ করলেন এবং সে অনুযায়ী যুদ্ধের অবস্থান বেছে নিলেন।

## ◻ আল্লাহর সাহায্য ও রহমতের বৃষ্টিপাত:

যুদ্ধের আগের রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি স্বপ্ন দেখলেন। যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে আল্লাহ তাদের মনে স্বপ্নের মাধ্যমে শক্তি যোগান। স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখলেন যে বাস্তব সংখ্যার চেয়ে কুরাইশ বাহিনীর সৈন্যের সংখ্যা খুবই কম। কেন আল্লাহ আযযা ওয়াজাল, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কুরাইশ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা বাস্তব সংখ্যার চেয়ে কম দেখালেন? আল্লাহ আযযা ওয়াজাল চেয়েছিলেন মু'মিনদের অন্তর দৃঢ় রাখতে। কুরাইশ বাহিনী ছিল মুসলিম বাহিনীর তিনগুণ। এটা মুসলিমদের মনোবল দুর্বল হওয়ার কারণ হতে পারে। যদি কোনো সৈন্য এটা ভেবে যুদ্ধের ময়দানে যায় যে, তাদের জেতার কোনো সম্ভাবনাই নেই, তাহলে সে যুদ্ধের ময়দানে ভেঙে পড়বে। এ কারণে আল্লাহ তাআলা কুরাইশদের সৈন্য সংখ্যা কমিয়ে দেখান যেন মুসলিমরা হতোদ্যম হয়ে না পড়ে।

"আর স্মরণ করো, যখন আল্লাহ স্বপ্নে আপনাকে সেসব কাফেরের পরিমাণ অল্প করে দেখালেন বেশি করে দেখালে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং এ বিষয় নিয়ে তোমরা একে অপরের সাথে বিতর্ক শুরু করে দিতে- কিন্তু আল্লাহ (এটা হতে না দিয়ে) তোমাদের রক্ষা করেছেন। মানুষের অন্তরে যা কিছু লুকিয়ে রয়েছে, তা তিনি জানেন।" (সূরা আনফাল, ৮:৪৩)

আরবে তখন বৃষ্টির মৌসুম ছিল না, কিন্তু তবু পরদিন সকালে বৃষ্টি হয়েছিল। ইবনে ইসহাক বলেছেন যে, উপত্যকাটি ছিল নরম আর এমনভাবে আর্দ্র করে দিয়েছিল যে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কষ্ট হয়নি। অপরদিকে কুরাইশদের উপর মতো সামনে এগুতেই

পারছিল না।। বাদামী, আকাশ থেকে পানি মাটিকে এবং তাঁর বাহিনীর অগ্রসর হতে এতই বৃষ্টি হয়েছিল যে, তাঁরা ঠিক মতো সামনেই এগুতেই পারছিল না।

এই বৃষ্টি দুপক্ষের উপরেই বর্ষিত হয়েছিল; মুসলিম আর কাফিরদের উপর, কিন্তু মুসলিমদের জন্য মাটি হয়েছিল আর্দ্র আর নমনীয়। অথচ একই বৃষ্টি কুরাইশদের জন্য মাটিকে করে দিয়েছিল কর্দমাক্ত আর দুঃসাধ্য। এটা তাদের সেনাবাহিনীকে বিপাকে ফেলে দেয়। একই বৃষ্টি কিন্তু দুপক্ষের উপর দু'রকম প্রভাব, এটি ছিল আল্লাহ আযযা ওয়া জালের পক্ষ থেকে বিশেষ সাহায্য। সেই সকালে কিছু মুসলিম স্বপ্নদোষের কারণে অপবিত্র অবস্থায় ঘুম থেকে উঠেছিলেন। শয়তান মুসলিমদের মনে। ওয়াসওয়াসা দিচ্ছিল, 'কীভাবে তোমরা অপবিত্র অবস্থায় যুদ্ধ করবে?" তাই আল্লাহ ওই মুসলিমদের অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পানি বর্ষণ করে তাদের পবিত্র করে দিয়েছিলেন।

"আর স্মরণ করো, যখন আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের নিরাপত্তা আর স্বস্তির জন্য তোমাদের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছেন এবং তোমাদের ওপর তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টির পানি নাযিল করেছেন- উদ্দেশ্য ছিল এ পানি দ্বারা তিনি তোমাদের পবিত্র করবেন, তোমাদের মন থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করবেন, তোমাদের মনে বৃদ্ধি করবেন সাহস এবং (সর্বোপরি যুদ্ধের ময়দানে) তিনি এর মাধ্যমে তোমাদের পদক্ষেপ মজবুত করবেন।" (সূরা আনফাল, ৮: ১১)

## ☐ ১১.যুদ্ধমঞ্চ:বদর

রাসূলুল্লাহ ﷺ তীক্ষ্ণ চোখে সৈনিকদের সারির দিকে লক্ষ্য রাখছেন। তাঁর হাতে একটি তীর। তিনি যুদ্ধে সেনাদের সারি এমনভাবে সোজা করে সাজাতেন যেন তিনি সালাতের কাতার সোজা করছেন। সারিতে দাঁড়ানো এক সৈন্যের নাম ছিল সাওয়াদ ইবন গাযিয়াহ। তিনি তাঁর সারি থেকে একটু সামনে এগিয়ে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পেটে আস্তে করে তীর দিয়ে একটি খোঁচা দিয়ে তাকে সারির ভেতর ঠেলে দিলেন। সাওয়াদ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে আঘাত করেছেন, আমি এর

বদলা নিতে চাই।' এটা ছিল যুদ্ধের কিছুক্ষণ আগের ঘটনা। এক যোদ্ধা আাসূলুল্লাহকে বলছে সে বদলা নিতে চায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পেট উন্মুক্ত করে দিয়ে বললেন, 'বদলা নেবে! নাও!'

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহিনী সাজালেন, লড়াইয়ের স্থান বাছাই করলেন, তাঁর সঙ্গীদের সাথে পরামর্শ করলেন – একে একে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন। জাগতিক সকল প্রস্তুতি নেওয়া শেষ করে এরপর তিনি আল্লাহ উপর ভরসা করে দুআ করলেন। এটিই হলো তাওয়াক্কুল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক পাশে গিয়ে দুই হাত তুলে দীর্ঘ সময় ধরে আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। তিনি খুব গভীরভাবে আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। তিনি বললেন,

'হে আল্লাহ! তুমি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছো, তা পূরণ করো। আমি তোমার কাছে প্রতিশ্রুত সাহায্যের আবেদন করছি। তা না হলে দুনিয়ার বুকে তোমার ইবাদাত করার মতো আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।'

রাসূলুল্লাহর ﷺ দীর্ঘ দুআর পর আল্লাহ তাঁকে বিজয়ের সুসংবাদ দেন।

"আর স্মরণ করো, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট (কাতর কণ্ঠে) ফরিয়াদ করছিলে, তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যে, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে পর পর আগমনকারী এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করছি।" (সূরা আনফাল, ৮: ৯)

আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জানিয়ে দিলেন তিনি ১০০০ ফেরেশতা পাঠাবেন। কাফিরদের সাথে লড়তে একজন ফেরেশতাই যথেষ্ট, জিবরীল তাঁর পাখার সরু প্রান্ত দিয়েই পুরো লূত জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তারপরেও আল্লাহ তাআলা এক হাজার ফেরেশতা পাঠানোর ওয়াদা করেছেন। কারণ তিনি চেয়েছেন আল্লাহর রাসূলের মনে স্বস্তি এনে দিতে। এখানে সংখ্যা আসল কথা নয়, আসল কথা হলো রাসূলুল্লাহর মনের প্রশান্তি।

“সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর তুমি মাটির মুষ্ঠি নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ স্বয়ং যেন ঈমানদারদের প্রতি ইহসান করতে পারেন যথার্থভাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু শোনেন এবং জানেন।" (সূরা আনফাল, ৮: ১৭)

## ☐ আবু জাহেল:এক ফেরাউনের জীবনাবসান-

এই যুদ্ধেই কুরাইশদের জাঁদরেল নেতা, ইসলামের ঘোরতর শত্রু আবু জাহেলের শেষ পরিণতি হয়। ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন আব্দুর রাহমান ইবন আউফ। যুদ্ধের ময়দানে সেদিন আব্দুর রহমান ইবন আউফের পাশে যুদ্ধ করছিল দুই বাচ্চা ছেলে। তিনি বাচ্চা দুটোকে দেখে মনে মনে বিরক্ত হলেন। সৈনিকরা সবসময় চায় তাদের পাশে শক্তিশালী সহযোদ্ধা থাকুক। যুদ্ধ চলছে, এ অবস্থায় আব্দুর রাহমান ইবন আউফকে তাঁর ডান পাশের ছেলেটি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, 'চাচা, এখানে আবু জাহেল কে? আমাকে একটু দেখিয়ে দিন।' আব্দুর রাহমান ইবন আউফ জিজ্ঞেস করলেন, 'বালক, তুমি আবু জাহেলকে কেন খুঁজছো?' ছেলেটি জবাব দিল, 'আল্লাহর কসম! আমি যদি তাকে দেখতে পাই তাহলে তাকে হত্যা করবো অথবা আমি নিজে মরে যাব।' এই কথা শুনে আব্দুর রাহমান ইবনে আউফ বুঝলেন তিনি ছেলেগুলোকে যেমন ভেবেছিলেন তারা তেমন নয়, তারা অনেক সাহসী। আব্দুর রাহমান ডান পাশের সেই ছেলেকে আবু জাহেলের অবস্থান দেখিয়ে দিলেন।

ইবনে কাসির (রহ) আবু জাহেলের মৃত্যু সম্পর্কে বলেন,'আবু জাহেলের মৃত্যু হয়েছিল আনসারী এক যুবকের হাতে। এরপর আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ তার বুকের ওপর পা দিয়ে উঠে দাঁড়ান। এর মাধ্যমে আল্লাহ মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি দিয়েছেন। আবু জাহেলের স্বাভাবিক মৃত্যু হতে পারতো, ছাদ ধসে কিংবা বজ্রপাতে। কিন্তু লাঞ্ছনার মাধ্যমে তার মৃত্যু হওয়ায় ঈমানদারদের অন্তর বেশি প্রশান্ত হয়েছে।'

"যুদ্ধ কর ওদের সাথে – আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন – আর দূর করবেন তাদের মনের ক্ষোভ। আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” (সূরা তাওবাহ, ৯: ১৪-১৫)

এখানে প্রতিশোধের ব্যাপারটি জড়িত। মুসলিমরা দীর্ঘদিন ধরে মক্কার কুরাইশদের হাতে অত্যাচারিত হয়েছিল। তাই আল্লাহ মু'মিনদের হাতে কাফিরদের শাস্তি দিয়েছেন যেন তাদের পরিণতি দেখে 'মু'মিনদের অন্তর শান্ত হয়' এবং 'তাদের মনের ক্ষোভ দূর হয়'।

## ▢ আবু লাহাবের মৃত্যু-

কুরাইশদের মধ্যে যারা যুদ্ধে যায়নি, তাদের মধ্যে একজন ছিল আবু লাহাব। তবে সে তার বদলে অন্য একজনকে যুদ্ধ করতে পাঠিয়েছিল। বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের খবর শুনে কুরাইশদের গুরুত্বপূর্ণ নেতা আবু লাহাবের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা বর্ণনা করেছেন মক্কার এক মুসলিম,রাফি। রাফি ছিলেন আল আব্বাসের একজন দাস, সে পরিবারের সবাই ছিল মুসলিম। রাফি,আল আব্বাস, আল আব্বাসের স্ত্রী উম্মুল ফাদল - তারা প্রত্যেকেই মুসলিম ছিলেন। রাফির কাজ ছিল তীর বানানো। একদিন সে কাবার উঠানে বসে তীরে ধার দিচ্ছিল, আবু লাহাব তার সামনে পিঠ দিয়ে বসা। কুরাইশদের এক যোদ্ধাকে আসতে দেখে আবু লাহাব তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'এসো, যুদ্ধে কী ঘটেছে আমাদেরকে জানাও'। লোকটি বললো, 'যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে আমরা নিজেদেরকে তাদের হাতে মরার জন্য আর বন্দী হওয়ার জন্য তুলে দিলাম। কিন্তু আমি আসলে এজন্য কাউকে দোষারোপ করবো না, কারণ আমরা যাদের সাথে যুদ্ধ করছিলাম তারা ছিল আকাশ ও যমীনের মাঝে ঘোড়ায় সওয়ারী সাদা পোশাক পরা কিছু পুরুষ। তাদের সাথে মোকাবেলায় আমরা কিছুতেই টিকতে পারছিলাম না।'

এই সৈন্য বলতে চাচ্ছিল যে, হ্যাঁ এটি সত্য যে কুরাইশরা হেরেছে কিন্তু এখানে মুসলিমদের কোনো কৃতিত্ব নেই। কৃতিত্ব হলো আকাশ থেকে ঘোড়ায় চড়ে আসা সাদা পোশাকধারী সেই লোকদের। তাদেরকে কোনোভাবেই থামানো যাচ্ছিল না। এই বর্ণনা শুনে রাফি নিজের আনন্দ চেপে রাখতে পারলো না। মনের অজান্তেই সে আবু লাহাবের সামনে বলে বসলো, 'আল্লাহর কসম! তাঁরা ছিলেন মালাইকা!' আবু লাহাব সে কথা শুনে রাফির মুখে ঘুষি মেরে বসলো। বদলা নিতে রাফিও এগিয়ে গেল। কিন্তু আবু লাহাব তাঁর চেয়ে অনেক শক্তিশালী ছিল। সে রাফির উপরে বসে তাকে মারতে লাগলো। তখন উম্মুল ফাদল লাঠি দিয়ে আবু লাহাবের মাথায় জোরে আঘাত করে তাকে সরিয়ে দিয়ে বললো, 'কী মনে করেছো তুমি? তার মনিব নেই বলে তুমি তাকে যেভাবে খুশি মারতে পারবে?'

আবু লাহাব চলে গেল। এক সপ্তাহ পরের ঘটনা, আবু লাহাব এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। তার মাথায় আঘাতের স্থান থেকে সারা শরীরে ঘা হয়ে যায়। এই রোগটি এমনই ভয়ানক ছিল যে, এই রোগের রোগীর কাছেও কেউ যেতো না। আবু লাহাব মারা গেল, কিন্তু কেউ তাকে কবর দিতে আসলো না। তিন দিন পার হয়ে গেল, তার শরীর পঁচতে শুরু করলো। আবু লাহাবের দুই ছেলেকে ডেকে বলা হলো, 'লজ্জা লাগে না তোদের? তিন দিন ধরে তোদের বাপ ঘরে মরে পড়ে আছে আর তোরা কেউ তাকে কবরও দিচ্ছিস না!' তারা বললো তারা ওই রোগের ভয়ে কাছে যেতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত তারা কোনোমতে আবু লাহাবের লাশ টেনে-হিঁচড়ে মক্কার বাইরে একটি দেওয়ালের কাছে ফেলে রাখলো এবং দূর থেকে পাথর ছুঁড়ে তার মৃতদেহ ঢেকে দিল। তারা আবু লাহাবের জন্য কবর পর্যন্ত খোঁড়েনি। অপমানের সাথে সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

## ☐ ১২.উহুদের যুদ্ধ:

**প্রেক্ষাপট**

১) ধর্মীয় বিরোধ:কুরাইশের লোকজন দ্বীন ইসলামের অগ্রগতি মেনে নিতে পারছিল না।

"নিশ্চয়ই যারা কুফরি করেছে এবং নিজেদের ধন-সম্পদ (এ খাতেই) ব্যয় করেছে যে, (এর দ্বারা) মানুষদের আল্লাহ তাআলার পথ থেকে ফিরিয়ে রাখবে; (এদের জন্য তুমি ভেবো না)। এরা (এ পথে) ধন-সম্পদ আরও ব্যয় করবে, অতপর একদিন সে (ব্যয় করা) টাই তাদের জন্যে মনস্তাপের কারণ হবে। এরপর (দুনিয়ার জীবনেও) তারা পরাভূত হবে, আর যারা কুফরি করেছে আখিরাতে তাদের সবাইকে জাহান্নামের পাশে একত্রিত করা হবে।" (সূরা আনফাল, ৮: ৩৬)

কাফিররা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে রাখতে তাদের সম্পদ খরচ করবে। ইমাম আশ-শাওকানি এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, 'এই কাফিররা রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে, সৈন্যসামন্ত প্রেরণ করে, তার জন্য যত লাগে অর্থ খরচ করে। তাদের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে মুসলিম হওয়া থেকে বিরত রাখা। বর্তমানকালেও এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। ইসলামের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে আল্লাহর দুশমনরা ব্যয় করছে লক্ষ লক্ষ ডলার, যেন আল্লাহর আউলিয়াদের হত্যা করতে পারে, তাদের পাকড়াও করতে পারে, ইসলামের সুনাম মিটিয়ে দিতে পারে। এ যুগের কাফিররাও কুরাইশদের চেয়ে ব্যতিক্রম নয়।

২) প্রতিশোধ:কুরাইশরা চাচ্ছিল বদর যুদ্ধের গ্লানি মুছে যাক। বদরে পরাজয় তাদের অন্তর্জালা বাড়িয়ে দেয়, তাই তারা প্রতিশোধের পথ খুঁজছিল।

৩) অর্থনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণ:কুরাইশদের ওপর ক্রমাগত সামরিক হামলা তাদেরকে চাপের মুখে ফেলে দেয়। কুরাইশরা ছিল আরব গোত্রগুলোর চোখে শ্রদ্ধার পাত্র। তাদের ব্যবহারের জন্য সিরিয়া ও ইয়েমেনের বাণিজ্যিক পথ বেদুইনরা উন্মুক্ত

রেখেছিল। কিন্তু মুসলিমদের উত্থানের সাথে পরিস্থিতি ইতিমধ্যে অনেকটাই বদলে গেছে। কুরাইশরা ছিল কাবা ঘরের অভিভাবক। কিন্তু যেহেতু আল্লাহর দ্বীনকে তারা পরিত্যাগ করেছে, তাই আল্লাহ তাদের জন্য পরিস্থিতি কঠিন করে দিলেন। মক্কা থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথ অনিরাপদ হওয়ার কারণে মক্কা থেকে ইয়েমেন গিয়ে ব্যবসা করার ওপরও প্রভাব পড়ে। কারণ কুরাইশরা সিরিয়া থেকে কাঁচামাল কিনে তা ইয়েমেনে বিক্রি করতো, আবার ইয়েমেন থেকে কিনে সিরিয়াতে বিক্রি করতো। একটা বাণিজ্যিক পথ অনিরাপদ হয়ে যাওয়ার ফলে, সেই পথের ব্যবসা তো বটেই, অন্য পথের ব্যবসাও ক্ষতিগ্রস্ত হলো। কুরাইশদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহর ﷺ যুদ্ধ কেবল ময়দানের যুদ্ধে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং একই সাথে তা ছিল অর্থনৈতিক যুদ্ধ। কুরাইশদের শঙ্কা সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যার একটি কথাতেই পরিষ্কার বোঝা যায়,

‘মুহাম্মাদ আর তার দলবল আমাদের ব্যবসার বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে। বুঝতে পারছি না এখন কী করবো। অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। তারা উপকূলীয় অঞ্চলগুলোর সাথেও শান্তিচুক্তি বা মিত্রতা করে রেখেছে। প্রতিনিয়ত সেখান থেকে হুমকি আসছে। এখন আমরা কোথায় থাকবো? কোথায় যাব? আমাদের ব্যবসা গ্রীষ্মে সিরিয়াগামী কাফেলা আর শীতে ইয়েমেন ও আবিসিনিয়াগামী কাফেলার ওপর নির্ভরশীল। যদি সেই ব্যবসা বন্ধ করে নিজের দেশে বসে থাকি তাহলে জমানো মূলধন ভেঙে খেতে হবে। আর দেখতে দেখতেই সেটা শেষ হয়ে যাবে।'

৪) রাজনৈতিক আধিপত্য পুনরুদ্ধার:আরব উপদ্বীপের সবাই কুরাইশদের সমীহের চোখে দেখত। কিন্তু মুসলিমদের উত্থান তাদের দীর্ঘদিনের একচ্ছত্র আধিপত্যকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে দেয়। তাই আরেকটি যুদ্ধে মুসলিমদের হারানোর মাধ্যমে তারা এই আধিপত্য ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে পড়ে।

## □ কুরাইশ সেনাবাহিনীর যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম এবং কামান:

বছর পূর্ণ হতে না হতেই কুরাইশের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে গেল। কুরাইশ, তাদের মিত্র এবং দুর্বৃত্ব শ্রেনী মিলে তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনীর সঙ্গে ১৫ জন মহিলা গেল।কুরাইশ নেতৃবর্গের ধারণায় মেয়েদেরকে সঙ্গে রাখলে তাদের মান-সম্ভ্রম রক্ষাহেতু বেশী করে বীরত্ব প্রকাশ করার ও আমরণ লড়ে যাওয়ার প্রেরণা লাভ করা যাবে।

সওয়ারীর জন্য তাদের সঙ্গে ছিল তিন হাজার উট এবং যুদ্ধের জন্য ছিল দু'শটি ঘোড়া।' ঘোড়াগুলোকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখার জন্য ওগুলোর পিঠে আরোহণ করা হয়নি। প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে সাত'শটি ছিল লৌহবর্ম। পুরো বাহিনীর জন্য আবূ সুইয়ানকে সেনাপতি নির্বাচন করা হয় এবং খালিদ ইবনু ওয়ালীদকে ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়, আর 'ইকরামা ইবনু আবূ জাহলকে তার সহকারী বানানো হয়। প্রথা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পতাকা বনু আবদিদ্দার গোত্রের হস্তে সমর্পণ করা হয়।

## □ ইসলামী সেনাবাহিনীর বিন্যাস এবং যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে যাত্রা:

রাসূলুল্লাহ ﷺ জুম'আর সালাতে ইমামত করেন। খুতবা দানকালে তিনি জনগণকে উপদেশ দেন। সংগ্রামের প্রতি উৎসাহিত করেন এবং বলেন যে, 'ধৈর্য্য ও স্থিরতার মাধ্যমেই বিজয় লাভ সম্ভব হতে পারে। এছাড়া তিনি তাদেরকে এ নির্দেশও দান করেন যে, তারা যেন মোকাবালার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়।' তাঁর এ নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে জনগণের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়।

জনগণ তাঁর আগমনের অপেক্ষায় তো ছিলেনই, কিন্তু তাঁর আগমনের পূর্বে সা'দ ইবনু মু'আয উসাইদ ইবনু হুযায়ের জনগণকে বলেন, 'আপনারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জোর করে ময়দানে বের হতে উত্তেজিত করেছেন। সুতরাং এখন ব্যাপারটা তাঁর উপরই ন্যস্ত করুন।' এ কথা শুনে জনগণ লজ্জিত হলেন এবং যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বের হয়ে আসলেন তখন তাঁরা তাঁর নিকট আরয করলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল!

আপনার বিরোধিতা করা আমাদের মোটেই উচিত ছিল না। সুতরাং আপনি যা পছন্দ করেন তাই করুন।যদি মদীনার অভ্যন্তরে অবস্থান করাই আপনি পছন্দ করেন তবে সেখানেই অবস্থান করুন, আমরা কোন আপত্তি করব না।' তাঁদের এ কথার জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'কোন নাবী যখন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যান তখন তাঁর জন্যে অস্ত্রশস্ত্র খুলে ফেলা সমীচীন নয়, যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাঁর ও শত্রুদের মধ্যে ফায়সালা করে না দেন।'

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেনাবাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করেন :

১.মুহাজিরদের বাহিনী। এর পতাকা মুস'আব ইবনু 'উমায়ের আবদারী (রা)কে প্রদান করেন।

২.আউস (আনসার) গোত্রের বাহিনী। এর পতাকা উসাইদ ইবনু হুযাইর(রা)কে প্রদান করা হয়।

২. ৩.খাযরাজ (আনসার) গোত্রের বাহিনী। এর পতাকা হুবাব ইবনু মুনযির(রা)কে প্রদান করা হয়।

মোট সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল ১০০০,যাদের মধ্যে ১০০ জন ছিল বর্ম পরিহিত এবং ৫০ জন ছিলেন ঘোড়সওয়ার।

## □ শুরু হলো যুদ্ধ

মূল যুদ্ধের আগে দ্বন্দ্বযুদ্ধ ছিল আরবদের প্রথা। উহুদেও তার ব্যতিক্রম হলো না। কুরাইশদের পতাকাবাহক তালহা ইবন উসমান মুসলিমদের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল, 'মুসলিমদের মধ্যে কে আছো আমার সাথে লড়বে? আসো, আসো, পারলে আমাকে দোজখে পাঠাও। নইলে নিজেই বেহেশতে জায়গা করে নাও!'

তার ঔদ্ধত্যভরা কথা শুনে আলী শান্ত থাকতে পারলেন না। তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এগিয়ে গেলেন। তরবারির এক কোপে তালহার শরীর থেকে তার পা বিচ্ছিন্ন করে

দিয়ে তাকে সেভাবেই ফেলে রেখে চলে এলেন। তবে ভিন্ন বর্ণনায় এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে আলী নয়, যুবায়ের অংশ নিয়েছেন।

যুদ্ধের আগে রাসূলুল্লাহ একটি তরবারি হাতে নিয়ে সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন,

- কে আছে আমার হাত থেকে এই তরবারি নিতে চায়?

- আমি নেব। আমি! -- অনেক সাহাবি আগ্রহ দেখালেন।

- এই তরবারি নিতে চাইলে তার হক আদায় করা চাই। কে আছে এই তরবারির হক আদায়ের ক্ষমতা রাখে? রাসূলুল্লাহ শর্ত যোগ করলেন।

-কী এই তরবারির হক? জানতে চাইলেন আবু দুজানা।

- এর হক হচ্ছে এটা দিয়ে শত্রুকে এমনভাবে আঘাত হানবে হবে যেন এটা বেঁকে যায়।

শক্ত ধাতব তরবারি বাঁকিয়ে ফেলা যেনতেন কাজ নয়! সবাই যেন কিছুটা চুপসে গেল, কিন্তু এগিয়ে এলেন আবু দুজানা, 'আমি এই তরবারির হক আদায় করবো, ইয়া রাসূলাল্লাহ। রাসূলুল্লাহও তরবারি আবু দুজানার হাতে তুলে দিলেন। আবু দুজানা তরবারি নিলেন, মাথায় বাঁধলেন একটি লাল পট্টি। আবু দুজানা যখনই যুদ্ধে যেতেন, মাথায় লাল পট্টি বেঁধে নিতেন, এটা ছিল তাঁর যুদ্ধের সাজ। এরপর শত্রুদলের সামনে দাপটের সাথে হেঁটে বেড়াতেন। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে যেন শক্তি ঝরে পড়তো।

তাঁর এই বিশেষ হাঁটার ধরন দেখে রাসূলুল্লাহ বলেছিলেন, 'এইভাবে দর্পভরে হাঁটা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না। তবে এই পরিস্থিতির কথা ভিন্ন।', অর্থাৎ যুদ্ধের সময় শত্রুদের সামনে এভাবে হাঁটলে আল্লাহ তা পছন্দ করেন। একজন মুসলিম কখনই দাম্ভিক হবে না, তার মাঝে নম্রতা আর বিনয় থাকবে। কিন্তু নম্রতা থাকা মানেই দুর্বলতা নয়। তাই শত্রুদের সামনে হাঁটাচলায় কোনো দুর্বলতা দেখানো যাবে না। রাসূলুল্লাহর হাঁটায় দৃঢ়তা ও শক্তির ছাপ প্রকাশ পেত। আলী ইবন আবি তালিবের ভাষায়, 'তিনি যখন হাঁটতেন, দেখে মনে হতো যেন পাহাড় বেয়ে নামছেন।'

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে আনসারদেরকে আবু সুফিয়ান বার্তা পাঠিয়ে জানান যে তারা যদি মুসলিমদেরকে ত্যাগ করে তাহলে তাদের কোনো ক্ষতি করা হবে না এবং শহর আক্রমণ করা হবে না। কিন্তু আনসাররা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

মদিনাত্যাগী আবু আমর মক্কার পক্ষে প্রথম আক্রমণ চালায়। মুসলিমদের তীরের বৃষ্টিতে আবু আমর ও তার লোকেরা পিছু হটে মক্কার সারির পেছনের দিকে সরে আসে। এরপর মক্কার পতাকাবাহক তালহা ইবনে আবি তালহা আল-'আবদারি এগিয়ে গিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান করেন। যুবাইর ইবনুল আওয়াম আহ্বান শুনে এগিয়ে যান এবং তালহাকে হত্যা করেন।তালহার ভাই উসমান ইবনে আবি তালহা এগিয়ে গিয়ে পড়ে যাওয়া পতাকা তোলেন। মুসলিমদের মধ্যে থেকে হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব এগিয়ে এসে তাকে হত্যা করেন। মক্কার পতাকা বহনের দায়িত্ব তাদের পরিবারের উপর ন্যস্ত ছিল। একারণে তালহার ভাই ও পুত্রসহ ছয়জন একের পর এগিয়ে আসে এবং সবাই নিহত হয়।

দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর দুই বাহিনীর মধ্যে মূল লড়াই শুরু হয়। যুদ্ধে আগত কুরাইশ নারীরা দফ বাজিয়ে সেনাদের উৎসাহ দিচ্ছিল। মুসলিমরা মক্কার সৈনিকদের সারি ভেঙে ফেলতে সক্ষম হওয়ায় মক্কার বাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়ে। খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মক্কার অশ্বারোহীরা তিনবার মুসলিম বাহিনীর বাম পার্শ্বে আক্রমণ চালাতে চেষ্টা করে কিন্তু জাবালে রুমাতের উপর মোতায়েন করা তীরন্দাজদের আক্রমণের কারণে তারা বেশি অগ্রসর হতে পারেনি।এর ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিমরা সুবিধাজনক অবস্থান লাভ করে এবং বিজয়ের নিকটে পৌছে যায়। এসময় মুসলিম তীরন্দাজদের একটি বড় অংশ নির্দেশ অমান্য করে পাহাড় থেকে নেমে আসে এবং মূল বাহিনীর সাথে যোগ দেয়। ফলে বাম পার্শ্বের প্রতিরক্ষা দুর্বল হয়ে পড়ে।

এই পরিস্থিতিতে খালিদের নেতৃত্বাধীন মক্কার অশ্বারোহীরা সুযোগ কাজে লাগায়। নির্দেশ মেনে অবস্থান ত্যাগ না করা অবশিষ্ট তীরন্দাজদের উপর তারা আক্রমণ চালালেও সংখ্যাস্বল্পতার কারণে খালিদের অশ্বারোহিদের প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে মক্কার বাহিনী মুসলিম বাহিনীর পার্শ্বভাগ ও পেছনের ভাগে আক্রমণ করতে সক্ষম হয়।

এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় অনেক মুসলিম মারা যায়। একটি ক্ষুদ্র অংশ দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং মদিনার দিকে অগ্রসর হয়।মক্কার বাহিনীর আক্রমণে রাসুলুল্লাহ ﷺ আহত হন এবং তার একটি দাঁত ভেঙে যায়। কিন্তু গুজব ছড়ায় যে তিনি নিহত হয়েছেন।

তীব্র সম্মুখযুদ্ধের পর অধিকাংশ মুসলিম উহুদ পর্বতের ঢালে জমায়েত হতে সক্ষম হয়। মুহাম্মাদ ﷺ ও পর্বতের উপরের দিকে আশ্রয় নেন। মক্কার সেনারা পর্বতের দিকে অগ্রসর হয় কিন্তু উমর ইবনুল খাত্তাব ও মুসলিমদের একটি দলের প্রতিরোধের কারণে বেশি এগোতে সক্ষম হয়নি। ফলে লড়াই থেমে যায়।

হিন্দ ও তার সঙ্গীরা এসময় মুসলিমদের লাশ টুকরো করে, লাশের কান, নাক কেটে পায়ের গয়নার মত পরিধান করে। যুদ্ধ চলাকালে হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইথিওপীয় দাস ওয়াহশি ইবনে হারব বর্শার আঘাতে নিহত হয়েছিলেন। হামজাকে হত্যা করতে পারলে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়া হবে এমন প্রতিশ্রুতি পাওয়ার কারণে ওয়াহশি হামজাকে হত্যা করেছিলেন। হিন্দ নিহত হামযাহ (রা)কলিজা বের করে চিবিয়েছিলেন।

মুসলিমরা পর্বতে আশ্রয় নেয়ার পর আবু সুফিয়ানের সাথে উমর (রা)কিছু উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। কথোপকথনের সময় আবু সুফিয়ান এই দিনকে বদরের প্রতিশোধ বলে উল্লেখ করেন। প্রতি উত্তরে উমর বলেন যে মুসলিমদের নিহতরা জান্নাতে এবং কাফির নিহতরা জাহান্নামে আছে। এরপর মক্কার বাহিনী মক্কাভিমুখী যাত্রা করে। মুসলিমরা নিহত সৈনিকদেরকে যুদ্ধের ময়দানে দাফন করে।

**□ কুরআনের চোখে উহুদের বিপর্যয়:**

“নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য থেকে যারা পিছু হটে গিয়েছিল সেইদিন, যেদিন দুদল মুখোমুখি হয়েছিল, শয়তানই তাদের কিছু কৃতকর্মের ফলে তাদেরকে পদস্খলিত করেছিল। আর অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, সহনশীল।" (সূরা আলে ইমরান: ১৫৫)

অর্থাৎ উহুদের দিনে মুসলিমদের পদস্খলনের কারণ হলো শয়তান। আল্লাহ উহুদের যুদ্ধের মাধ্যমে মুনাফিক্বদের চেহারাও প্রকাশ করে দিলেন।

"তিনি দুঃখের পরে তোমাদের উপর শান্তি অবতরণ করলেন, তা ছিল তন্দ্রা, যা তোমাদের একদলকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দেয়, আর আরেকদল নিজেরাই নিজেদের উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল। তারা তাদের জাহেলী যুগের ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে অন্যায় ধারণা করতে থাকে। (এক পর্যায়ে) তারা এও বলতে শুরু করে, এ কাজে কি আমাদের কোনো ভূমিকা আছে?

“(হে নবী, তাদের) বলুন, (এ ব্যাপারে আমারও কোনো ভূমিকা নেই) নিশ্চয়ই সব বিষয় আল্লাহর হাতে। তারা তাদের অন্তরে লুকিয়ে রাখে এমন বিষয় যা তোমার কাছে প্রকাশ করে না। তারা বলে, যদি (যুদ্ধের) এ কাজে আমাদের কোনো ভূমিকা থাকতো, তাহলে আমাদেরকে এখানে হত্যা করা হতো না।বলো, যদি তোমরা আজ ঘরের ভেতরও থাকতে, তবু নিহত হওয়া যাদের অবধারিত ছিল, তারা তাদের মরণের বিছানার দিকে বের হয়ে আসতো। আর এভাবেই মনের ভেতর লুকিয়ে থাকা বিষয়সমূহের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করেন এবং এ ঘটনার (মাঝ) দিয়ে তিনি তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরিশুদ্ধ করেন।তোমাদের মনের কথা সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ জ্ঞাত।”[সূরা আলে ইমরান:১৫৪]

মুনাফিকরা বলে, যুদ্ধ করে বিপদ আর মৃত্যু ডেকে আনার কী দরকার? আল্লাহ আযযা ওয়া জাল জবাব দিয়েছেন, মুসলিমদের মৃত্যুর কারণ জিহাদ নয়, তারা মারা গেছে কারণ তাদের মৃত্যুর সময় এসে উপস্থিত হয়েছে। যদি তারা জিহাদে না গিয়ে ঘরের মধ্যেও বসে থাকতো, তবুও যাদের মারা যাওয়ার, তারা মারা যেতোই। অর্থাৎ মুসলিমদের মৃত্যুর জন্য জিহাদকে দায়ী করা ভুল। মৃত্যুর বিষয়টি আল্লাহর হাতে, আল্লাহ তাআলা যখন যার মৃত্যু নির্ধারণ করে রেখেছেন, সে ঠিক তখনই মারা যাবে। হোক সে ঘরের বাইরে থাকুক বা ভেতরে, মৃত্যুর সময়ের কোনো নড়চড় নেই। উহুদের যুদ্ধ ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। এই যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা

মুসলিমদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছেন। মুসলিমদের মৃত্যুর কারণ হিসেবে উহুদের যুদ্ধকে দায়ী করা যাবে না।

"... পরে যখন তোমরা সাহস ও (মনোবল) হারিয়ে ফেললে এবং (আল্লাহর রাসূলের) নির্দেশ সম্পর্কে মতপার্থক্য করলে, এমনকি, আল্লাহর রাসূল যখন তোমাদেরকে সেই ভালোবাসার জিনিস (আসন্ন বিজয়) দেখিয়ে দিলেন, তারপরও তোমরা তাঁর কথা অমান্য করে (তাঁর দেখিয়ে দেওয়া স্থান ছেড়ে) চলে গেলে। তোমাদের মধ্যে কিছু লোক তখন দুনিয়াবি ফায়দা হাসিলে ব্যস্ত হয় পড়লো আর কেউ আখিরাতের কল্যাণ চাইতে থাকলো। আল্লাহ এর দ্বারা তোমাদের ঈমানের পরীক্ষা নিতে চাইলেন এবং তোমাদের অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন। আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ মু'মিনদের উপর অনুগ্রহশীল।" (সূরা আলে ইমরান: ১৫২)

হার-জিত, সুখ-দুঃখ, দুঃসময়-সুসময় সবকিছু দিয়েই আল্লাহ তাআলা মানুষকে পরীক্ষা করেন। বদরের যুদ্ধে তিনি জয় দিয়ে মুসলিমদের পরীক্ষা নিয়েছিলেন। উহুদের দিনে পরীক্ষা করেন পরাজয়ের মাধ্যমে। ইবন ইসহাক সেই দিনের বর্ণনায় বলেন, 'উহুদের দিন ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে কষ্ট ও পরীক্ষার একটি দিন। এই দিনে আল্লাহ তাআলা কিছু মুসলিমকে শহীদের মর্যাদা দান করেন। সেই দিন একটি পর্যায়ে শত্রুরা রাসূলুল্লাহর কাছাকাছি পৌঁছতেও সক্ষম হয়। তাদের ছুঁড়ে মারা পাথরের আঘাতে নবীজি মাটিতে পড়ে যান। তাঁর দাঁত ভেঙে যায়, মুখে সজোরে আঘাত লাগে, ঠোঁট কেটে যায়।'

### □ শহীদ ও কাফির হত্যা সংখ্যা:

অধিকাংশ বর্ণনাকারী একমত যে, মুসলিম শহীদদের সংখ্যা ছিল সত্তর জন, যাঁদের মধ্যে অধিক সংখ্যকই ছিলেন আনসার, অর্থাৎ তাঁদের পঁয়ষট্টি জন লোক শহীদ হয়েছিলেন, খাযরাজ গোত্রের একচল্লিশ জন এবং আউস গোত্রের চব্বিশ জন। একজন ইহুদী নিহত হয়েছিল এবং মুহাজির শহীদদের সংখ্যা ছিল মাত্র চারজন। এখন বাকী

থাকল কুরাইশদের নিহতদের সংখ্যা নিয়ে কথা। ইবনু ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ছিল বাইশ জন। কিন্তু আসহাবে মাগাযী এবং আহলুস সিয়ার এ যুদ্ধের যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এবং যাতে যুদ্ধের বিভিন্ন স্থানে নিহত মুশরিকদের যে আলোচনা এসেছে তাতে গভীরভাবে চিন্তা করে হিসাব করলে এ সংখ্যা বাইশ নয়, বরং সাঁইত্রিশ হয়। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

## □ ১৩.বনু নাযিরের যুদ্ধ:

কাব ইবন আশরাফের হত্যাকাণ্ড ছিল মদীনার ইহুদিদের জন্য একটা কঠিন সতর্কবার্তা। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না। ইহুদিরা সেদিন থেকেই তাদের অবস্থান নিয়ে বেশ ভীত ছিল। এছাড়া তাদের বন্ধুগোত্র বনু কায়নুকাকে মদীনা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উহুদে মুসলিমদের পরাজয়, আর তার কিছুদিন পরেই আর-রাযী এবং বি'র মাউনার হত্যাকাণ্ডে তারা কিছুটা আশার আলো দেখতে পায়। তারা মুসলিমদের মনে মনে চ্যালেঞ্জ করতে শুরু করে। যদিও সরাসরি তারা যুদ্ধের ঘোষণা দেয়নি। কিন্তু তাদের কাজ বলে দিচ্ছিল তারা মুসলিমদেরকে আর আগের মতো সমীহের চোখে দেখে না।

### □ সূত্রপাত

বি'র মাউনার হত্যাকাণ্ডে বেঁচে যাওয়া একমাত্র ব্যক্তি উমাইয়্যা আদ-দামরি বি'র মাউনা থেকে মদীনায় ফিরছিলেন। পথেই বনু আমর গোত্রের দুই লোকের সাথে দেখা। এই বনু আমর গোত্রই বি'র মাউনার হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল। ৭০ সাহাবিকে হারিয়ে উমাইয়্যা তখন শোকে কাতর। মনের মধ্যে ক্ষোভ দাউদাউ করে জ্বলছে। প্রতিশোধ নেওয়ায় সুযোগ এভাবে সামনে এসে পড়বে ভাবেননি। তিনি বনু আমরের লোক দুটোকে ঘুমন্ত অবস্থায় মেরে ফেললেন।

তার মনে হলো তিনি ঠিক কাজই করেছেন। কিন্তু এটা তার জানা ছিল না যে, এই দুই লোক বনু আমরের হলেও তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ পক্ষ থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। রাসূল এ ঘটনা শুনে বললেন, 'তুমি এমন দুই লোককে হত্যা করেছ যাদের জন্য আমাকে রক্তপণ পরিশোধ করতে হবে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কথার বরখেলাপ করতেন না। ওয়াদা করলে পূরণ করতেন। তিনি রক্তপণ দিলেন। এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান লক্ষণীয়, কোনো কাফিরকে হত্যার জন্য কোনো মুসলিমকে হত্যা করা হয় না। উমাইয়্যা এমন দুজন লোককে হত্যা করেন যাদের হত্যা করা ছিল বেআইনি। কিন্তু এর শাস্তিস্বরুপ তাকে হত্যা করা হয়নি, বরং রক্তপণ শোধ করতে হয়েছে।

রাসুলুল্লাহর ﷺ সাথে ইহুদিদের চুক্তির একটি ধারা অনুযায়ী, রক্তপণ পরিশোধের ব্যাপারে মুসলিম ও ইহুদিরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করার ব্যাপারে আইনগতভাবে বাধ্য ছিল। বনু আমরের এই দু'লোককে হত্যা করার পর তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ কয়েকজন সাহাবিকে নিয়ে ইহুদিদের বনু নাযির গোত্রের কাছে গেলেন।

## হত্যাচেষ্টা

ইহুদিরা রাসূলুল্লাহকে ﷺ অভ্যর্থনা জানালো, অভিনয় করলো রাসূলুল্লাহর ﷺ আগমনে তারা খুব খুশি। রাসুলুল্লাহ ﷺ একটি দেওয়ালের পাশে বসে বললেন, 'বনু আমরের দুই লোককে ভুলক্রমে হত্যা করা হয়েছে। তাদের রক্তপণ পরিশোধের ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য কামনা করছি।' তারা রাজি হবার ভান করলো। টাকা নিয়ে আসার কথা বলে ভেতরে গেল। ভেতরে গিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করলো কীভাবে রাসুলুল্লাহকে ﷺ মেরে ফেলা যায়। একজন বললো, 'এমন সুযোগ আর কক্ষণো পাবো না! উনি আজকে দেওয়ালের ঠিক পাশেই বসেছেন। ছাদে উঠে একটা পাথর ফেললেই খেল খতম! আহ! তারপর সারাজীবনের মুক্তি!'কুরআনে আল্লাহ এই ঘটনা উল্লেখ করেছেন,

"হে মু'মিনগণ, তোমরা স্মরণ করো তোমাদের উপর আল্লাহর সেই নিআমত, যখন একটি জনগোষ্ঠী তোমাদের ওপর হাত ওঠাতে উদ্যত হয়েছিল, তখন আল্লাহ তাদের

হাতকে তোমাদের থেকে নিবৃত্ত রাখলেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আল্লাহর উপরই মু'মিনরা যেন তাওয়াক্কুল করে।"(সূরা মায়িদা, ৫: ১১)

এর আগেও ইহুদিরা বিভিন্ন সময়ে মুসলিমদের সাথে শত্রুতা করে এসেছে। এর আগে তারা আহলুস-সুফফার এক মুসলিমকে হত্যা করতে চেয়েছিল। তাদের নেতা মুসা ইবন উকবাহ উহুদের যুদ্ধে কুরাইশদের গোপনে সাহায্য করেছিল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তারা মুসলিমদের বদর এবং উহুদে সাহায্য করেনি। উল্টো তাদের নেতা সালাম ইবন মিশকাম মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের পরিচালিত একটি সামরিক অভিযানে তাদের স্পর্শকাতর তথ্য দিয়ে সাহায্য করে এবং আবু সুফিয়ানকে আতিথেয়তা করে।

## □ ১৪.যাত আর-রিক্বার যুদ্ধ

উহুদে পরাজয়ের পর মদীনার ভেতরে ইহুদিরা এবং মদীনার বাইরে নজদের গোত্রগুলো বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। বনু নাযিরকে শায়েস্তা করার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। এরপর তিনি মনোযোগ দেন নজদের গোত্রগুলোর দিকে। আরবের শত্রুভাবাপন্ন গোত্রগুলোকে নিষ্ক্রিয় করাটা ছিল সময়ের দাবি। যাতুর রিকা অভিযান সে উদ্দেশ্যেই সংঘটিত হয়েছে। নজদের গোত্রগুলো এরই মাঝে মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও শত্রুতা করেছে। ৭০ জন সাহাবিকে হত্যা করেছিল নজদেরই একটি গোত্র। এর জবাবে আল্লাহর রাসূল ৪০০ সাহাবিকে সাথে নিয়ে অভিযানে বের হন, টার্গেট গাতফানের দুটো গোত্র: বনু মুহারিব এবং বনু সালাবা। এই অভিযানই ইতিহাসে যাতুর রিক্বা নামে পরিচিত। রিকা মানে কাপড়ের টুকরো। এই অভিযানকে কেন যাতুর রিক্বা বলা হয় সে জবাব দিয়েছেন অভিযানে অংশ নেওয়া এক যোদ্ধা আবু মূসা আল-আশআরি ।অভিযানের বর্ণনায় তিনি বলেন,

'আমরা আল্লাহর রাসূলের সাথে একটি অভিযানে বের হলাম। প্রতি ৬ জনের জন্য বরাদ্দ হলো একটি করে উট। পালা করে একজন উটের পিঠে চড়ছি, বাকিরা পায়ে

হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে পা গুলো শুকিয়ে যাচ্ছে, চামড়ায় ফোসকা পড়ে যাচ্ছে। আমার তো নখই খসে পড়ল। আর তাই আমরা আমাদের পায়ে কাপড়ের টুকরো বেঁধে নিলাম। এ জন্যই অভিযানের নাম হলো যাত আর-রিকা--কাপড়ের টুকরোর অভিযান।'

## ▢ সালাতুল খওফ:

এই যুদ্ধে কোনো মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো না। শত্রুরা মুসলিমদের হঠাৎ আক্রমণে ভয় পেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে আশেপাশের পাহাড়ে পালিয়ে গেল। তাদের নারী-শিশু আর গরুবাছুর পর্যন্ত রেখে গেল। কিন্তু তাদের ফিরে আসার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায়। তারা হয়তো কাছেই আছে, যেকোনো মুহূর্তে আক্রমণ করে বসতে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ নতুন এক পন্থায় জামাতের সালাত আদায় করলেন।

"এবং আপনি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবেন ও তাদের নিয়ে নামায পড়বেন, তখন একদল যেন আপনার সঙ্গে দাঁড়ায় আর তারা যেন সশস্ত্র থাকে; অতঃপর সিজদাহ করা হলে তারা যেন তোমাদের পেছনে অবস্থান করে, আর অপর এক দল যারা নামাযে শরীক হয়নি তারা তোমাদের সাথে যেন নামাযে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। অবিশ্বাসীরা কামনা করে যেন তোমরা অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও যাতে তারা তোমাদের উপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, কিন্তু তোমাদের কোনো দোষ নেই যদি বৃষ্টি-বাদলের জন্য তোমাদের কষ্ট হয় বা তোমাদের অসুখ হয় আর তোমরা অস্ত্র রেখে দাও, কিন্তু অবশ্যই হুঁশিয়ার থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (সূরা নিসা, ৪: ১০২)

এই সালাতের নিয়ম হলো, প্রথমে অর্ধেক সৈন্য ইমামের পেছনে সালাত আদায় করবে। আর বাকিরা পাহারা দেবে। প্রথম রাকাতের পর ইমাম দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে। থাকবে, প্রথম দল তখন নিজেরা দ্বিতীয় রাকাত পড়ে সালাত শেষ করবে। এরপর দ্বিতীয় দল এগিয়ে আসবে, ইমামের দ্বিতীয় রাকাতের সাথে নিজেরা প্রথম রাকাত

পড়বে। ইমাম বসা অবস্থায় তারা নিজেরা দ্বিতীয় রাকাত আদায় করে সালাত শেষ। করবে। এটা নিয়ে ভিন্ন মতও আছে। এই সালাতের নাম হলো সালাতুল খাওফ।

তবে এই আলোচনায় দেখার বিষয় হলো সালাতুল খাওফের ফিকহ নয়, বরং সালাতের গুরুত্ব। সালাতের গুরুত্ব এতটাই বেশি যে, শত্রুর সীমানায় জীবন-মরণ অবস্থাতেও সালাত আদায় করতে হবে। আল্লাহর রাস্তায় যারা যুদ্ধ করছেন, তাদের জন্যই যদি এই বিধান হয় তাহলে যারা নিরাপদে আছে তাদের জন্য কী করণীয় হতে পারে? তবুও কিছু মানুষ সালাতকে বুড়ো আঙুল দেখায়। ইসলামে প্রতিটি ইবাদাহর ক্ষেত্রেই শর্ত থাকে, যেমন, গরীবদের যাকাত আদায় করতে হয় না, হজ্জ পালন করতে হয় না, এখানে সম্পদ থাকা হলো শর্ত। অসুস্থ-দুর্বলদের সাওম পালন না করলেও চলে, এখানে স্বাস্থ্য হলো শর্ত। কিন্তু সালাতের ব্যাপারে কোনো শর্ত নেই, একজন মুসলিমকে সালাত আদায় করতেই হবে। যদি দাঁড়াতে না পারে তবে বসে, বসতে না পারলে শুয়ে মাথা নেড়ে। মাথা নাড়াতে না পারলে আঙুলের ইশারায়। আঙুল নাড়াতে অক্ষম হলে চোখের ইশারায় হলেও আদায় করতে হবে- সালাতের কোনো মাফ নেই। সাহাবিদের জিহাদী অভিযানগুলো আমাদেরকে সালাতের গুরুত্বও শিক্ষা দেয়।

## □ ১৫.বনু আল-মুস্তালিকের যুদ্ধ:

সমসাময়িক আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযান ছিল খুযাআ গোত্রের বিরুদ্ধে সংঘটিত বনু মুস্তালাকের যুদ্ধ। কুরাইশদের মিত্র এই গোত্রটির অবস্থান ছিল কৌশলগত বিবেচনায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মক্কার কুরাইশদের সাথে যদি বোঝাপড়া করতে হয়, তবে খুযাআ গোত্রের সাথে আগে বোঝাপড়া করে নিতে হবে। মদীনা আক্রমণের ব্যাপারে তাদের পরিকল্পনার নিশ্চিত খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ৭০০ মুজাহিদ নিয়ে তাদের অতর্কিতে আক্রমণ করে বসেন। যে জায়গাটিতে যুদ্ধ সংঘটিত হয় সেটার নাম আল- মুরাইসী।

মুসলিমদের অতর্কিত হামলায় প্রতিরোধ গড়ার কোনো সুযোগও তারা পায়নি। উপরন্তু তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়, স্ত্রী-সন্তানদের বন্দী করে দাস হিসেবে নিয়ে আসা হয়।।

সাধারণত, মুসলিমবাহিনী শত্রুদের উপর আক্রমণ করার আগে ইসলাম গ্রহণের জন্য তিনদিন সময় দিয়ে থাকে। তাদের বলা হয় মুসলিম হও, না হলে জিযিয়া দাও, আর এ দুটো প্রস্তাবের কোনোটাতেই রাজি না হলে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করো। ১০ কিন্তু বনু মুস্তালিককে এক মুহূর্তের জন্যও সময় দেওয়া হয়নি কারণ তাদের কাছে আগেই দাওয়াহ পৌঁছে গিয়েছিল। তারা আরবেই বসবাস করতো, ইসলাম সম্পর্কেও জানতো। জেনে শুনেই তারা কুরাইশদের পক্ষ নিয়েছিল। আবদুল্লাহ ইবন উমার বলেন, বনু মুস্তালিককে অসতর্ক অবস্থায় আক্রমণ করা হয়। তারা তখন পশুদের পানি খাওয়ানোতে ব্যস্ত ছিল।"

## ১৬.রাসূলুল্লাহ ﷺ সাথে জুয়াইরিয়্যাহর রাদিয়াল্লাহু আনহার বিয়ে:

জুয়াইরিয়্যাহ ছিলেন বনু মুস্তালিকের গোত্রনেতা আল হারিসের মেয়ে। তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ বিয়ে নিয়ে প্রবল ঈর্ষা আর দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন মা আইশা। মজার এই ঘটনাটি তাঁর মুখেই শোনা যাক,

'যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বনু মুস্তালিকের বন্দী নারী ও শিশুদের বণ্টন করে দিলেন, তখন জুয়াইরিয়্যাহ পড়লেন সাবিত ইবন কাইসের ভাগে। তিনি সাবিতের সাথে মাকাতুবা (দাসমুক্তির চুক্তি) করলেন। জুয়াইরিইয়্যাহ দেখতে ছিলেন খুবই মিষ্টি, আর অসম্ভব সুন্দরী।এতটাই সুন্দরী যে, যে-ই তাকে দেখবে, সে-ই তার প্রেমে পড়ে যাবে। তিনি রাসূলুল্লাহর কাছে এসে দাসমুক্তির অর্থ পরিশোধে সাহায্য চাইলেন। আল্লাহর কসম। আমি যখন তাকে আমার দরজায় দেখলাম, (প্রচণ্ড ঈর্ষার কারণে) তাকে আমার

একটুও ভালো লাগেনি।আমি জানতাম,যে রুপ আমি তার মধ্যে দেখছি,তা আল্লাহর রাসূলের চোখ এড়াবে না।

জুয়াইরিয়্যাহ আসলেন, সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আল-হারিসের মেয়ে জুয়াইরিয়্যাহ, আমার বাবা গোত্রের নেতা। আর এখন আমি হয়েছি সাবিতের দাসী। আমার কেমন লাগছে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আমি নিজেকে মুক্ত করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। আপনি আমাকে চুক্তির অর্থ পরিশোধে সাহায্য করুন। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন,

- আচ্ছা, তোমাকে যদি এর থেকেও ভালো কিছু দেওয়া হয়?

আমি তোমার মুক্তিপণ পরিশোধ করবো আর তোমাকে বিয়ে করে নেব।

- হে আল্লাহর রাসূল, আমি অবশ্যই তা কবুল করবো।

রাসূলুল্লাহ জুয়াইরিয়্যাহকে বিয়ে করে নিলেন। সবাই তখন বলতে লাগলো, আরে! এরা তো রাসূলুল্লাহর শ্বশুরবাড়ির লোকজন, এদেরকে আমরা কী করে দাস বানিয়ে রাখি! তাই তারা তাদের ভাগের সকল বন্দীকে মুক্ত করে দিল। জুয়াইরিয়্যাহর মতো আর কেউ নিজ গোত্রের জন্য এত বরকত বয়ে এনেছে বলে আমাদের জানা নেই। এই এক নারীর কারণে বনু মুস্তালিকের একশো পরিবার আজাদ হয়ে যায়।

এই ঘটনার পর বনু মুস্তালিক গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহর ব্যক্তিজীবনে নেওয়া একটি সিদ্ধান্তে পাল্টে যায় হাজারো মানুষের ভাগ্য।

## □ ১৭.ইফকের ঘটনা:

বনু মুস্তালিক্ব থেকে ফেরার পথে মা আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহু সাথে খুব দুঃখজনক একটি ঘটনা ঘটে।এটা ইফকের ঘটনা নামে পরিচিত।আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই এ ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছেন এভাবে।

'রাসুল ﷺ যখন সফরে বের হওয়ার ইচ্ছে করতেন, স্ত্রীদের মধ্যে লটারি করতেন। লটারিতে যার নাম আসত, তাকে সাথে নিয়ে সফরে বের হতেন। এ রকমই এক যুদ্ধের সফরের আগে তিনি লটারি করলেন। লটারির ফলাফল এল আমার পক্ষে। রাসুল ﷺ এর সাথে বের হলাম। সময়টা পর্দার বিধান নাজিল হওয়ার পরের। উটের হাওদায় চড়ে সফর করতাম আমি। প্রয়োজনে হাওদাসমেত আমাকে নামানো হতো। এভাবেই চলছিল আমাদের সফর। যুদ্ধ শেষ হলো। রাসুল ﷺ যুদ্ধ করে অবসর হলে ফেরার নির্দেশ দেওয়া হলো। মদিনার নিকটবর্তী এক জায়গায় সফর-বিরতি হলো। সফর-বিরতির ঘোষণা শুনে আমি সৈন্যদের থেকে আলাদা হয়ে প্রয়োজন সারতে গেলাম। প্রয়োজন সেরে এসে হাওদায় প্রবেশ করলাম। কিন্তু হঠাৎ করে বুকে হাত দিয়ে দেখি, ইয়ামানের জাফার থেকে আনা আমার হারটি ভেঙে হারিয়ে গেছে। উপায়ান্তর না দেখে আবার সে স্থানে গিয়ে হারটি কুড়িয়ে আনার জন্য গেলাম। কিন্তু হার খুঁজতে খুঁজতে দেরি হয়ে গেল।

এমন সময় রাসুল যাত্রার আদেশ দেন। সাহাবিগণ হাওদা উঠিয়ে নিলেন আমার উটে। তখনকার মেয়েরা হালকা-পাতলা হতো। কারণ, তাদের খাওয়া হতো কমই। তাই চারজনে মিলে হাওদা উঠানোর কারণে তাঁরা বুঝতে পারেননি যে, আমি ভেতরে আছি কি নেই। আমি তখন কম বয়সী এক তরুণী।

তারা উট হাঁকিয়ে সফর চালিয়ে গেলেন। এদিকে সৈন্যরা চলে যাওয়ার পর আমি হার খুঁজে পেয়ে বিরতির জায়গায় ফিরে এলাম। কিন্তু সেখানে কাউকে পেলাম না। আমি যেখানে অবস্থান করেছিলাম, সেখানে বসে থাকলাম। আমার মনে আশা জাগল, তারা যখন দেখবে আমি তাদের সাথে নেই, তারা ফিরে আসবে আমাকে খুঁজতে। আমি বসে রইলাম। চোখে ঘুম জড়িয়ে এল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

সফওয়ান বিন মুআত্তাল সুলামি সৈন্যদলের পেছনে পরিদর্শক হিসেবে ছিলেন। সকালবেলা তিনি আমার ঘুমানোর স্থানে এসে পৌঁছালেন। তিনি দেখলেন, একটি ঘুমন্ত মানুষের আকৃতি। তিনি আমার কাছে আসলেন। আমাকে দেখে চিনে ফেললেন তিনি। পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগে আমাকে দেখেছিলেন তিনি। আমাকে চিনতে পেরে

তিনি "ইন্নালিল্লাহ..." বলে উঠলেন। তার কণ্ঠস্বরে আমি জেগে উঠলাম। মুখের ওপর কাপড় টেনে দিলাম আমার জিলবাবের।

আল্লাহর কসম, তিনি আমার সাথে এক শব্দ কথাও বলেননি। "ইন্নালিল্লাহ" পড়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো শব্দ তার মুখ থেকে শুনিনি আমি। তিনি উট বসালেন। আমি উটে আরোহণ করলাম। এরপর বাহন নিয়ে তিনি সামনে চলতে লাগলেন। পরিশেষে আমরা সৈন্যদলের সাথে মিলিত হলাম জোহরের সময়। তারা তখন বিশ্রামে ছিল।

সে সময় আমার ব্যাপারটি নিয়ে যারা ধ্বংস হওয়ার তারা ধ্বংস হলো। আর এ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছিল আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল।

সফর শেষে আমরা মদিনায় পৌঁছালাম। মদিনায় এসেই এক মাসের মতো আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। মানুষ অপবাদ রটনাকারীদের কথা চর্চা করতে লাগল। কিন্তু তার কিছুই আমি জানতাম না। রাসুল আমাকে অসুস্থ অবস্থায় দেখতেন, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে তার যে স্নেহ পেতাম অসুস্থতার সময়, এ সময়ে সে স্নেহে কমতি হচ্ছিল। তিনি আমার কাছে আসতেন। সালাম দিতেন। এরপর জিজ্ঞেস করতেন, "কেমন আছ?" এতে আমি সন্দেহে পড়ি। কিন্তু মন্দ কিছু আঁচ করতে পারিনি।

কিছুটা সুস্থ হওয়ার পরের কথা। এক রাতে আমি ও উম্মে মিসতাহ বের হলাম প্রয়োজন সারতে। চাদরে পা জড়িয়ে হোঁচট খেল উম্মে মিসতাহ।বলে উঠল, "মিসতাহর জন্য দুর্ভোগ।" আমি তাকে বললাম, "তুমি বড় মাকে বলেছ। বদরে অংশ নেওয়া মহৎপ্রাণ এক ব্যক্তিকে তুমি গালি দিশে উম্মে মিসতাহ বলল, "সরল নারী, তুমি কি শুনোনি সে কী বলেছে?" আমি উম্মে মিনকী বলেছে?" এরপর উম্মে মিসতাহ অপবাদ রটনার সকল কথা আমাকে জানাল। ফলে আমার রোগের প্রকোপ আরও বেড়ে গেল। বাড়িতে ফিরে আসলাম আমি। রাসুল ﷺ আমার কাছে এসে সালাম দিলেন। বললেন, "কেমন আছ?" আমি বললাম, "আপনি কি আমাকে বাবা-মার কাছে যাওয়ার অনুমতি দেবেন?" আমি চাচ্ছিলাম মা-বাবার কাছ থেকে ব্যাপারটি নিশ্চিত করি। রাসুল ﷺ অনুমতি দিলেন।

বাবা-মার কাছে চলে গেলাম আমি। মাকে বললাম, "মা, মানুষ কী বলাবলি করছে?" মা বললেন, "মেয়ে আমার, বিষয়টা হালকাভাবে নাও। আল্লাহর শপথ, কোনো সুন্দরী মহিলা যদি এমন স্বামীর কাছে থাকে আর স্বামীও তাকে ভালোবাসে, সাথে যদি সে মহিলার কয়েক সতিন থাকে, তবে তারা সে মহিলাকে নিয়ে একটু-আধটু বলেই।" মায়ের কথা শুনে আমি বললাম, “সুবহানাল্লাহ, তাহলে মানুষ ঠিকই এসব রটিয়েছে?।" সে রাতে অনবরত কাঁদতে কাঁদতে কাটিয়ে দিলাম। একটুও ঘুমাইনি। কাঁদতে কাঁদতে রাত ভোর হলো।

ওহি আসতে দেরি হচ্ছে দেখে রাসুল আলি ও উসামাকে স্ত্রী পরিত্যাগের ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য ডাকলেন। উসামা বিন জাইদ রাসুল ﷺ এর স্ত্রীব নিষ্কলুষতা জানতেন, জানতেন স্ত্রীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা কেমন, এর ওপর ভিত্তি করে তিনি বললেন, "আল্লাহর রাসুল ﷺ, তিনি আপনার স্ত্রী। তাকে আমরা উত্তমই জানি।" অন্যদিকে আলি বললেন, "আল্লাহ আপনার পথ সংকীর্ণ করে দেননি। তিনি ব্যতীত অন্য অনেক নারীই আছেন। আপনি তার দাসী (বারিরা)-কে জিজ্ঞেস করুন। সে সত্যিটা বলতে পারবে।” এরপর রাসুল ﷺ বারিরাকে ডেকে পাঠালেন। তাকে বললেন, "বারিরা, আয়িশার মাঝে কৌতূহল-উদ্দীপক কিছু দেখেছ?" বারিরা বলল, "যে সত্তা আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ, তাঁর মাঝে কখনো আমি দোষের কিছু দেখিনি। তবে তিনি অল্পবয়সী এক কিশোরী। আটা খামির করতে গিয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন আর ওদিকে ঘরের বকরিটি এসে তা খেয়ে ফেলে।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ আমার সম্পর্কে জাইনাবের কাছে জানতে চাইতেন। তিনি বলতেন, "হে জাইনাব তুমি কী জানো? তুমি কী দেখছ?" জাইনাব বলত, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি আমার কান ও চোখে পর্যবেক্ষণ করে চলি। আল্লাহর কসম, আমি তার মাঝে কেবল কল্যাণই দেখেছি।" আয়িশা বলেন, "জাইনাব সর্বদা আমার সাথে প্রতিযোগিতায় লেগে থাকত। কিন্তু এ ব্যাপারটিতে এসে তার ধার্মিকতা-দ্বীনদারিতার কারণে নিজেকে সে রক্ষা করতে পেরেছে।

এরপর রাসুল ﷺ মিম্বারে দাঁড়ালেন। ইবনে উবাইয়ের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সাহাবিদের কাছে বললেন। তিনি বললেন, "মুসলিম জাতি, কে আমাকে সাহায্য করবে এমন এক লোকের বিরুদ্ধে, যে কষ্ট দিতে দিতে এবার আমার পরিবার নিয়েও আমাকে কষ্টে ফেলে দিয়েছে? আল্লাহর কসম, আমার স্ত্রীর মাঝে ভালো বৈ মন্দ কিছু পাইনি আমি। তারা এমন এক ব্যক্তিকে জড়িয়ে কথা রটিয়েছে, যাকে আমি উত্তম বলেই জানি। সে আমার সঙ্গ ব্যতীত আমার ঘরে আসেনি কখনো।"

আওস গোত্রের সাদ বিন মুআজ দাঁড়িয়ে বললেন, "আল্লাহর রাসুল ﷺ, আল্লাহর শপথ, আমি আপনাকে সাহায্য করব তার বিরুদ্ধে। যদি সে আওস গোত্রের কেউ হয়, তবে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেবো। আর যদি সে আমাদের ভাই খাজরাজ গোত্রের কেউ হয়, তবে আপনি যেভাবে আদেশ দেন, সেভাবেই আমরা পালন করব।""

[আয়িশা বলেন, "খাজরাজ গোত্রের নেতা সাদ বিন উবাদা তিনি সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তার গোত্রপ্রীতি তাকে মূর্খামিতে উদ্যত করেছে- তখন দাঁড়িয়ে গেলেন। সাদ বিন মুআজের উদ্দেশে বললেন, "আল্লাহর শপথ, তুমি মিথ্যে বলছ। তুমি তাকে হত্যা করবে না। তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না।" এবার সাদ বিন মুআজের চাচাতো ভাই উসাইদ বিন হুজাইর দাঁড়িয়ে সাদ বিন উবাদাকে বললেন, "আল্লাহর শপথ, তুমি মিথ্যা বলছ। আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তুমি একজন মুনাফিক, আরেকজন মুনাফিকের পক্ষে তর্ক করছ।"]

আওস ও খাজরাজ একে অপরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে উঠল। এমনকি তাদের ঝগড়া যুদ্ধের ইচ্ছে পর্যন্ত গড়াল। রাসুল তখনও মিম্বরের ওপর। তিনি নেমে এসে তাদের শান্ত করলেন। তারাও চুপ হয়ে গেলেন, রাসুল ﷺ ও আর কিছু বললেন না।

সেদিন কেঁদে কেঁদে পার করলাম আমি। আমার চোখের অশ্রু একটুর জন্যও থামেনি। একটুও ঘুমাইনি সেদিন। এরপর রাতটাও কেঁদে কেঁদে কাটালাম। একটু সময়ের জন্যও থামেনি আমার অশ্রু। স্বল্প মুহূর্তও ঘুমের পরশ পাইনি। আমার মা-বাবা মনে করলেন, কাঁদতে কাঁদতে বুঝি আমার কলিজা বিদীর্ণ হয়ে যায়। তারা দুজন আমার পাশেই

বসেছিলেন, আর আমি অনবরত কেঁদে যাচ্ছিলাম। এক সময় এক আনসার নারী প্রবেশের অনুমতি চাইলে অনুমতি দিলাম আমি। সেও আমার কাছে বসে কাঁদতে থাকল। আমরা তখন সে অবস্থায়, এমন সময়ে রাসুল আগমন করলেন। সালাম দিয়ে পাশে বসলেন। আমার ব্যাপারে কথা রটানোর পর থেকে তিনি আমার কাছে বসেননি। এ অবস্থায় এক মাস কাটালাম, কিন্তু তাঁর কাছে কোনো ওহি আসেনি আমার সম্পর্কে। রাসুল আমার পাশে বসে শাহাদাহ পড়ে বললেন, "আয়িশা, তোমার ব্যাপারে আমার কাছে এ এ সংবাদ এসেছে। যদি তুমি নিষ্পাপ হয়ে থাকো, তবে অবশ্যই আল্লাহ তা ঘোষণা করবেন অচিরেই। আর যদি তুমি কোনো পাপ করেই থাকো, তবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও, তাঁর কাছে তাওবা করো। কোনো বান্দা গুনাহ করে আল্লাহর কাছে তা স্বীকার করে তাওবা করলে তিনি তাওবা কবুল করেন।"

রাসুল ﷺ এর কথা শেষ হলো। আমার চোখ থেকে অশ্রুপ্রবাহ একেবারেই নাই হয়ে গেল। এক ফোঁটা পানিও অনুভব করলাম না চোখে। আমি বাবাকে বললাম, "আমার পক্ষ থেকে রাসুল-কে উত্তর দিয়ে দিন।" তিনি বললেন, "আল্লাহর শপথ, আমি বুঝে উঠতে পারছি না রাসুল কে কী উত্তর দেবো।" এরপর মাকে বললাম, "আমার পক্ষ থেকে রাসুল ﷺ কে উত্তর দিয়ে দিন।" তিনিও বললেন, "আল্লাহর শপথ, আমি বুঝে উঠতে পারছি না রাসুল ﷺ কে কী উত্তর দেবো।"

তখন আমি অল্প বয়স্কা এক তরুণী। কুরআনও খুব বেশি মুখস্থ হয়নি তখন। তবুও আমি বললাম, "আল্লাহর কসম, আমি জানি, আপনারা এ ব্যাপারে যা শোনার শুনেছেন। সেটাই আপনাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং তা-ই আপনারা বিশ্বাস করে ফেলেছেন। এখন যদি আমি নিজেকে পবিত্র বলি আর আল্লাহ জানেন আমি পবিত্র- তবে আপনাদের অন্তর তা মেনে নেবে না। কেননা, আপনারা অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়েছেন। আর যদি না- করা পাপটি আমি স্বীকার করে নিই আর আল্লাহ জানেন আমি পবিত্র- তবে আপনারা আমাকে মিথ্যের ব্যাপারটিতে বিশ্বাস করে নেবেন। এ জন্য আমার ও আপনাদের জন্য সে-ই উদাহরণই যুৎসই, যা ইউসুফ-এর পিতা ইউসুফ ৯-এর ভাইদের বলেছিলেন- فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتعال على ما تصفول "ধৈর্যধারণই উত্তম।

আর তোমরা যা বলছ, তার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করছি।এরপর আমি পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম।

আল্লাহর কসম, আমি তখনও জানতাম আমি নিষ্পাপ। আর আল্লাহ আমাকে নিষ্পাপ ঘোষণা করবেন। কিন্তু আমি ধারণা করতে পারিনি যে, আমার ব্যাপারে নাজিলকৃত ওহি কুরআনের পাঠ হিসেবে তিলাওয়াত করা হবে। আমার ব্যাপারে আমার ধারণা ছিল, আমি এতটা উপযুক্ত নই যে, আল্লাহ আমার সম্পর্কে কথা বলবেন এবং তা তিলাওয়াত করা হবে। বরং আমি আশা করছিলাম, রাসুল ﷺ আমার নিষ্কলুষতার বিষয়ে স্বপ্নে দেখবেন, আল্লাহ আমাকে নিষ্পাপ ঘোষণা করছেন।

আল্লাহর কসম, রাসুল ﷺ তাঁর বসা থেকে ওঠেননি। ঘরের কেউই বের হয়নি। তখনই সেখানে নবিজি ﷺ এর ওপর ওহি নাজিল হওয়া শুরু হলো। ওহির সময় তাঁর ওপর যে কঠিন অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন তা শুরু হলো। এমনকি সে শীতের দিনেও তিনি ধর ধর করে ঘেমে নেয়ে যেতেন তিনি।তাঁর শরীর থেকে মুক্তোর মতো ঘামের ফোঁটা ঝরত।

ওহি নাজিলের কষ্ট শেষ হয়ে গেলে দেখলাম, রাসুল ﷺ হাসছেন। তিনি প্রথম যে শব্দটি বলেছিলেন সেটি হচ্ছে, "সুসংবাদ নাও আয়িশা, আল্লাহ তাআলা তোমাকে নিষ্পাপ ঘোষণা করেছেন।" তখন আমার মা আমাকে বললেন, "যাও, উঠে রাসুল ﷺ এ-এর কাছে যাও। (তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করো।) আমি বললাম, "আল্লাহর শপথ, না, আমি উঠে তাঁর কাছে যাব না। আমি কেবল আল্লাহরই প্রশংসা করব। তিনিই আমাকে নিষ্পাপ ঘোষণা করলেন। আল্লাহ নাজিল করেছেন

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ غير لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ - لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بأنفسهمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ.

"যারা এ অপবাদ রটিয়েছে, তারা তোমাদেরই একটি দল; এটাকে তোমাদের জন্য ক্ষতিকর মনে কোরো না। বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে প্রতিফল যতটুকু পাপ সে করেছে। আর এ ব্যাপারে যে নেতৃত্ব দিয়েছে, তার জন্য আছে মহাশাস্তি।

তোমরা যখন এ কথা শুনলে, তখন ইমানদার নারী-পুরুষরা কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করোনি? কেন বলোনি যে, এটা তো নির্জলা অপবাদ?"... (সুরা আন-নূর, ২৪: ১১-২০)

সুরা নুরের দশ আয়াত। আল্লাহ তাআলা এ সকল আয়াত আমার নিষ্কলুষতা ঘোষণায় নাজিল করেছেন।

## ☐ ১৮.গাযওয়ায়ে আহযাব(খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ):

পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর কারণ হল, ইহুদীরা যখন দেখল যে, উহুদ যুদ্ধে মুশরিকরা জয়লাভ করেছে ও মুসলিমগণ পরাজিত হয়েছে এবং তারা শুনতে পেল যে, আগামী বছর আবু সুফিয়ান বদর প্রান্তরে মুসলিমদের সাথে পুনরায় যুদ্ধ করবে, তখন তাদের সাহস বেড়ে গেল। সুতরাং ইহুদী নেতারা মক্কার কুরাইশদের কাছে গমণ করল। তারা মক্কায় গিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুরাইশদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগল এবং রসূলুল্লাহ ﷺ এর বিরুদ্ধে তারা কুরাইশদেরকে সাহায্য করার পূর্ণ আশ্বাস প্রদান করল। ইহুদীদের আগ্রহ দেখে কুরাইশদের হিম্মত ও সাহস বেড়ে গেল। ইহুদীদের পরামর্শ মুতাবেক তারা রণ প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। এ লক্ষ্যে তারা গাতফান এবং অন্যান্য আরব গোত্রের নিকট গমণ করল। তারা তাদেরকে মুহাম্মাদ ﷺ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহবান জানাল। তারা সেই ডাকে সাড়া প্রদান করল।

অল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন আরব গোত্রের ১০ হাজার স্বশস্ত্র যোদ্ধা প্রস্তুত হয়ে গেল। এদের মধ্যে কিছু ইহুদীও ছিল। আবু সুফিয়ান সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করল। পূর্ণ প্রস্তুতি সহ তারা মদ্বীনার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ল।

সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সালমান ফারসীর পরামর্শে মদ্বীনার চার পার্শে খন্দক তথা পরীখা খননের পর তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে মদ্বীনার মূল শহরের বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। এ সময় ইহুদী গোত্রগুলোও চুক্তি ভঙ্গ করে কুরাইশদের সাথে মিলিত হল এবং মুনাফেকদের নিফাকীও প্রকাশিত হয়ে গেল। এতে মুসলিমদের উপর বিরাট নেতিবাচক প্রভাব পড়ল এবং অনেক লোকই ভীত হয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যেই কুরাইশ বাহিনী মদিনার নিকটবর্তী হয়ে গেল এবং চতুর্দিক থেকে মদিনা কে ঘেরাও করে ফেলল। পূর্ণ একমাস তারা কঠোরভাবে মহিনা অবরোধ করে রাখল। মুশরিক ও মুসলিম শিবিরের মাঝখানে খন্দক প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ানোর কারণে কোন প্রকার যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদের উপর বিরাট এক বাতাস প্রেরণ করলেন। প্রচন্ড বাতাসে তাদের তাবুগুলো উল্টে গেল। এতে করে তাদের অন্তরে ভয়-ভীতি প্রবেশ করল। তারা আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি নিয়ে ফেরত গেল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৈনিকদেরকে বিজয় দান করলেন এবং দুশমনদেরকে একাই পরাজিত করলেন।

মুশরিকরা চলে যাওয়ার পর রাসুলুল্লাহ ﷺ ও মদিনায় প্রবেশ করে যুদ্ধের হাতিয়ার খোলা শুরু করলেন। তখন জিবরাইল ফেরেশতা এসে বললেন- আপনারা অস্ত্র ছেড়ে দিচ্ছেন? অথচ আল্লাহর ফেরেশতাগণ এখনও যুদ্ধের পোশাক খুলেন নি। মোটকথা তিনি জানতে পারলেন যে, বনী কুরায়যার ইহুদীরা চুক্তি ভঙ্গ করেছে। তিনি সাথে সাথে ঘোষণা করে দিলেন যে, বনী কুরায়যার যমীনে পৌঁছার আগে কেউ যেন আসরের সলাত না পড়ে। এই ঘোষণা শুনে মুসলিমগণ দ্রুত বের হয়ে পড়লেন।রাসূলুল্লাহ ﷺ ও বের হয়ে পড়লেন। মুসলিম বাহিনী সেখানে পৌঁছার পর ইহুদীরা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হল। যার ভাগ্যে হত্যা নির্ধারিত

ছিল সে নিহত হল। বাকীরা অপমানিত হয়ে মুসলিমদের হাতে বন্ধী হল। খন্দক ও বনী কুরায়যার যুদ্ধে মুসলিমদের মোট দশজন লোক শহীদ হল।

## □ ১৯.খন্দকের যুদ্ধে অলৌকিক ঘটনা:

### ১) মু'জিযা-এক বকরিতে আটশো লোকের খাওয়া!

এই মজার ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন জাবির ইবন আবদুল্লাহ,

'তখন পরিখা খনন করা হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহকে ﷺ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তিনি ভীষণ ক্ষুধার্ত। আমি আমার স্ত্রীর কাছে গেলাম। জানতে চাইলাম, ঘরে কি কোনো খাবার আছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এত ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখে আর সহ্য হচ্ছে না! তোমার কাছে কোনো খাবার-টাবার কিছু আছে? সে বললো, খাবার বলতে আছে অল্প কিছু যব আর একটা বকরির বাচ্চা। আমি তখন বকরিটাকে জবাই করলাম। ওদিকে স্ত্রী যব পিষতে শুরু করে দিল। গোশত ডেকচিতে দিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে ফিরে এলাম। বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ,আমার বাড়িতে সামান্য কিছু খাবার আছে। আপনি দু-একজনকে সাথে নিয়ে চলে আসুন না! তিনি জানতে চাইলেন, কী পরিমাণ খাবার আছে? আমি বললাম কী কী আছে। শুনে তিনি বললেন, বাহ! বেশ ভালোই তো আছে!তোমার স্ত্রীকে গিয়ে বলো, আমি না আসা পর্যন্ত যেন সে চুলা থেকে গোশত না নামায়।'

এর পরের ঘটনাটার জন্য জাবির একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। জাবিরকে হতবাক করে দিয়ে নবীজি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'মুহাজির আর আনসাররা শোনো সবাই। জাবির আজ তোমাদের জন্য খাবার তৈরি করেছে। সবাই চলো। জাবির পড়লেন মহাচিন্তায়, যাকে বলে অতল সমুদ্রে। এত অল্প খাবার দিয়ে এতজনের আপ্যায়ন করবেন কীভাবে। বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে বললেন,

আল্লাহর রাসূল ﷺ তো মুহাজির, আনসার আর তাদের সব সঙ্গীসাথীকে নিয়ে চলে। এসেছেন।

আল্লাহর রাসূল ﷺ কি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন খাবারের পরিমাণ কেমন? - হ্যাঁ জানতে চেয়েছিলেন। তুমি আমাকে যা বলেছো আমি ঠিক তা-ই তাঁকে বলেছি।

- আচ্ছা, তাহলে চিন্তার কিছুই নেই। নিশ্চয়ই তিনি আমাদের থেকে ভালো জানেন।

জাবিরের স্ত্রী পরম নির্ভরতার সাথে জবাব দিলেন। তার মধ্যে কোনো উদ্বেগের ছাপ দেখা গেল না!

সাহাবিরা আসা শুরু করলেন। সবাই ক্ষুধায় অস্থির। রাসূলুল্লাহ ﷺ সবাইকে ধীরস্থির হতে বললেন। সাহাবিরা দশ জনের দলে ভাগ ভাগ হয়ে আসতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ রুটি টুকরো করে এর উপর গোশত দিয়ে সাহাবিদের মাঝে বিতরণ করে দিলেন, তাঁরা খেয়ে গেলেন। এরপর আসলো আরেকটি দল। এভাবে প্রায় আটশো থেকে এক হাজার লোক তৃপ্তি সহকারে খেলেন। যখন সবার খাওয়া শেষ, তখনও গোশতের ডেকচিটা গোশতে পরিপূর্ণ। আর রুটিও তৈরি হচ্ছে সমান তালে। সবার খাওয়া শেষে আল্লাহর রাসূল জাবিরের স্ত্রীকে বললেন তিনি যেন নিজে খেয়ে নেন আর প্রতিবেশীদের মাঝে বাকি খাবারগুলো ভাগাভাগি করে দেন।' আল্লাহর রাসূলের ﷺ মু'জিযায় এক বকরি আর সামান্য যব দিয়েই আটশ'রও বেশি লোক সেদিন তৃপ্তি করে খেলো।

## ▢ ২০.বনু কুরাইযাহর যুদ্ধ:

খন্দকের যুদ্ধ শেষ। ক্লান্তিকর অনেকগুলো দিন পার করে আল্লাহর রাসূল ঘরে ফিরে এসেছেন। অস্ত্রশস্ত্র রেখে বের হলেন গোসল করতে। যুহরের ওয়াক্ত চলছে। এমন সময় ধূলি-ধূসরিত বেশে তড়িঘড়ি করে জিবরীল হাজির হলেন। বললেন, - ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি অস্ত্র নামিয়ে রেখেছেন! কিন্তু আমরা ফেরেশতারা এখনো অস্ত্র নামাইনি। আপনি এখনই ওদের ধাওয়া করুন।

- কোন দিকে?

- এই দিকে, জিবরীল বনু কুরায়যার দিকে ইঙ্গিত করলেন।

খন্দকের রেশ তখনও কাটেনি। এরই মধ্যে বনু কুরায়যাকে শায়েস্তা করার নির্দেশ চলে এল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়তে আদেশ করলেন। বলে দিলেন তারা যেন বনু কুরাইযার এলাকায় পৌঁছে তবেই আসরের সালাত আদায় করে। মদীনায় ইবন উম্ম মাকতুমকে অস্থায়ী প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করা হলো। সাহাবিরা যখন বনু কুরায়যার এলাকায় পৌঁছলেন তখন আসরের ওয়াক্ত শেষ, তবে একদল আগেই পথিমধ্যে আসর পড়ে নিয়েছিলেন। সবার আগে পৌঁছলেন আলী। দেখতে পেলেন বনু কুরায়যা একেবারে বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ করছে। গালিগালাজ করা হচ্ছে রাসূলুল্লাহকে ﷺ।

## অবরোধের সিদ্ধান্ত

রাসুলুল্লাহ ﷺ বনু কুরায়যাকে অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

"কিতাবিদের মধ্যে যারা (এ যুদ্ধে) তাদেরকে সাহায্য করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ হতে অবতরণ করতে বাধ্য করলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন, এখন তোমরা তাদের কাউকে করেছো হত্যা এবং কাউকে করেছো বন্দী। এবং তোমাদেরকে অধিকারী করলেন তাদের ভূমি, ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পদের এবং এমন ভূমি যা তোমরা এখনও পদানত করোনি। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩: ২৬- ২৭)

প্রায় পঁচিশ দিন অবরোধ করে রাখা হলো। বনু কুরায়যা বুঝতে পারছিল সময় শেষ হয়ে আসছে। নেতা কা'ব ইবন আসাদ একদিন সবাইকে ডাক দিয়ে বললো,

তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছো পরিস্থিতি খুব কঠিন। আমি তোমাদের তিনটি প্রস্তাব দিচ্ছি, তোমাদের যেটা ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারো। প্রথম প্রস্তাব, আমরা মুহাম্মাদের আনুগত্য করবো এবং তাঁকে সত্য বলে মেনে নেব। আল্লাহর কসম, তোমরা ভালো করেই জানো মুহাম্মাদ একজন নবী। তাওরাতে তোমরা যে নবীর বর্ণনা পেয়েছ, ইনিই

সেই লোক। যদি তোমরা তাঁর উপর ঈমান আনো, তাহলে বেঁচে যাবে। সেই সাথে তোমাদের জান-মাল-স্ত্রী-পুত্র সবকিছুই রক্ষা পাবে।

উত্তর এল,

- না, আমরা কখনোই তাওরাতের বিধান ত্যাগ করবো না। তাওরাত বাদ দিয়ে অন্য কোনো বিধান আমরা মানবো না।

কা'ব বললো,

- ঠিক আছে, তাহলে আমার দ্বিতীয় প্রস্তাবটা দিই আমরা আমাদের সন্তান ও নারীদের হত্যা করবো এবং তারপর খোলা তরবারি নিয়ে মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বো। তাহলে আমাদের আর কোনো পিছুটান থাকবে না। এরপর ততক্ষণ লড়াই করবো যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের আর তাদের মাঝে একটা ফয়সালা করে দেন। যদি হেরে যাই, তো এমনভাবে মরবো যখন আমাদের কোনো বংশধর বেঁচে নেই। কাজেই আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করারও কিছু থাকবে না। আর যদি জিতে যাই, তাহলে নারী আর শিশুর অভাব আমাদের কখনোই হবে না।

উত্তর এল,

- এই অসহায় নারী-শিশুদের শুধু শুধু মেরে ফেলবো? এদের যদি মেরেই ফেলি তাহলে আমাদের বেঁচে থেকে লাভটা কী?

কা'ব তখন শেষ প্রস্তাবটি দিল।

ঠিক আছে, তোমরা যদি এটাও মানতে না চাও তাহলে অন্য একটা প্রস্তাব দিতে পারি। আজকে শনিবারের রাত, আমরা যে শনিবারে যুদ্ধ করি না তারা নিশ্চয়ই এটা জানে। এটা ভেবে হয়তো মুহাম্মাদ আর তার সঙ্গীরা কিছুটা অপ্রস্তুত অবস্থায় থাকবে। এই সুযোগে আসো তাদের উপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে শেষ করে দিই।

উত্তর এল, - আরে! তুমি কি পবিত্র শনিবারের পবিত্রতা নষ্ট করে দিতে চাও? তুমি কি জানো না এই শনিবারের অমর্যাদা করে আমাদের পূর্বপুরুষদের কী ভীষণ শাস্তি হয়েছিল?

বনু কুরায়যার কাপুরষতা আর সিদ্ধান্তহীনতা দেখে কা'ব ভীষণ বিরক্ত হলো। বললো,

- ধুর! তোমাদের মধ্যে একটা বাপের ব্যাটা নেই, যে মায়ের পেট থেকে বেরোনোর পর একটা রাত কোনো বিষয়ে মনস্থির করে ঘুমাতে গেছে।

এই অল্প কদিনের মধ্যেই বনু কুরায়যা একেবারে ভেঙে পড়ে। লড়াই করার মানসিক শক্তিটুকু পর্যন্ত আর তাদের কারো মাঝে নেই। ভয়, সিদ্ধান্তহীনতা তাদের পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছে। যত সাহস আর আস্ফালন, সব তলানিতে গিয়ে ঠেকল। আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কিছুই তারা ভাবতে পারছিল না। তারা আবু লুবাবার কাছে পরামর্শ চাইলো। আবু লুবাবা জাহিলিয়াতের যুগে তাদের বন্ধু ছিলেন। তাকে দেখে নারী ও শিশুরা কান্নায় ভেঙে পড়ল। তাদের অবস্থা দেখে আবু লুবাবার মন একটু যেন দুর্বল হয়ে যায়। তারা আবু লুবাবাকে জিজ্ঞেস করে, 'যদি আমরা আত্মসমর্পণ করি, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ কী হবে-- কোনো ধারণা করতে পারেন?' আবু লুবাবা হাত দিয়ে গলার দিকে ইঙ্গিত দেখালেন। বোঝালেন, যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তাহলে মৃত্যুই হবে পরিণতি।

কিন্তু বনু কুরায়যার অবস্থা ততদিনে এতটাই শোচনীয় যে আত্মসমর্পণের সম্ভাব্য পরিণতির কথা জেনেও তারা অগত্যা সেই পথই ধরে। আসলে খন্দকের যুদ্ধে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করার পর তারা আর প্রতিরোধ গড়ার কথা ভাবতে পারছিল না।

বনু কুরায়যা আত্মসমর্পণের পথই বেছে নেয়। তাদের একটাই শর্ত, সাদ ইবন মুআয যেন তাদের বিচারক হয়। সাদ আওস গোত্রের লোক। আওস গোত্রের সাথে বনু কুরায়যার মিত্রতা ছিল। তাদের আশা ছিল সাদ ইবন মুআয নিশ্চয়ই তাদের প্রতি কঠোর হবেন না!

## □ ২১.হুদাইবিয়ার সন্ধি:

**রাসূলুল্লাহর ﷺ স্বপ্ন:**

"আমি কা'বাকে করেছি মানুষের জন্য মাসাবাহ..." (সূরা বাক্বারাহ, ২: ১২৫)

কা'বার একটা অদ্ভুত সম্মোহনী শক্তি আছে। যে কা'বাকে একবার দেখে, সে বার বার সেখানে ফিরে যেতে চায়। তীব্র একটা টান তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, বাইতুল্লাহ হলো মাসাবাহ। মাসাবাহ মানে সম্মিলনস্থল। কোনো বাচ্চা উট যখন খেলতে যায়, সে একটু পর পর তার মাকে দেখার জন্য ফিরে আসে। এই ঘটনাকেই বলে মাসাবাহ। কা'বাঘর ঠিক তেমনই মানুষের জন্য মাসাবাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইবরাহীমের দুআর কারণে মানুষের অন্তরে কা'বার প্রতি একটা তীব্র ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। যে এই ঘরে যাবে সে এর প্রেমে আটকে যাবে।

প্রায় ছয় বছর কা'বা থেকে দূরে থেকে রাসূলুল্লাহর ﷺ মনে কা'বার কাছে যওয়ার তীব্র বাসনা জেগে উঠলো। তিনি স্বপ্নে দেখলেন তিনি আর সাহাবিরা একসাথে কা'বার চতুর্দিকে তাওয়াফ করছেন। তাওয়াফ শেষে কেউ কেউ মাথা মুণ্ডন করেছেন, আবার কেউ কেউ চুল ছেঁটে ছোট করেছেন। স্বপ্ন দেখার পর রাসূল মুসলিমদের তাঁর সাথে উমরা করার আহবান জানালেন। মক্কায় যাওয়ার জন্যে, আল্লাহর ঘরকে এক নজর দেখার জন্যে সাহাবিরাও উতলা হয়ে উঠলেন।

**মুসলিমগণের (মক্কা) গমনের ঘোষণা:**

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সঙ্গে মক্কা গমনের জন্য মদীনা এবং পার্শ্ববর্তী জনবহুল বিভিন্ন অঞ্চলে ঘোষণা দিলেন। কিন্তু অধিকাংশ আরবীগণ যাত্রা শুরু করার ব্যাপারে কিছুটা বিলম্ব করে ফেললেন। এদিকে রাসূলে কারীম ﷺ স্বীয় পোশাক পরিচ্ছদ পরিস্কার করে নিলেন। অতঃপর মদীনায় ইবনু উম্ম মাকতুম কিংব নুমাইলাহ লাইসীকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করলেন এবং কাসওয়া নামক নিজ উটের উপর আরোহণ করে ৬ষ্ঠ হিজরীর ১লা যুল ক্বা'দাহ মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তার সঙ্গে ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামাহ সঙ্গ নিলেন চৌদ্দশত (মতান্তরে পনের শত) সাহাবী। সফররত

অবস্থায় অস্ত্র গ্রহণের নিয়মে কোষাবদ্ধ তলোয়ার ছাড়া পৃথক কোন খোলা অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নেননি।

**মক্কা অভিমুখে মুসলিমগণের অগ্রযাত্রা:**

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহবীগণ মক্কা অভিমুখে ছিলেন অগ্রসরমান।যখন তারা যুল হুলায়ফায় গিয়ে পৌঁছলেন তখন কুরবানীর পশুকে হার পরিয়ে দিলেন।' উটের পিঠের উঁচু জায়গা কেটে চিহ্নিত করলেন এবং 'উমরাহর জন্য ইহ্রাম বাঁধলেন। এর প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল,লোকজনেরা যেন নিশ্চিন্ত থাকে যে যুদ্ধ করবেন না। কুরাইশদের খবরাখবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে খুযা'আহ সম্প্রদায়ের এক গোয়েন্দাকে প্রেরণ করা হল অগ্রভাগে। রাসূলুল্লাহ ﷺ দলবলসহ 'উসফান'নামক স্থানে যখন পৌঁছলেন তখন এ গোয়েন্দা ফিরে এসে তাঁকে অবহিত করলেন যে, মুসলিমগণের সঙ্গে মুখোমুখী যুদ্ধ করার জন্য কা'ব বিন লুওয়াই সাহায্যকারী আহাবীশ (মিত্র) গোত্রকে সংঘবদ্ধ করছে এবং আরও সৈন্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে। সে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করার এবং আল্লাহর ঘর থেকে আপনাকে বিরত রাখার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে।

## দুই পক্ষের মধ্যে দূত প্রেরণ

### মুসলিমদের প্রথম দূত: খাররাশ ইবন উমাইয়্যাহ

একটা চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছিল দুই শিবিরেই। রাসূল কুরাইশদের কাছে বার্তা পৌঁছাতে চাইলেন যে, তারা যুদ্ধ করতে আসেননি, এসেছেন আল্লাহর ঘর ভাওয়াফ করতে। এই কাজের জন্যে পাঠানো হলো খাররাশ ইবন উমাইয়্যাহকে। খাতাশ মক্কায় গেলেন। কিন্তু খাররাশের সাথে মক্কাবাসীর ব্যবহার ছিল অতান্ত রূঢ়। তারা তার উটকে হত্যা করে এবং তাকেও মেরে আধমরা করে ফেলে।

একজন দূতের সাথে এরকম হীন আচরণই বলে দেয় মক্কাবাসীরা তখন চূড়ান্তভাবে দিগভ্রান্ত এবং হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে ছিল। তাদের ছিল প্রচণ্ড অহংকার কিন্তু এখন

তারা অপমানিত। তাদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান ধীরে ধীরে খর্ব হচ্ছিল। তারা বিষয়টা মানতে পারছিল না বিধায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো আচরণ করতে থাকে।

**মুসলিমদের দ্বিতীয় দূত: উসমান ইবন আফফান**

রাসূল। আরেকজনকে দূত হিসেবে পাঠাতে চাইলেন, উমারকে ডাক দিলেন। উমার বললেন,

ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ, মক্কায় আমার পরিবারের এমন কেউ নেই যে আমাকে নিরাপত্তা দেবে। আর আমি কুরাইশদের কী পরিমাণ ঘৃণা করি সেটাও তাদের ভালোই জানা আছে। তারপরও আপনি যদি যেতে বলেন, আমি যাবো।'

রাসূল ﷺ কিছু বললেন না। উমার তখন আরেকটি নাম প্রস্তাব করলেন-- উসমান। কারণ উসমানের গোত্র তখনো মক্কায় ছিল।

উসমান ছিলেন বনু উমাইয়্যা গোত্রের। উমাইয়্যা গোত্র কুরাইশদের অন্যতম প্রধান শাখা বনু আবদে মানাফের অন্তর্ভুক্ত। মক্কা শহরের নেতৃত্ব ছিল দুই গোত্রের হাতে। বনু মাখযুম আর বনু আবদে মানাফ। বনু মাখযুমের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিল আবু জাহল, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সে নেতৃত্ব দিয়ে গেছে। এই গোত্রে আরও ছিল ওয়ালিদ ইবন মুগিরা এবং তার ছেলে খালিদ ইবন ওয়ালিদ। অন্যদিকে বনু আবদে মানাফের প্রধান দুই শাখা গোত্র হচ্ছে বনু হাশিম আর বনু উমাইয়্যা। এই শাখা গোত্র দুটির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। রাসূল ছিলেন বনু হাশিমের আর উসমান ছিলেন বনু উমাইয়্যার। বনু উমাইয়্যার শীর্ষনেতা ছিল আবু সুফিয়ান। রাসূল। যখন উসমানকে কুরাইশদের কাছে পাঠালেন, সাথে সাথেই তিনি বনু উমাইয়্যার দ্বিতীয় শীর্ষ নেতার কাছে থেকে সুরক্ষার আশ্বাস লাভ করলেন। এই ব্যক্তিটি হলেন উসমানের চাচাতো ভাই আব্বান ইবন সায়িদ ইবন আল আস। তিনি উসমানকে নিজের উটের পিঠে করে কুরাইশদের সামনে নিয়ে গিয়ে ঘোষণা দিলেন যে, এই লোকটিকে আমি আমার তরফ থেকে নিরাপত্তা দান করলাম।

## কুরাইশদের পক্ষ থেকে প্রেরিত বুদাইল ইবন ওয়ারকা

কুরাইশরাও দূত পাঠাতে লাগলো। প্রথমে তারা পাঠালো বুদাইল ইবন ওয়ারকাকে। সে ছিল বনু খুযাআ গোত্রের। সে সাথে করে নিজ গোত্রের আরও কিছু লোক নিয়ে এসেছিল। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, খুযাআ গোত্র হচ্ছে রাসূল ﷺ এবং মুসলিমদের প্রতি বিশ্বস্ত। এমন বর্ণনা আছে যে, খুযাআ গোত্র মক্কার যাবতীয় তথ্য নবীজিকে ﷺ পাচার করতো।

নবীজির ﷺ যুদ্ধ জয়ের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল ছিল বিভিন্ন গোত্রের সাথে তাঁর সম্পর্ক। কুরাইশরা তার শত্রু হলেও বনু খুযাআর সাথে তার সুসম্পর্ককে তিনি নিজের কাজে লাগিয়েছেন। যাই হোক, বুদাইল রাসূলুল্লাহকে বললো, 'কুরাইশরা এমন উট নিয়ে এসেছে যে দুধ দেয়।' অর্থাৎ, কুরাইশরা দীর্ঘদিন অবস্থানের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে। পরিস্থিতি যদি থাকার দাবি করে, তাহলে তারা সেটাই করবে।তারা যুদ্ধের জন্যে তৈরি। রাসূলুল্লাহ তখন তাকে বুঝিয়ে বললেন যুদ্ধ করার তার উদ্দেশ্য নয়,বায়তুল্লাহর যিয়ারত করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। বুদাইল রাসূলুল্লাহর এই বার্তা নিয়ে মক্কায় ফিরে এলেন। কিন্তু কুরাইশরা তাকে পাত্তাই দিল না, তারা তাকে উপেক্ষা করলো। তার বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনলো, তার সাথে খারাপ ব্যবহার করলো। সে তাদের বললো, 'কুরাইশরা, তোমরা মুহাম্মাদের সাথে বাড়াবাড়ি করছো। যুদ্ধ করার অভিপ্রায় নিয়ে তিনি আসেননি, তিনি বায়তুল্লাহ যিয়ারত করতে এসেছেন। বলা বাহুল্য, এসব কথা কুরাইশদের মোটেও পছন্দ হলো না।

## মিখরাজ ইবন হাফস

বুদাইলের পর কুরাইশরা পাঠালো মিখরাজ ইবন হাফসকে। তাকে দেখামাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে উঠলেন, 'সে হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক!' মিখরাজের স্বভাব সম্পর্কে তিনি আগে থেকেই জানতেন। দেখা গেল মিখরাজ কুরাইশদের চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের একটি দল নিয়ে মুসলিমদের তাঁবুর চারপাশে ঘুরঘুর করছে। তার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের মধ্যে কাউকে একা পেলে তাকে বন্দী করে কুরাইশদের হাতে তুলে দেওয়া। কিন্তু ঘটনা

ঘটলো উল্টো, মিখরাজের পুরো বাহিনীই মুসলিমদের হাতে ধরা পড়ল। শুধুমাত্র সে কোনোমতে পালিয়ে বাঁচল। রাসূলুল্লাহ ﷺ চাচ্ছিলেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে তাই তিনি বন্দীদের বিনা শর্তে মুক্তি দিয়ে দিলেন।

## ▢ বাইয়াতুর রিদওয়ান:

এই ঘটনার সময় উসমান ছিলেন মক্কায়। হঠাৎ গুজব উঠলো, উসমানকে হত্যা করা হয়েছে। এই কথা শুনামাত্র রাসূলুল্লাহ বনু নাজ্জারের তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রত্যেক গোত্রের লোকেরা আলাদা আলাদা তাঁবুতে অবস্থান করছিল। উম্মে আম্মারা নামের বনু নাজ্জারের এক মহিলা রাসূলুল্লাহকে ﷺ দেখতে পেলেন। তিনি বলেন, 'আমি নবীজিকে ﷺ আমাদের তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। আমি ভাবলাম রাসূলুল্লাহর ﷺ বুঝি কিছুর দরকার হয়েছে।' রাসূল ﷺ এসে বসলেন এবং বললেন, 'আল্লাহ আমাকে তোমাদের কাছ থেকে বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) নেওয়ার আদেশ দিয়েছেন।' এরপর সাহাবিরা একে একে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে বাইয়াত করলেন।

কীসের ওপর এই বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ নেওয়া হয়েছিল সেটা নিয়ে একাধিক বর্ণনা আছে। একটি বর্ণনায় আছে এই বাইয়াত হচ্ছে মৃত্যুর বাইয়াত। অন্য বর্ণনায় আছে এই বাইয়াত হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন না করার বাইয়াত। তৃতীয় বর্ণনা বলছে এই বাইয়াত ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ অন্তরে যা আছে তার প্রতি বাইয়াত। এই বর্ণনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয়, সাহাবিরা জানতেন না নবীজি ﷺ কী চান। কিন্তু তারা সেই না-জানা জিনিসের উপরই বাইয়াত দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে এই বাইয়াতের অর্থ দাঁড়ায়- আমরা এই শপথ করছি যে আল্লাহর রাসূল আমাদের যা করতে বলবেন আমরা তা-ই করবো। এই বাইয়াতকে বলা হয় বাইয়াতুর রিদওয়ান। রিদওয়ান মানে সন্তুষ্টি। এই বাইয়াতের পর আল্লাহ মুসলিমদের উপর তাঁর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন।

এই বাইয়াত নেওয়া হয়েছিল বনু নাজ্জারের তাঁবুর সামনে। বনু নাজ্জার ছিল আল খাযরাজের অন্তর্ভুক্ত। সম্পর্কের দিক থেকে রাসূলুল্লাহর ﷺ মায়ের দিকের আত্মীয়। তারা ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ খুব কাছের। বলা যেতে পারে রাসূলুল্লাহর ﷺ ব্যক্তিগত সৈন্যবাহিনীর মতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় হিজরত করার সময় প্রথমে মদীনার উপকণ্ঠে কুবায় যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে তিনি ছিলেন বনু আমর ইবন আউফ গোত্রের সাথে। মদীনায় প্রবেশ করার পর তিনি থেকেছেন বনু নাজ্জারদের বাড়িতে। বনু নাজ্জারের লোকেরা রাসূলুল্লাহকে ﷺ ঘিরে রেখেছিল। তার সুরক্ষার জন্যে তারা সেদিন তলোয়ার নিয়ে রাসূলুল্লাহর চারিদিকে দাঁড়িয়ে ছিল। তাই বাইয়াতে রিদওয়ান নেয়ার জন্যেও তিনি বনু নাজ্জারের তাঁবুর সামনেই গিয়েছিলেন। উম্মে আম্মারার বর্ণনায়,

'আমার স্বামীর বাইয়াত দেওয়ার সময় হাতে তলোয়ার ধরা ছিল, কারণ এটি হচ্ছে মৃত্যুর বাইয়াত। এই দৃশ্য দেখে আমি আমার কোমরবন্ধনীর সাথে একটি ছুরি বেঁধে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলাম। তখন যদি আমার সামনে কোনো লোক যুদ্ধ করতে আসতো তাহলে আমি তার শরীরে ছুরি ঢুকিয়ে দিতাম, ছুরির বাট দিয়ে তাকে আঘাত করতাম।'

রাসূলুল্লাহর ﷺ মহিলা সাহাবিরাও এমনই সাহসিকতার অধিকারী ছিলেন। তিনি যুদ্ধের জন্যে, রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে এক মুহূর্তের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। যে কাজটি করতে আজকের অনেক পুরুষও আমতা আমতা করবে।

সর্বপ্রথম বাইয়াত দেন আবু সিনান আবদুল্লাহ ইবন ওয়াহাব আল-আসদী। সালামাহ ইবন আল-আকওয়া থেকে আল্লাহর রাসূল তিনবার বাইয়াত নেন। শুরুতে, মাঝে এবং শেষে। সেদিন বাইয়াত নেন সব মিলিয়ে চৌদ্দশো সাহাবি।

বাইয়াতে রিদওয়ান প্রসঙ্গে শিয়াদের একটি দাবি নিয়ে কিছু কথা না বললেই নয়। শিয়ারা উসমানকে পছন্দ করে না। উসমানের মর্যাদাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে তাই তারা বলে, উসমান বদর যুদ্ধে অংশ নেননি, উসমান বাইয়াতে রিদওয়ানের সময়ও ছিলেন

না ইত্যাদি। বদরের যুদ্ধে উসমানের অংশ না নেওয়ার আগেই বলা হয়েছে, সে মুহূর্তে উসমানের স্ত্রী, রাসূলুল্লাহর ﷺ কন্যা মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। স্বয়ং আল্লাহর রাসূলই তাকে যুদ্ধে অংশ নিতে বারণ করেন এবং স্ত্রীর পাশে থাকার নির্দেশ দেন। আর উসমানের বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ না নেয়ার কারণ কী? এই প্রশ্ন একমাত্র বোকারাই করতে পারে। কারণ বাইয়াতে রিদওয়ানের পুরো ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুই হচ্ছেন উসমান। তাঁর মৃত্যুর গুজব শুনেই মুসলিমদের থেকে বাইয়াত নেওয়া হয়েছিল। আর সত্যি বলতে, তিনি বাইয়াহ দিয়েছিলেন। রাসূল ﷺ নিজের এক হাত অন্য হাতের উপর রেখে বলেছিলেন, 'এইটা হচ্ছে উসমানের বাইয়াত।' উসমান নিজের হাতে বাইয়াত দেননি কিন্তু স্বয়ং রাসূলুল্লাহর ﷺ হাত তার প্রতিনিধিত্ব করেছে।

### □ সন্ধির শর্তাবলি:

সন্ধির শর্তগুলো মৌখিকভাবে ঠিকঠাক হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ আলীকে ডাকলেন শর্তগুলো লেখার জন্য। তাকে বললেন, 'লেখো, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম....

বাগড়া বাঁধালেন সুহাইল। তিনি বলে বসলেন, 'আর-রাহমান? আর-রাহমানকে তো আমরা চিনি না। আপনি লিখতে বলুন, বি-ইসমিকা আল্লাহুম্যা (অর্থাৎ, আপনার নামে হে আল্লাহ)

সাহাবিরা প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, বি-ইসমিকা আল্লাহুম্মা- এটাই লেখো।'

সাহাবিরা চুপ হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আলীকে বললেন, 'এরপর লেখো, নিম্নোক্ত বক্তব্যের উপরে আল্লাহর রাসূল চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন...'

আবারও আপত্তি জানালেন সুহাইল। বললেন, 'আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলে জানতাম, তাহলে তো আপনার সাথে যুদ্ধ না করে আপনার অনুসরণ করতাম। আপনি মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ লিখতে বলুন।'

সুহাইলের এই কথা সাহাবিদের মোটেও পছন্দ হলো না। কিন্তু এবারও তাদের থামিয়ে দিয়ে রাসূলুল্লাহ আলীকে বললেন, 'মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ লিখে দাও আর রাসূলুল্লাহ শব্দটা মুছে দাও।' আলী ইতস্তত করছিলেন, রাসূলুল্লাহ বললেন, 'লেখাটা কোথায় আমাকে বলো,' তিনি নিজ হাতে সেটা মুছে দিলেন। এরপর সন্ধির শর্তগুলো লেখা হলো।

**সন্ধির মূল ধারাগুলো নিম্নরূপ।**

- উভয় পক্ষ দশ বছরের শান্তি-চুক্তিতে আবদ্ধ থাকবে। এই দশ বছরের মধ্যে কেউ কাউকে আক্রমণ করবে না। শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকবে।

- যদি কুরাইশদের কেউ তার গোত্রপ্রধানের অনুমতি ব্যতিরেকে মুহাম্মাদের ﷺ দলে যোগ দেয়, তাহলে তাকে কুরাইশদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে।

- যদি মুহাম্মাদের ﷺ দলের কেউ কুরাইশদের সাথে যোগ দেয়, তাহলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না।

- উভয় পক্ষই পরস্পরের প্রতি ভালো নিয়ত রাখবে।

- কোনো প্রকার চুরি বা বিশ্বাসঘাতকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

- যার ইচ্ছা সে মুহাম্মাদের ﷺ সাথে জোট বাঁধতে পারবে আর যার ইচ্ছা সে কুরাইশের সাথে জোট বাঁধতে পারবে।

মুহাম্মাদ ﷺ এবং সাহাবিরা এই বছর মক্কায় প্রবেশ না করেই ঘরে ফিরে যাবে। পরবর্তী বছরে কুরাইশরা মক্কা খালি করে চলে যাবে, যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবিরা মক্কায় প্রবেশ করতে পারেন এবং তারা তিন দিন অবস্থান করতে পারবেন। এই সময়টায় ততটুকু অস্ত্রশস্ত্র রাখা সংগত হবে, যতটুকু অস্ত্রশস্ত্র সাধারণত একজন মুসাফির তার সাথে রাখে, এর বেশি নয়।

## □ হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকে শিক্ষা:

১) হুদাইবিয়া ছিল ইসলামের বিজয়:

এ বিষয়ে আয়াত নাযিল হবার পর রাসূলুল্লাহ উমারকে ডেকে পাঠালেন। উমার ভয়ে অস্থির হয়ে গেলেন,ভাবলেন নিশ্চয়ই তাকে তিরস্কার করে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ উমারকে বললেন,

- আমি এমন কিছু আয়াত পেয়েছি যেগুলো এই দুনিয়ার সবকিছু থেকেও উত্তম।

-এখানে কি মুক্তির কথা বলা হচ্ছে?

- সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, এখানে মুক্তির কথাই বলছে!

বিজয় বা মুক্তি বলতে কুরআনে 'ফাতহ' এবং 'নাসর' দুটো শব্দ এসেছে। ফাতহ শব্দের অর্থ খোলা। বদ্ধ কিছু খোলা বোঝাতে এই শব্দ ব্যবহার করা হতো। আর কোনো একটি যুদ্ধে জয়ের কথা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে নাসর শব্দটি। যেমন, বদরের বিজয়ের কথা বোঝাতে নাসর কথাটি আসে। ফাতহ শব্দটি ব্যবহার করা হয় না, কেননা বদর একটা ময়দান মাত্র, একে মুক্ত করার কিছু নেই। অন্যদিকে মক্কা হলো একটি ভূমি, তাই বলা হয় ফাতহে মক্কা।

হুদাইবিয়ার সন্ধিকে বলা হয়েছে ফাতহ, কারণ এই চুক্তির মাধ্যমেই মক্কা বিজয়ের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। নবীজি ﷺ সেবার চৌদ্দশো সাহাবি নিয়ে মক্কায় এসেছিলেন। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর লোকেরা খোলামেলাভাবে আল্লাহ ও ইসলাম সম্পর্কে জানার সুযোগ পায়। আরবের মুসলিমরা প্রথমবারের মতো স্বাধীনভাবে লোকেদের সাথে কথা বলার অবকাশ পেল আর লোকেরাও নির্ভয়ে ইসলামের কথা শোনার সুযোগ পেয়ে ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠলো। কুরাইশদের চাপের কারণে এতদিন মুসলিম হবার পথে মানুষের মনে ভয় বা বাধা কাজ করতো। এই চুক্তির মাত্র দু'বছর পর যখন মুসলিমরা মক্কা বিজয় করে, তখন মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা কয়েক গুণ বেড়ে হয় দশ হাজার। অথচ এর আগের বিশ বছরে এত মুসলিমের কথা কল্পনাও করা যায়নি- নিঃসন্দেহে এটা ছিল সুলহুল হুদাইবিয়ার (হুদাইবিয়ার সন্ধি) একটা বড় অর্জন।

## ২) কুরাইশদের নিষ্ক্রিয়করণ:

ইসলামের উত্থানে কুরাইশরা ছিল সবচাইতে বড় হুমকি। মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হবার মাধ্যমে তারা দশ বছরের জন্য নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। আরব জয়ের পথে কোনো বাধা আর অবশিষ্ট থাকলো না। এই চুক্তি করতে কুরাইশরা যতই হামবড়া ভাব দেখাক না কেন, এই চুক্তির মাধ্যমে তারা কার্যত মুসলিমদের রাজনৈতিক অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। যদিও কাফিরদের কাছে মুসলিমরা স্বীকৃতি খোঁজে না। কিন্তু এটা দেখিয়ে দেয় যে, মক্কা থেকে প্রায় বিতাড়িত হাতে গোনা কয়েকজন মুসলিম মদীনায় আশ্রয় নিয়ে যে ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে, তা কয়েক বছরের মধ্যে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয় যে, একে স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া কাফির শক্তির আর কোনো পথ থাকে না।

এই স্বীকৃতি ছিল সমীহের স্বীকৃতি, দয়া-দাক্ষিণ্যের স্বীকৃতি নয়। আল্লাহর রাসূল কাফিরদের কাছে স্বীকৃতির জন্য ধর্ণা দেননি, তিনি তাদের কাছে স্বীকৃতির জন্য আবদারও করেননি। বরং তিনি তরবারি ব্যবহার করেছেন আর তারা নিজেদের তাগিদেই স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে। তিনি এমন একটা অবস্থায় চুক্তি করেছিলেন যখন তিনি ছিলেন শক্তিশালী। ছয় বছর ধরে জিহাদ করে তখন তিনি কুরাইশদের যথেষ্ট কোণঠাসা করে রেখেছেন। কুরাইশরা তাদের নিজেদের লাঞ্ছনা ঠেকাতে চুক্তি করে স্বীকৃতি দিয়েছে। আজকের বিশ্বে ঠিক উল্টোটা ঘটছে। কাফিরদের আদর্শ, মূল্যবোধ এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে নিয়ে মুসলিমরা তাদের খুশি করতে চাইছে এবং স্বীকৃতির আশা করছে। এটা 'স্বীকৃতি' নয়, বরং এটা হলো লাঞ্ছনা ও অবমাননা।

## □ ২২.আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসূলের চিঠি:

দ্বীন ইসলাম কেবল আরবদের জন্য আসেনি, বরং ইসলাম এসেছে একটি বৈশ্বিক মিশন নিয়ে। আর ইসলামের এই মিশন বলবৎ থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। পৃথিবীর

প্রতিটি জাতির কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়া এবং পৃথিবীর সর্বত্র আল্লাহর আইনকে সর্বোচ্চ আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হলো এই মিশনের উদ্দেশ্য।

সে উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসূল ﷺ তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক শক্তিগুলোর উদ্দেশ্যে কিছু চিঠি পাঠান। চিঠির ভাষাই বলে দেয় এই চিঠিগুলো পাঠানোর মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল ইসলামকে আরবের বাইরে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ইঙ্গিত করছিলেন। এই শাসকদের কেউ রাসূলুল্লাহর আহবান গ্রহণ করে মুসলিম হয়েছে,কেউ সমীহ দেখিয়েছে, কেউ পাত্তাই দেয়নি। তাদের প্রতিক্রিয়া দেখে আল্লাহর রাসূল তাদের সাথে পরবর্তী বোঝাপড়ার রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মপন্থা নির্ধারণ করেন।

**□ চিঠিগুলোর তাৎপর্য-**

১) আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইসলামী শক্তির উত্থান:

তৎকালীন পরাশক্তিগুলোর উদ্দেশ্যে রাসুলুল্লাহর পাঠানো চিঠিগুলোর মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়। এই চিঠিগুলোর কাজ ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের উপস্থিতি এবং সম্প্রসারণশীল নীতির ব্যাপারে সবাইকে জানান দেওয়া। চিঠিগুলো ছিল সংক্ষিপ্ত কিন্তু গাম্ভীর্যপূর্ণ। তিনি সবাইকে আভাস দিচ্ছিলেন নতুন এই রাষ্ট্রকে সমীহ করেই চলতে হবে,একে হালকাভাবে নেওয়া চলবে না। তৎকালীন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এটি ছিল একটি অভূতপূর্ব বিষয়। সে সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো হয় পারস্য নয়তো রোমানদের অধীনস্থ ছিল। বর্তমান সময়ের সাথে এই অবস্থার কিছুটা মিল পাওয়া যায়, গত একশো বছরের উপরে যেমন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বিভক্ত এবং আন্তর্জাতিক পরাশক্তি যেমন আমেরিকা, রাশিয়া বা ব্রিটেনের মুখাপেক্ষী হয়ে আছে।

রাসূলুল্লাহর ﷺ চিঠিগুলো ছিল সেই সময়ের পরাশক্তিগুলোর প্রতি চ্যালেঞ্জ। তাদেরকে ইসলামের কর্তৃত্ব মেনে নেওয়ার আহবান করা এবং এই আহবানে সাড়া না দেওয়ার পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করা। বেশিরভাগ রাষ্ট্রীয় শক্তি এই আহবানে সাড়া দেয়নি,যে কারণে পরবর্তীতে সাহাবিরা সেই সাম্রাজ্য এবং দেশগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা

করেছেন। পারস্যের প্রতিক্রিয়া ছিল সবচাইতে রূঢ়, তাদের পতনও হয়েছে সবচাইতে দ্রুত। নতুন কিসরা মাত্র ছয় মাসের জন্য সিংহাসনে বসার সুযোগ পায়। এর পর আভ্যন্তরীণ কোন্দলে পারস্যের রাজনৈতিক কাঠামো একেবারেই নড়বড়ে হয়ে পড়ে। পরবর্তী মাত্র চার বছরে দশবার ক্ষমতার রদবদল হয়। শেষ পর্যন্ত ৬৩৭ সালে মুসলিমদের হাতে পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। আল্লাহর রাসূলের দুআ কবুল হয়। পারস্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

অন্যদিকে রোমান সম্রাট হিরাকল সম্মান দেখিয়েছিল আর তার সাম্রাজ্য টিকেছিল প্রায় আটশো বছর।১৪৫৩ সালে সুলতান মুহাম্মাদ ফাতহের হাতে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। বাহরাইন,মিশর,ইয়েমেন,শাম,ইরাকসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় আবু বকর এবং উমারের খিলাফতকালেই। রোমান এবং পারস্য দুই পরাশক্তির পতন ঘটে,উত্থান হয় নতুন এক পরাশক্তি ইসলামের। ইসলাম পরবর্তী প্রায় তেরোশো বছর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নেতৃত্বের আসনে আসীন ছিল।

২) কাফির নেতৃবৃন্দের প্রতি মনোভাব:

রোমান সম্রাটকে লেখা চিঠিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে রাজা বা নেতা হিসেবে সম্বোধন করেননি। এর ব্যাখ্যায় ইবন হাজার আসকালানি বলেছেন, ইসলাম কোনো কাফিরের কর্তৃত্ব বা রাজত্বকে স্বীকৃতি বা বৈধতা দেয় না। তবে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য তাকে পুরোপুরি অসম্মানও করা হয়নি। বলা হয়েছে আযীম আর- রুম বা রোমের মহান ব্যক্তি। চিঠিতে বলা হয়েছে শান্তি বর্ষিত হোক যারা সত্য পথের অনুসারী। হিরাকল বা অন্য কোনো সম্রাটকেই আল্লাহর রাসূল ﷺ সরাসরি সালাম দেননি। বলেছেন, 'সালাম তাদের জন্য যারা সত্য পথের অনুসরণ করে।'

বর্তমানকালে আমরা একটি ভিন্ন চিত্র দেখতে পাই। যেসব কাফির রাষ্ট্রের নেতা সরাসরি ইসলামের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, লক্ষ লক্ষ মুসলিমদের হত্যা এবং মুসলিমদেশের দুর্দশার জন্য দায়ী -- তেমন নেতাকেও মুসলিমরা সম্মান জানাচ্ছে, অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে। নিঃসন্দেহে এটা পরাজিত এবং দুর্বল মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। এটা রাসূলুল্লাহর শিক্ষা

নয়, এটা সাহাবিদের পথও নয়। এটা হলো লাঞ্ছনা এবং অবমাননার পথ। তারা শত্রুদের সাথে মাথা উঁচু রেখে কথা বলেছেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ তার চিঠিতে, লেখায়, কথায় শিষ্টাচার অবলম্বন করেছেন কিন্তু 'রাজনৈতিক শিষ্টাচারের' নামে কাফিরদের অপ্রয়োজনীয় সম্মান দেখাননি।

## □ ২৩.খাইবারের যুদ্ধ:

**প্রেক্ষাপট**

খাইবারের ইহুদিরা মাক্কী যুগে কিংবা মদীনার প্রাথমিক যুগে মুসলিমদের সাথে শত্রুতা করেনি। কিন্তু বনু নাযিরের নেতাদেরকে আশ্রয় দেওয়ার পর থেকে মুসলিমদের প্রতি তাদের মনোভাব বদলে যেতে থাকে। বনু কায়নুকা, বনু নাযির এবং বনু কুরায়যা- এই তিনটি গোত্রকেই পর্যায়ক্রমে মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হয়। বনু নাযিরকে বের করে দেওয়া হলে তারা আশ্রয় নিয়েছিল খাইবারে। আর এরপর থেকেই খাইবারের ইহুদিরা মুসলিমদের সাথে বিদ্বেষ দেখাতে শুরু করলো। কেননা বনু নাযিরের বিভিন্ন নেতা যেমন সালাম ইবন আবি আল-হুকাইক,কিনানাহ ইবন আবি আল-হুকাইক,হুয়াই ইবন আখতাব প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ খাইবারের রাজনীতিতে প্রভাবশালী ব্যক্তিতে পরিণত হয়। তারাই খাইবারের ইহুদিদেরকে আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতে উসকে দেয়। খন্দকের যুদ্ধে কুরাইশ এবং গাতফানকে এক করে সম্মিলিত সামরিক জোট গঠন করে এবং গাতফানকে বিপুল অর্থ দেওয়ার আশ্বাস দেয়।এভাবেই নিরপেক্ষ খাইবার হঠাৎ করেই মুসলিমদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হুদাইবিয়ার সন্ধির পরের সময়টা ছিল তাদেরকে আক্রমণ করার সবচাইতে উপযুক্ত সময়।কেননা ততদিনে হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে কুরাইশদের দশ বছরের জন্য নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই খাইবার আক্রমণ করা হলে কুরাইশদের থেকে প্রতিরোধের কোনো সম্ভাবনা নেই।

## অভিযানের সূচনা

খাইবারের যুদ্ধ সংঘটিত হয় হিজরী সপ্তম বর্ষে। হুদাইবিয়ার চুক্তি সম্পাদন করে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের বিশ দিনের মাথায় আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবিদের নিয়ে খাইবার অভিমুখে অভিযান শুরু করেন। গোটা আরব উপদ্বীপে ইহুদিদের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল খাইবারে। মুসলিমরা জানতেন খাইবারে তাদের বিজয় হবেই। কারণ কয়েকদিন আগেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে খাইবারে বিজয়ের ওয়াদা করেছেন।

"...তাদেরকে পুরস্কৃত করলেন আসন্ন বিজয় দিয়ে। এবং বিপুল পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা লাভ করবে..." (সূরা ফাতহ, ৪৮: ১৮-১৯)

**□ ইসলামী সৈন্যের সংখ্যা:**

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খায়বার অভিযানের কথা ঘোষণা করলেন তখন যে এই অভিযানে শুধু সে সকল ব্যক্তি অংশগ্রহণ করতে পারবেন যারা প্রকৃত জিহাদের জন্য আগ্রহী।এ ঘোষণার ফলে তার সঙ্গে শুধু সে সকল লোক ই যাওয়ার জন্য যোগ্য বিবেচিত হতে পারেন যারা হুদাইবিয়ার বৃক্ষে নিচে বাইয়াতের রিযওয়ানে শরীফ হয়েছিলেন।তারা সংখ্যায় ছিল মাত্র ১৪ শত জন।এ সময় আবু হুরায়রা(রা) ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় আগমন করেছিলেন।

□ খায়বার অঞ্চলে ইসলামী সৈন্যদল:

যে প্রভাতে খায়বার যুদ্ধ আরম্ভ হয় মুসলিম সৈন্যদল তার পূর্ব রাত্রি খায়বারের সন্নিকটে অতিবাহিত করে কিন্তু ইহুদীগণ এ ব্যাপারে কোন খবর পায় নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিয়ম ছিল, কোন সম্প্রদায়ের উপর। আক্রমণ পরিচালনা করতে চাইলে সেখানে গিয়ে রাত্রি যাপন করতেন এবং সকাল না হওয়া পর্যন্ত আতফল পরিচালনা করতেন না। এ প্রেক্ষিতে রাত যখন শেষ হওয়ার উপক্রম হল তখন অন্ধকার থাকা অবস্থায় তিনি ফজরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর ঘোড়সওয়ার মুসলিম সৈন্যগণ খায়বার

অভিমুখে অগ্রসর হলেন। এদিকে খায়বারবাসীগণ তাদের প্রাত্যহিক কাজের ন্যায় আজও চাষাবাদের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। অন্যান্য সরঞ্জামাদি নিয়ে মাঠের দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু অগ্রসরমান মুসলিম সৈন্যদের হঠাৎ দেখতে পেয়ে তার শহরের দিকে দৌড় দিয়ে যেতে যেতে চিৎকার করে বলতে থাকল যে, 'আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ সৈন্য সহকারে এসে গেছেন।রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দৃশ্য দেখে বললেন,

اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرَ، اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرَ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذِرِينَ)

'আল্লাহ আকবর, খায়বার ধ্বংস হল, আল্লাহ আকবর খায়বার ধ্বংস হল। যখন কোন সম্প্রদায়ের ময়দান অবতরণ করি যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয় তাদের সকাল মন্দ হয়ে যায়।

## □ খায়বারের দুর্গসমূহ:

খায়বারের জনবসতি দুটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। একটি অঞ্চলে নিম্নলিখিত পাঁচটি দূর্গ ছিল, ১. নায়িম দূর্গ, ২. সা'ব বিন মু'আয দূর্গ, ৩. যুবাইরের কেল্লা দূর্গ, ৪. উবাই দূর্গ, ৫. নিযার দূর্গ। এসবের প্রথম তিনটি দূর্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে নাত্বাত বলা হত। অবশিষ্ট দু'টি দূর্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল শাকু নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

খায়বারের জনবসতির দ্বিতীয় অঞ্চলকে কাতিবাহ বলা হত। এর মধ্যে মাত্র তিনটি দূর্গ ছিল, ১. কামূস দূর্গ, (এটা বনু নাযীর গোত্রের আবুল হুক্কাইক্বের দূর্গ ছিল)। ২. ওয়াতীহ্ দূর্গ, ৩. সুলালিম দূর্গ।

উপরি উল্লেখিত ৮টি দূর্গ ছাড়াও খায়বারের ছোট বড় আরও কিছু সংখ্যক দূর্গ এবং ঘাঁটি ছিল। কিন্তু শক্তি সামর্থ্য ও নিরাপত্তার ব্যাপারে এ সকল দূর্গ পূর্বোক্তগুলোর সমপর্যারের ছিল না। তুলনামূলকভাবে এ দূর্গগুলো

ক্ষুদ্রাকারের ছিল।

## ▢ মুখোমুখি মুসলিম এবং খাইবারের ইহুদিরা-

খাইবার ছিল এক বিশাল এলাকা জুড়ে অনেকগুলো দুর্গের সমাহার। এই দুর্গগুলো খাইবারের বিভিন্ন স্থানে, পাহাড় পর্বতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এ কারণে খাইবার যুদ্ধ ইহুদিদের সাথে আগের সব যুদ্ধগুলোর তুলনায় বেশ জটিল ছিল। অবস্থানগত দিক থেকেও খাইবার ছিল সুরক্ষিত একটি এলাকা। রাসূলুল্লাহ এক এক করে সবগুলো দুর্গ জয় করার জন্য অগ্রসর হলেন। শুরু হলো নাঈম দুর্গ দিয়ে।

যুদ্ধ শুরু হলো। ইহুদিদের এক সাহসী যোদ্ধা বেরিয়ে এল, তার নাম মারহাব। সে দ্বন্দ্বযুদ্ধের ডাক দিল। মুসলিমদের মধ্য থেকে এগিয়ে গেলেন আমীর ইবন আল-আকওয়া, যার কথা একটু আগেই এসেছে। তিনি খাইবারের যাত্রাপথে নাশীদ গেয়ে সবাইকে চাঙ্গা করে রেখেছিলেন। দিয়ে আঘাত করতে চাই কেরে কার করতে চায়ে সবাইকে পর্যায়ে মারহাব তলোয়ার দিআোত্মীয়। আকহাকে চাইলে সেই তলোয়ার চাইলেন। ডালে আটকে যায়। সেই সুযোগে আমীর মারহারের উরুতে আঘাত করে আমীরের ডাকেরে দিতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর তলোয়ার ছোট হবার কারণে আধার ডাকে পেয়ে গুলোয়ার ধাক্কা খেয়ে তার নিজের হাঁটিতে বজাজোম।এই আঘাত থেকে শুরু করক্তেক্ষরণ আর সেই রক্তক্ষরণ থেকে মৃত্যু। এভাবেই আমীর শহীদ হয়ে গেলেন, হয় বাইক রাসুলের ﷺ দুআ কবুল হলো। এরপর আমীরের জায়গায় আসলেন আলী। এসেই মারহাবকে হত্যা করলেন। অবশ্য অন্য বর্ণনামতে মারহাবকে হত্যা করেছিলেন মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ।

জীবন সবসময় মানুষের পরিকল্পনামাফিক চলে না। আমীর বীরের মতো শত্রুর দিকে আঘাত হানতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তার বদলে নিজেই নিজের তরবারিতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়লেন। লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো আমীরের সকল আমল ধ্বংস হয়ে গেছে, সে আত্মহত্যা করেছে। চাচার ব্যাপারে এই কথা শুনে সালামা ইবন আল আকওয়ার খুব মন খারাপ হলো। রাসূল তাকে ডেকে জানতে চাইলেন কী হয়েছে। সালামা জানতে চাইলেন, 'আমার চাচার সকল আমল কি ধ্বংস হয়ে গেছে

ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ? রাসূল ﷺ তাকে আশ্বাস দিয়ে প্রত্যুত্তরে বললেন, 'যে এই কথা বলেছে সে মিথ্যে বলেছে। আমীর দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে।'

ইহুদিদের এই নাঈম দুর্গ মুসলিমদের পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অবরোধের প্রথম কিছুদিন আবু বকরের হাতে ছিল মুসলিম বাহিনীর পতাকা। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বে বিজয় আসছিল না। সবাই যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত, এমন সময় আল্লাহর রাসুল ﷺ ঘোষণা দিলেন,

আগামীকাল আমি এমন একজনকে পতাকা দান করবো যার জন্যে আল্লাহ দুর্গের দরজা খুলে দিবেন। সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে, এবং আল্লাহ আর তাঁর রাসূলও ﷺ তাকে ভালোবাসে।'

এই ঘোষণা যেন টনিকের মতো কাজে দিল। সবার ক্লান্তি নিমিষে কোথায় চলে গেল। কার হাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ পতাকা তুলে দেবেন সেটা ভেবে সবাই রোমাঞ্চিত বোধ করতে লাগলেন। পরদিন সাহাবিরা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে জড়ো হলেন। মনে মনে সবাই আশা করছিলেন- ইশ। আল্লাহর রাসূল যদি আমার হাতে পতাকা তুলে দিতেন। উমার ইবন খাত্তাব নিজেই বলেছেন তার মনে সেদিন কী ছিল। তিনি বলেছেন, 'আমি কোনোদিন নেতৃত্ব বা পদের আকাঙ্ক্ষা করিনি। তবে খাইবারের সেই দিনে আমার মনে নেতৃত্বের আশা জেগেছিল।'

সবাইকে ছাপিয়ে সেদিন যিনি পতাকা লাভ করেছিলেন তিনি হচ্ছেন আলী ইবন আবি তালিব। কিন্তু যিনি এই বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হলেন, তিনি নিজেই ছিলেন অনুপস্থিত। সকাল বেলা আলী সেখানে ছিলেন না। সাহাবিরা জানালেন আলী (রা)চোখের সমস্যায় ভুগছেন। রাসূল ﷺ আলীকে (রা) ডেকে পাঠালেন, তাঁর মুখের কিছু লালা আলীর (রা)চোখে লাগিয়ে দিলেন আর সাথে সাথে আলী সুস্থ হয়ে উঠলেন। আল্লাহর রাসূলের ﷺ আরও একটি মু'জিযা। এরপর তার হাতে পতাকা তুলে দিয়ে বললেন, 'এগিয়ে যাও। আল্লাহ বিজয় দান করা পর্যন্ত পিছু হটো না।' আলী (রা)জানতে চাইলেন, 'কোন কথার উপর আমি লোকদের সাথে লড়াই করবো? রাসূলুল্লাহ বললেন,

'তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য প্রদান করে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। যখনই তারা এ সাক্ষ্য প্রদান করবে তখনই তাদের জান-মাল তোমার হাত থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে। তবে (আইনগত) অধিকারের কথা হলে ভিন্ন। আর তাদের (আন্তরিকতার) হিসাব আল্লাহর কাছে।

আলী হুংকার দিতে দিতে এগিয়ে চললেন। সাহাবিরাও তার পিছু পিছু ছুটছেন। দুর্গের সামনে এসে পতাকাটি পাথরের মধ্যে গেঁথে দিলেন। এই দৃশ্য দেখে ইহুদিরা জিজ্ঞেস করলো,

- কে তুমি?

- আমি আলী ইবন আবি তালিব।

তাওরাতের কসম! তোমরা আমাদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছো।

দশ দিনের মাথায় শেষ পর্যন্ত আলীর (রা)নেতৃত্বে নাঈম দুর্গ জয় হয়ে গেল। আল্লাহর রাসূলের ﷺ ওয়াদা সত্য হলো। এরপর মুসলিমরা অগ্রসর হলেন আস-সা'ব দুর্গের দিকে। তিন দিনের মাথায় আস-সা'ব দুর্গ জয় হলো। এ জয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন আল-হাব্বাব ইবন আল-মুনযির। এই দুর্গ জয়ের মাধ্যমে মুসলিমরা অনেক খাদ্যের সন্ধান পেলেন। এরপর তারা অগ্রসর হলেন আয-যুবাইর দুর্গের দিকে। সেখানে তাদের অবরোধ করে তাদের পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার তিন দিনের মাথায় তারা যুদ্ধ করতে নেমে আসলো এবং পরাজিত হলো।

এরপর মুসলিম সেনাবাহিনী অভিযান চালালো উবাই দুর্গে। গোলাবর্ষণের মাধ্যমে খুব সহজে উবাই দুর্গ আয়ত্তে চলে আসলো। এরপর মুসলিমরা একে একে জয় করলেন আল-কামূস, আল-ওয়াতীহ এবং আস-সুলালাম দুর্গ। চৌদ্দ দিন অবরোধ করে রাখার পর এই দুর্গের ইহুদিরা আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয়। এভাবেই বিজয় হলো সমগ্র খাইবার। এরপর ইহুদিরা অস্ত্র ছেড়ে সন্ধি আলোচনার জন্য নেমে আসে। এ যুদ্ধে

নিহত হয় তিরানব্বই জন ইহুদি। আর মুসলিমদের থেকে শহীদ হন পনেরো থেকে বিশ জন, আল্লাহই ভালো জানেন।

## □ ২৪.উমরাতুল কাযা:

দেখতে দেখতে হুদাইবিয়ার সন্ধির এক বছর হয়ে গেল।আল্লাহর রাসূল ﷺ উমরার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করলেন। আল্লাহর রাসুল ﷺ বলে দিলেন আগের বছর যারা হুদাইবিয়ার সন্ধিতে ছিলেন তাদের কেউ যেন বাদ না পড়ে।তাদের মধ্যে অবশ্য কেউ খাইবার এবং অন্যান্য অভিযানে শহীদ হয়ে গেছেন। তবে নতুন অনেকেই যোগ দিয়েছেন। নারী এবং শিশু ছাড়াই উমরা যাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় দুই হাজার। সে এক অসাধারণ দৃশ্য। বিশাল এক বাহিনী আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে এগিয়ে অসাধান। সবার পরনে একই রকম পোশাক, সাথে কুরবানির জন্য চিহ্নিত পশুর পাল। রাসুলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর উট কাসওয়ার পিঠে বসা, আর তাঁকে ঘিরে রেখেছেন সাহাবিরা (রা)। তাদের সবার হাতে কোষবদ্ধ তরবারি উঁচু করে রাখা। সবাই সরবে পড়ছেন,

লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা লাব্বাইক লা শারিকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদ ওয়া নি মাতা লাকা ওয়াল মুলক। লা শারিকা লাক।

আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি, হে আল্লাহ! আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি। আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি, আপনার কোনো শরীক নেই, আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা, নিআমত এবং সাম্রাজ্য আপনারই। আপনার কোনো শরীক নেই।

তাওহীদের এই বাণীতে আকাশ-বাতাস সেদিন মুখরিত হয়ে উঠলো।

## সাবধানতা অবলম্বন-

কথা ছিল মুসলিমরা মক্কায় ভারী কোনো অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না, কেবল তরবারি রাখতে পারবেন। কিন্তু সফরে রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে তীর-ধনুক-বর্শা জাতীয় ভারী অস্ত্র-শস্ত্র আনলেন, সাথে আরও ছিল মুহাম্মাদ ইবন মাসলামার নেতৃত্বে দুইশো ঘোড়সওয়ারী। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো লুকোছাপা রাখলেন না। কুরাইশরা যখন দেখলো তিনি ভারী অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে মক্কার দিকে আসছেন, তখন তারা পাঠালো মিখরাজ ইবন হাফসকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবিরা তখনো মক্কা থেকে আট মাইল দূরে বনু ইয়াজুজে। মিখরাহ আল্লাহর রাসূলকে বললো,

'মুহাম্মাদ! যৌবনে বা বার্ধক্যে কখনো আপনি বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না। আপনি আর আপনার লোকেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হারামে প্রবেশ করছেন। অথচ আপনি বলেছেন চুক্তিমতে যেভাবে প্রবেশ করার কথা আপনি সেভাবেই প্রবেশ করবেন। কথা ছিল আপনাদের সাথে কোষবন্ধ তরবারি ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। কিন্তু এখন এসব কী দেখছি?'

মক্কার কুরাইশরা বলাবলি করছিল আল্লাহর রাসুল ﷺ চুক্তিভঙ্গ করে যুদ্ধ করতে এসেছেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ মিখরাজকে আশ্বস্ত করলেন, 'চিন্তা কোরো না। আমাদের যেভাবে প্রবেশ করার কথা ছিল আমরা সেভাবেই প্রবেশ করবো।' এ কথা শুনে মিখরাজ কুরাইশদের বলে আসলো, 'মুহাম্মাদ অস্ত্র সহকারে মক্কায় প্রবেশ করবেন না। তিনি চুক্তির শর্ত মেনেই মক্কায় আসবেন।'

লক্ষণীয় হলো, কুফফারদের চোখে রাসূলুল্লাহ ﷺ কেমন ছিলেন। মক্কার কাফিররাই সাক্ষ্য দিত তিনি একজন সত্যবাদী লোক  আল আমীন। শত্রুরাও জানতো, তিনি এক কথার মানুষ। তারা তাঁকে অপছন্দ করতো ঠিকই কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে তিনি এত অসাধারণ একজন মানুষ ছিলেন যে তাকে কদর না করে উপায় ছিল না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ভারী অস্ত্রশস্ত্র মক্কার সীমানার ঠিক বাইরে রেখে গেলেন যেন হঠাৎ প্রয়োজন পড়লে সেগুলো ব্যবহার করা যায়। তিনি এগুলো সাথে রেখেছিলেন তাঁর নিরাপত্তার জন্য, যুদ্ধ করার জন্য নয়। এগুলোর দায়িত্ব তিনি দিয়ে গেলেন মুহাম্মাদ ইবন মাসলামার উপরে। তাঁর সাথে ছিল দুশো ঘোড়সওয়ারি। তারা মক্কার বাইরে অবস্থান করছিলেন। কুরাইশদের সাথে তার শান্তিচুক্তি ছিল সত্যি কিন্তু তিনি তাদের অঙ্গীকারের উপর শতভাগ আস্থা রাখেননি, কারণ ইসলামের শত্রুদের কখনই পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না।

## সাহাবিদের নিয়ে রাসূলুল্লাহর উমরা সম্পাদন:

আল্লাহর রাসূল ﷺ মক্কায় প্রবেশ করলেন। সাহাবিরা (রা)খাপখোলা তলোয়ার হাতে তাঁকে ঘিরে রেখে এগোতে লাগলেন। মক্কার লোকেরা অনেকেই আগ্রহভরে মুসলিমদের। দেখছিল। কেউ কেউ এই দৃশ্য দেখার জন্য পাহাড়ের চূড়ায় উঠে পড়ে।

মক্কার মুশরিকরা গুজব ছড়ালো মদীনার মুসলিমরা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে দুর্বল আর নিস্তেজ হয়ে গেছে। তারা হয়তো এসব কথা বলে মুসলিমদের মানসিকভাবে দুর্বল করতে চাইছিল। তাদের এই গুজবের জবাব দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের আদেশ করলেন যেন তারা নিজেদের ডান কাঁধ উন্মুক্ত করে দিয়ে জোরে জোরে তাওয়াফ করেন। তিনি চাইছিলেন কুফফাররা মুসলিমদের মাঝে দুর্বলতার বিন্দুমাত্র ছাপও যেন খুঁজে না পায়। আর হয়েছিলও তাই, কুফফাররা মুসলিমদের এভাবে তাওয়াফ করতে দেখে বলে, 'ওদেরকে দেখে তো মোটেও দুর্বল মনে হচ্ছে না...'

মুসলিমরা রুকন ইয়ামিন এবং হাজরে আসওয়াদের মাঝামাঝি জায়গাটা ছাড়া বাকি অংশে খুব দ্রুত হাঁটলেন। রুকন ইয়ামিন এবং হাজরে আসওয়াদের মাঝে তারা স্বাভাবিক গতিতে হাঁটলেন কেননা সেখানে তাদেরকে কাফিররা দেখতে পাচ্ছিলো না। এভাবে সাতবারের মধ্যে প্রথম তিনবার তারা এভাবেই জোরে হেঁটে তাওয়াফ করলেন।

তারা এসেছিলেন উমরা করতে। কিন্তু একটা চাপা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ চলছিল দুই শিবিরের মাঝে। জোরে জোরে তাওয়াফ, ডান কাঁধ উন্মুক্ত রাখা, জোরে জোরে হাঁটা এই সবই তাঁরা করছিলেন কুরাইশদের কাছে একটি বার্তা দেওয়ার জন্য আমাদেরকে দুর্বল ভেবো না। এমনটা উহুদের যুদ্ধেও দেখা গেছে। আবু দুজানাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ মাথায় লাল পট্টি বেঁধে বীরদর্পে হাঁটার অনুমতি দিয়েছেন যেন কুফফারদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় যখন মুসলিমরা কুরবানি করার পশু নিয়ে যায়, তখন বেছে বেছে আবু জাহলের একটা উটকেও সাথে রাখা হয় যেন সেটা দেখে কুরাইশরা রাগে-দুঃখে ফুঁসতে পারে। এগুলো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না, ইচ্ছে করেই প্রতিটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কুফফারদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ কেবল মাঠে-ময়দানে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এই যুদ্ধ মন আর মননের যুদ্ধও বটে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং সাহাবিরা (রা)তাওয়াফ সম্পন্ন করলেন। এরপর তিনি কিছু সাহাবিকে মক্কার বাইরে পাঠিয়ে দিলেন নিরাপত্তার দায়িত্বে, যেন বাকি যারা তাওয়াফ করতে পারেনি তারা মক্কায় এসে তাওয়াফ করে নিতে পারে। এভাবেই মক্কায় আগত সমস্ত মুসলিম উমরা সম্পন্ন করলো।

মুতাহ হচ্ছে জর্দান অঞ্চলে 'বালক্কা' নামক স্থানের নিকটবর্তী একটি জনপদের নাম। সেখান হতে বায়তুল মুকাদ্দাস দু' মনজিল ভ্রমণ পথের দূরত্বে অবস্থিত। আলোচ্য যুদ্ধ এ স্থানে সংঘটিত হয়েছিল।

## ▢ ২৫.মুতাহ যুদ্ধ

মুতাহ হচ্ছে জর্দান অঞ্চলে 'বালক্কা' নামক স্থানের নিকটবর্তী একটি জনপদের নাম। সেখান হতে বায়তুল মুকাদ্দাস দু' মনজিল ভ্রমণ পথের দূরত্বে অবস্থিত। আলোচ্য যুদ্ধ এ স্থানে সংঘটিত হয়েছিল।রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবদ্দশায় মুসলিমগণের সামনে এটাই ছিল সব চেয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং এ যুদ্ধ ছিল পরবর্তী পর্যায়ের খ্রিষ্টান দেশসমূহ

বিজয়ের পূর্ব সূত্র। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৮ম হিজরীর জুমাদাল উলা মোতাবেক ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্ট কিংবা সেপ্টেম্বর মাসে।

### ☐ যুদ্ধের কারণ:

এ যুদ্ধের কারণ ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ হারিস বিন 'উমায়ের আযদী)-কে একটি পত্রসহ বুসরার শাসকের নিকট প্রেরণ করেন এবং তদানীন্তন রোম সম্রাটের গভর্ণর শুরাহবিল বিন 'আম্র গাস্সানী যিনি 'বালক্বা' নামক স্থানে নিযুক্ত ছিলেন তিনি হারিস-কে বন্দী করার পর শক্ত করে বেঁধে হত্যা করেন। প্রকাশ থাকে যে, রাষ্ট্রীয় দূত এবং সংবাদ বাহকদের হত্যা করার ব্যাপারটি সব চেয়ে নিকৃষ্ট কাজ এবং

জঘন্যতম অপরাধ। এ ধরণের কাজ ছিল যুদ্ধ ঘোষণার শামিল, বরং বলা যায় যে, তার চেয়েও ভয়ংকর। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এ সংবাদ অবগত হলেন তখন তাঁর সামনে অনভিপ্রেত এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে গেল। মুসলিমগণের পক্ষে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা রইল না। এ উদ্দেশ্যে তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী তিনি প্রস্তুত করে নিলেন।' এবং এটাই ছিল সব চেয়ে বড় ইসলামী যোদ্ধা বাহিনী। এর পূর্বে আহযাব যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে মুসলিমগণের এত বড় বাহিনী সংগঠিত হয় নি।

### ☐ যুদ্ধ শুরু হলো:

যাইদ ইবন হারিসা ছিলেন এই যুদ্ধের প্রথম আমীর। তাঁর হাতে মুসলিম বাহিনীর পতাকা পতপত করে উড়ছে। সবাই দেখলো, বীরের মতো যায়িদ ইবন হারিসা সামনের দিকে ছুটে গেলেন। সেই চেহারায় কোনো ভয় নেই, কোনো শঙ্কা নেই। শত্রুপক্ষের ব্যুহ ভেদ করে তাদের বাহিনীতে ঢুকে পড়লেন অকুতোভয় এক যুবক। যুদ্ধ করতে করতে এক সময় শত্রুদের বর্শা আর বল্লমের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তাকে আর দেখা গেল না।

চারদিক থেকে তীর আর বর্শা ধেয়ে এল তার দিকে। তিনি যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন যতক্ষণ না বর্শার আঘাত তাকে থামিয়ে দেয়। শরীরে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে, শত্রুদের বর্শা তাঁর রক্তে ভিজে একাকার হয়ে যাচ্ছে। যাইদ ইবন হারিসা (রা)আল্লাহর পথে শহীদ হলেন। বীরের মতো পতাকা তুলে নিলেন দ্বিতীয় আমীর জাফর ইবন আবি তালিব(রা)

শত্রুরা এবার ঘিরে ধরলো জাফরকে। সাধারণত সৈনিকরা চেষ্টা করে প্রতিপক্ষের পতাকাবাহীকে আক্রমণ করতে। রোমান সৈনিকরা জাফরকে চারপাশ থেকে নিশ্ছিদ্রভাবে ঘেরাও করে ফেললো। জাফর এতটুকু ভয় পেলেন না। তিনি জানতেন কী হতে যাচ্ছে। ঘোড়ায় চড়ে থাকার কারণে তার যুদ্ধ করতে অসুবিধা হচ্ছিল তাই তিনি ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে নিজের ঘোড়াকে হত্যা করলেন যেন শত্রুরা সেই ঘোড়াকে কাজে লাগাতে না পারে। মুখে কবিতা পড়ছেন আর একের পর এক হামলা সামলে নিচ্ছেন অনায়াসে।

পতাকা ছিল তার ডান হাতে, শত্রুরা ডান হাত কেটে ফেললো। তিনি এবার বাম হাতে পতাকা নিলেন, শত্রুরা বাম হাতও কেটে ফেললো। দুই কাটা হাত দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে, সেদিকে তাঁর ভ্রুক্ষেপ নেই। সেই কাটা দুই হাত দিয়েই জাফর ইসলামের পতাকা বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসছিল তার শরীর, শাহাদাত তাকেও হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। জাফর শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁর রবের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ হলো।

জাফরের শরীরের এখানে-সেখানে কম করে হলেও নব্বইটি জখমের চিহ্ন। সেই জখমগুলোর কোনোটিই তার শরীরের পেছনে না, সবগুলোই সামনে। তিনি পিছু হটার মানুষ ছিলেন না। একত্রিশ বছর বয়সী জাফর এই তো সেদিনই মাত্র আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে নিজের কাছে আটকে রাখেননি। প্রিয় চাচাতো ভাইকে পাঠিয়ে দিয়েছেন এক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে। জাফর আসলেন, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করলেন আর শাহাদাহ বরণ করলেন।

যুদ্ধ তখনও চলছে। এবার নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন তৃতীয় আমীর আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)।পতাকা তুলে নিয়ে তিনি ঘোড়ায় চেপে বসলেন। কবিতার ভাষায় স্বগোতক্তি করলেন,

'হে আমার আত্মা! তুমি আজ আমার শরীর ছেড়ে চলে যাবে। যেতে তোমাকে হবেই, নয়তো জোর করে তোমাকে আমার শরীর ছাড়াবো।"

আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার এক ভাই তাকে এক টুকরো মাংস খেতে দিয়েছিল। খেলে শরীরটা একটু চাঙ্গা হবে। তিনি মাংসে কামড় দিলেন, কিন্তু খাওয়ার মাঝখানে যুদ্ধের কোলাহল শুনে যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। নিজেই নিজেকে বলে উঠলেন, 'আরে, তুমি এখনো বেঁচে আছো।' এই বলে মাংসের টুকরোটা দূরে ছুঁড়ে মেরে ময়দানের দিকে ছুটে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই তার স্বপ্ন পূরণ হলো। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা হন্যে হয়ে শাহাদাতের সন্ধান করছিলেন। শাহাদাতও তাকে পরম মমতায় আলিঙ্গন করে নিলো। শত্রুরা তাকে হত্যা করলো। তিনি লাভ করলেন তার কাঙ্ক্ষিত সম্মান শাহাদাহ।

**খালিদ ইবন ওয়ালিদের নেতৃত্বগ্রহণ**

তিন আমীর একে একে শহীদ হয়ে গেলেন, কিন্তু মুসলিমরা ময়দানে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। ততক্ষণে দিনের আলো নিভু নিভু। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার হাত থেকে পড়ে যাওয়া পতাকা হাতে তুলে নিলেন সাবিত ইবন আরকাম। পতাকা হাতে নিয়ে তিনি নিজেই নিজেকে আমীর ঘোষণা করেননি, বরং চাচ্ছিলেন একজন যোগ্য লোকের হাতে পতাকাটা তুলে দিতে। সাবিত ইবন আরকাম নিজেও একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা। তিনি বদরের যুদ্ধ করেছেন, সত্যি বলতে তিনি নিজেই আমীর হবার যোগ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি এমন কারো হাতে দায়িত্ব দিতে চাইলেন যে মুসলিম বাহিনীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে আনতে পারবে। পতাকা হাতে তুলে বললেন, 'ভাইয়েরা! আমাদের মধ্য থেকে একজন আমীর নির্বাচন করো।' সাহাবিরা বললেন, 'আপনিই এ দায়িত্ব পালন করুন। সাবিত বললেন, 'না, আমি সেটা করবো না।'

সাহাবিরা এরপর খালিদ ইবন ওয়ালিদকে সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করলেন। খালিদ ইবন ওয়ালিদ, যার রণকৌশল নিয়ে নতুন করে কিছু বলাটাও বাহুল্য, তিনি এর আগে অসংখ্য যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সেরাদের সেরা এবার আমীর হিসেবে দায়িত্ব নিলেন। আর এটাই ছিল মুসলিমদের পক্ষে লড়া তাঁর প্রথম যুদ্ধ। একজন নও-মুসলিম হিসেবে জিহাদে অংশ নিলেও তাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনার কমতি ছিল না। খাঁটি যোদ্ধার মতো লড়াই করলেন, লড়তে লড়তে নয়টা তলোয়ার ভেঙে গেল।একটা ইয়েমেনি তলোয়ার শুধু শেষমেশ রক্ষা পেল!

মু'তার ময়দানে কী হচ্ছে সেই খবর আল্লাহর রাসূলকে ﷺ পৌঁছে দিচ্ছিলেন স্বয়ং জিবরীল(আ)।আর তাঁর কাছ থেকে শুনে সাহাবিদের কাছে সেই যুদ্ধের লাইভ বর্ণনা দিচ্ছিলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। যাইদ, জাফর এবং আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার শাহাদতের খবর শুনে তিনি কাঁদতে থাকেন। কিন্তু যখনই জানতে পারলেন খালিদ ইবন ওয়ালিদের হাতে যুদ্ধের পতাকা, তখনই তিনি সবাইকে বিজয়ের সংবাদ দেন। বললেন, 'আল্লাহর তলোয়ারদের মধ্য থেকে একটি তলোয়ার সেই পতাকা তুলে নিল এবং আল্লাহ মুসলিমদের বিজয় দান করলেন।'

প্রথম তিনজন আমীরের শুহাদার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'তারা এখন যেখানে আছে, সেখানেই বেশি সুখে আছে!' আর খালিদ ইবন ওয়ালিদকে সেইদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ একটা নতুন নাম দেন, সাইফুম মিন সুয়ুফিল্লাহ- আল্লাহর তলোয়ার!আল্লাহর রাসূল ﷺ উপযুক্ত নামকরণ ই করেছিলেন।খালিদ ইবনে ওয়ালিদ আর কোন যুদ্ধে পরাজিত হননি।

রাত নেমে এল, যুদ্ধে বিরতি হলো। খালিদ ইবন ওয়ালিদ ভাবছেন কীভাবে মুসলিম বাহিনীকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা যায়। যদি তারা দ্রুত পিছু হটেন, তাহলে শত্রুরা তাদের ধাওয়া করে ধরে ফেলতে পারে। সামরিকবিদ্যায় খালিদ ছিলেন একজন মেধাবি সেনাপতি। তিনি এমন একটা কৌশল বের করলেন যাতে মুসলিমরা পশ্চাদপসরণ করবে ধীরে ধীরে কিন্তু শত্রুরা মুসলিমদের ধরতে পারবে না। তিনি

সবাইকে বললেন সবাই যেন আরও খানিকক্ষণ ধৈর্য ধরে। রাতের অন্ধকারে তিনি ডানপাশের সৈনিকদলকে বাম পাশে,আর বাম পাশের সৈনিকদের ডান পাশে স্থানান্তর করলেন। সামনের সৈনিকদেরকে পাঠিয়ে দিলেন পেছনে, পতাকাগুলোর অবস্থানও বদলে দিলেন।

খালিদের এই কৌশল চমৎকারভাবে কাজ করলো। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রোমানরা মুসলিম বাহিনীর নতুন চেহারা দেখে ভাবলো নিশ্চয়ই মুসলিম বাহিনীতে অতিরিক্ত সৈন্য যোগ হয়েছে। তারা বলাবলি করতে লাগলো, মুসলিমরা যদি মাত্র তিন হাজার সৈন্য আগের দিন ময়দানে টিকে থাকতে পারে, তাহলে নতুন সৈন্য নিয়ে না জানি তারা কী করবে। এই ভয়ে রোমানরা বেশ মুষড়ে পড়লো এবং পিছিয়ে গেল। খালিদ ঠিক এটাই চাচ্ছিলেন। এই সুযোগে তিনি পুরো বাহিনী নিয়ে মদীনায় নিরাপদে ফিরে এলেন। পুরো মুসলিম বাহিনী ধ্বংস হতে পারতো, কিন্তু খালিদ ইবন ওয়ালিদের অসাধারণ কৌশলকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহ তাআলা সেই বাহিনীকে নিরাপদে মদীনায় ফিরিয়ে আনলেন। দুই লক্ষ সৈনিকের মোকাবেলায় এই যুদ্ধে মুসলিমদের মধ্যে মাত্র দশ জন শহীদ হন।

## □ ২৬.মক্কা বিজয়:

ইসলামের ইতিহাসে মক্কা বিজয়ের ঘটনা এমন একটি আযীমুশ শান ঘটনা, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দ্বীন এবং তাঁর রসূলকে শক্তিশালী করেছেন। রসূল (ﷺ) এর সৈনিক এবং হারামে মাক্কীর সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। এই বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ঘর ও শহরকে এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর হিদায়াতের কেন্দ্রস্থলকে কাফের-মুশরিকদের হাত থেকে মুক্ত করেছেন। এই বিজয়ে আসমানের অধিবাসীগণ খুশী হয়েছিল এবং এই বিজয়ের ফলেই দলে দলে লোক ইসলামে প্রবেশ করল।

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, অষ্টম হিজরীর রমযান মাসের দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর নাবী (ﷺ) ১০ হাজার মুজাহিদের একটি বাহিনী নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে বের

হলেন। বের হওয়ার সময় আবু রুহম কুলছুম বিন হুসাইনকে মদ্বীনার খলীফা নির্বাচন করলেন। মক্কা আক্রমণ ও জয় করার কারণ হচ্ছে, কুরাইশরা হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং খোযাআ গোত্রের উপর রাতের অন্ধকারে আক্রমণ করে তাদেরকে অকাতরে হত্যা করেছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত মোতাবেক খোযাআ গোত্র রসূল (ﷺ) এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। এটি ছিল হুদায়বিয়ার সন্ধির সুস্পষ্ট লংঘন।

ইসলামী বাহিনী যখন 'মাররুয যাহরান' নামক স্থানে পৌঁছল তখন রাতের বেলা নাবী (ﷺ) সাহাবীদেরকে আগুন জবালানোর আদেশ দিলেন। সাহাবী প্রজ্জবলিত আগুনের আলোতে আশে-পাশের সমস্ত অঞ্চল আলোকিত হয়ে গেল। তখনো মক্কাবাসীদের কাছে মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের কোন খবর ছিলনা। তবে তাদের অন্তরে আশঙ্কা ছিল যে, যে কোন সময় মুসলিম বাহিনী মক্কায় আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তারা চলে আসবে- এটি তাদের ধারণায় ছিলনা। অতঃপর নাবী (ﷺ) মুজাহিদ বাহিনীকে সাথে নিয়ে বিনা বাধায় মক্কায় প্রবেশ করলেন। প্রথমে তিনি কাবা ঘরের দিকে গেলেন। তাঁর চার পাশে আনসার ও মুহাজিরগণ ঘিরে ছিল। কাবায় গিয়ে তিনি আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করলেন। রসূল (ﷺ)-এর হাতে একটি ধনুক ছিল। সে সময় কাবার অভ্যন্তরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। ধনুকের মাধ্যমে এক এক করে তিনি মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ফেললেন। এ সময় তিনি কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করছিলেন-

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

বলঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল''। [বনী ইসরাইল ১৭:৮]

অতঃপর নাবী ﷺ কাবার ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং সলাত পড়লেন। সলাত পড়ে বাইরে আসলেন। কুরাইশরা তখন সারিবদ্ধভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে অবস্থান করছিল। তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন- হে কুরাইশ সম্প্রদায়? তোমাদের সাথে আজ আমি কেমন আচরণ করব বলে মনে কর? সকলেই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে লাগল- আমরা আপনার কাছ থেকে খুব ভাল আচরণ কামনা করছি। ইউসুফ (আঃ) তাঁর

ভাইদেরকে যা বলেছিলেন আজ আমিও তোমাদের সাথে তাই বলছি। আজ তোমাদের উপর কোন অভিযোগ নেই। তোমরা মুক্ত-স্বাধীন।

## □ ২৭.হুনাইনের যুদ্ধ:

**প্রেক্ষাপট**

মক্কা বিজয় হলো। ইসলামের বিরুদ্ধে সবচাইতে শক্তিশালী ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শক্তি ছিল কুরাইশরা। মক্কা বিজয়ের সাথে তাদের পতন ঘটে। কিন্তু আরও একটি শক্তি তখনও ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য হুমকি হিসেবে কাজ করছিল। তাদের কথা কুরআনেও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

"আর তারা বলে, এ কুরআন কেন দুই জনপদের মধ্যকার কোনো মহান ব্যক্তির উপর নাযিল করা হলো না?" (সূরা ফুসসিলাত, ৪১: ৩১)

এই দুই জনপদ হলো মক্কা আর তাইফ। আর অবশিষ্ট এই বিরোধী শক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল হাওয়াযিন, সাকিফ এবং আরও কিছু গোত্র। এরা হুনাইনের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। সাকিফ গোত্র তাইফে বসবাস করতো। এটি ছিল হাওয়াযিনের একটি শাখা। হাওয়াযিন ছিল কুরাইশের মতোই অন্য অনেকগুলো উপগোত্রের মূল গোত্র। হাওয়াযিনরা কুরাইশদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সেই জাহিলিয়াতের যুগ থেকেই। এই দ্বন্দ্ব ছিল পুরোপুরি গোত্রীয় চেতনা থেকে উদ্ভুত। আল্লাহর রাসূলের মক্কা বিজয়ে হাওয়াযিনরা দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়, কেননা তাদের অস্তিত্ব এখন হুমকির মুখে। কুরাইশ বংশের কেউ এসে তাদের ওপর ক্ষমতাবান হয়ে যাবে, এটা তারা মানতে পারছিল না। তারা স্পষ্টতই বুঝতে পারছিল যে, মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহর রাসূলের পরবর্তী লক্ষ্য তাইফ। ভূ-রাজনৈতিক বিচারে সেটাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ তাইফ ছিল মক্কার নিকটবর্তী সবচেয়ে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী।

তাইফে এর আগে আল্লাহর রাসূল ﷺ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন তারা খুব বাজেভাবে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাদের আচরণ তৎকালীন

জাহিলিয়াতের মানদণ্ডেও প্রচণ্ড আপত্তিকর ছিল। আরবদের মধ্যে সহজাত যে ঔদার্য আর মেহমানদারিতার প্রচলন ছিল, তার ছিটেফোঁটাও তারা দেখায়নি। যখন মানুষকে মিথ্যা মাবুদদের পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর দিকে আহবান করা হয়, তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক, ভদ্রতা, সৌজন্যবোধ, স্বজাত্যবোধ গৌণ হয়ে যায়। তাওহীদ আর শিরকের দ্বন্দ্ব সবকিছুকে ছাপিয়ে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। এটাই চিরন্তন বাস্তবতা।

তারা সিদ্ধান্ত নিল মুসলিমরা আক্রমণ করার আগে তারাই মুসলিমদের ওপর হামলা চালাবে। মালিক ইবন আউফ আল-নাসরির নেতৃত্বে হাওয়াযিন, সাকিফ, বনু হিলাল, বনু সাদ ইবন আবি বকরসহ বেশ কিছু গোত্র এক হলো। তবে কা'ব এবং কিলাব গোত্র তার ডাকে সাড়া দেয়নি। মালিক ইবন আউফ প্রায় বিশ হাজার যোদ্ধার সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী বাহিনী তৈরি করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এই সৈন্যসমাবেশের খবর শুনতে পেয়ে বারো হাজার সৈনিকের এক বাহিনী নিয়ে মক্কার বাইরে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।এই বারো হাজারের মধ্যে দশ হাজার সৈনিক মক্কা বিজয়ে অংশ নিয়েছিল। আর এরপর আত-তুলাকা থেকে আরও দুই হাজার সৈন্য যোগদান করে। মক্কা বিজয়ের পর ক্ষমা ও মুক্তিপ্রাপ্তদের আত-তুলাকা বলা হতো। অর্থাৎ, যেসব মক্কাবাসী মক্কা বিজয়ের পর মুসলিম হয়ে যায় তারা হলো আত-তুলাকা। এই অভিযান চলাকালীন সময়ে মদীনায় গভর্নর হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন আত্তাব ইবন উসাইদ।

## ময়দানে মুখোমুখি দুই দল

সেদিনের আবহাওয়া ছিল খুবই উত্তপ্ত আর শুষ্ক। মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী অগ্রসর হলো।তারা হুনাইনের উপত্যকা ধরে এগোতে লাগলেন। পাহাড় দিয়ে সোজা সামনে এগোনোর সময় কিছু বুঝে ওঠার আগেই হঠাৎ করে চারদিক থেকে শুরু হলো তীরবৃষ্টি। এরপর হাওয়াযিনের অশ্বারোহীরামুসলিমদের ওপর হামলা চালায়। উপর্যুপরি অতর্কিত হামলায় মুসলিম সেনারা পুরোপুরি অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে।দিশেহারা মুসলিম সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে চারপাশে পালাতে থাকে।যুদ্ধের প্রথম ধাক্কায় মালিক ইবন আউফের পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়।

তার পরিকল্পনা ছিল প্রতিটি গিরিপথ, গোপন আর সংকীর্ণ স্থানে ওঁৎ পেতে থাকা আর মুসলিম বাহিনী সেই গিরিপথে এলেই তাদের ওপর আচমকা আক্রমণ করা। আক্রমণ পরিচালিত হবে দুটি ফ্রন্টে পাহাড়ের দুই পাশ থেকে তীর ছোঁড়া হবে আর এরপর মূল সেনাবাহিনী মুসলিমদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ হানবে। মুসলিমদের ধারণাই ছিল না হাওয়াযিনের সৈনিকরা এভাবে লুকিয়ে আছে। হাওয়াযিনের বাহিনী ছিল সুশৃঙ্খল। প্রথমে ছিল সওয়ারীদের সারি, তারপর পদাতিক সৈনিকদের সারি, তারপর মহিলাদের সারি, তার পেছনে ছিল পশুপাল। তাদের দক্ষ তীরন্দাজ ছিল। তার ওপর অশ্বারোহী হাওয়াযিন সেনারা মুসলিমদের ওপর কঠিন হামলা চালায়। মুসলিম সেনাবাহিনীর সামনের দিকে ছিল বনু সুলাইম গোত্রের সেনাদল। আকস্মিক হামলার তীব্রতা ও ভয়াবহতা সামাল দিতে না পেরে তারা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো শুরু করল। তাদের পেছনে ছিল আত-তুলাকা। তারা মাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারাও যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পিছু হটতে লাগলো। উটগুলো পালাতে গিয়ে একটার পর আরেকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এই হামলা এতটাই আচমকা আর তীব্র ছিল যে মুসলিমদের সেরা পদাতিক সৈন্য সালামা ইবন আল-আকওয়াও ময়দান ছেড়ে পালাতে থাকেন। মুসলিম বাহিনী পুরোপুরি বিশৃঙ্খল হয়ে গেল। এভাবে দেখতে দেখতে প্রায় সবাই উধাও হয়ে গেল। ময়দানে টিকে থাকলেন অল্প কিছু মানুষ। আল্লাহর রাসূল, কিছু মুহাজির, আনসার এবং আহলে বাইতের লোকেরা।

"অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বহু জায়গায় এবং হুনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল, অথচ তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি। আর জমিন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।" (সূরা তাওবা, ৯: ২৫)

মুসলিম বাহিনীর এই বিপর্যয়ে দুর্বল ঈমানের মুসলিমরা যেন প্রায় ঈমানহারা হয়ে গেল। আবু সুফিয়ান এই অবস্থা দেখে বলে উঠলেন, 'এরা তো পালাতে পালাতে সমুদ্রের পাড় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।' সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যার ভাই বলে ওঠে, 'জাদুর

কেরামতি আজ শেষ। মুহাম্মদের জাদু আর কাজ করছে না।' এ কথা শুনে সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা ক্ষেপে গেল, 'থাম তুই! আল্লাহ তোর মুখ ভেঙে দিক! আল্লাহর কসম, আমি একজন কুরাইশের কর্তৃত্ব মেনে নিতে রাজি আছি, কিন্তু কোনো হাওয়াযিনের কর্তৃত্ব মানতে রাজি নই।'

এদিকে রাসূলুল্লাহ অবিচলভাবে ময়দানে দাঁড়িয়ে। তিনি সবাইকে ডাকছেন আর বলছেন, 'লোকেরা তোমরা কোথায় যাচ্ছো? আমার দিকে এসো, আমি মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ, আল্লাহর রাসূল!'

কিন্তু কেউ তাঁর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছিল না। সবাই শত্রুদের আক্রমণের ধাক্কায় পড়িমড়ি করে ছুটছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তবু সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে 'আমি আল্লাহর নবী। আমি মিথ্যাবাদী নই। আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।' এ সময়টাতে তাঁর সাথে ছিলেন চাচা আব্বাস, আবু সুফিয়ান ইবন আল-হারিস এবং অল্প কিছু মুহাজির ও কুরাইশ। আল্লাহর রাসূল আব্বাসকে বললেন, 'আব্বাস, সাম্রার লোকদের ডাক দাও।' সামুরাহ হচ্ছে বাইয়াতুর রিদওয়ানে উপস্থিত সাহাবিদের দল। আব্বাস চিৎকার করে বাইয়াতুর রিদওয়ানের সাহাবিদের ডাকলেন- সেরা সব সাহাবি। তার আহবানের সাথে সাথে তারা যেন তীরের বেগে ময়দানে ফিরে এল। আর বলতে লাগলেন, 'আমরা এসেছি। আমরা এসেছি!'

এরপর বিশেষভাবে আনসারদের আহবান করা হলো। এরপর বিশেষভাবে ডাকা হলো খাযরাজদের। ডাকা হলো হলো একে একে সবগুলো গোত্রকে। মুসলিমদের অনেকেই প্রাথমিক ধাক্কা সামলে ময়দানে ফিরে এল। রাসূলুল্লাহর ﷺ চারপাশে জড়ো হলেন প্রায় একশো সাহাবি। প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলো। আল্লাহর রাসূল এবার ময়দানের দিকে দৃষ্টি মেলে বললেন, 'এবার ঠিকই জ্বলেছে যুদ্ধের অগ্নিশিখা!'

আল্লাহর রাসূল ﷺ এক মুঠো ধুলো তুলে মুশরিকদের দিকে নিক্ষেপ করলেন, বললেন, 'মুহাম্মাদের রবের শপথ! তোরা ধ্বংস হ।' এই ধুলো শত্রুবাহিনীর প্রত্যেকের চোখে

গিয়ে পড়ে। এর পর তীরন্দাজরা আর মুসলিমদের ওপর তীর ছুঁড়তেই পারেনি। এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে মু'জিযা। এরপরই যুদ্ধের মোড় ঘুরে যেতে লাগলো।

"তারপর আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন তাঁর রাসূলের ওপর ও মু'মিনদের ওপর এবং নাযিল করলেন এমন সৈন্যবাহিনী যাদেরকে তোমরা দেখনি, আর কাফিরদেরকে আযাব দিলেন। আর এটা কাফিরদের কর্মফল।" (সূরা তাওবা, ৯: ২৬)

আল্লাহর এই সৈন্য ছিল ফেরেশতা। জুবাইর ইবন মুতইম বলেন, 'আমরা আকাশে কালো মেঘ দেখতে পেলাম। এরপর যখন তা মাটিতে নেমে এল, আমরা দেখলাম অগণিত পিপড়া। এ যেন পিপড়ার গালিচা! আর আমরা মনে করলাম এটাই হলো আল্লাহর সৈন্য।' আল্লাহর রাসূল যখন মুশরিকদের ওপর ধুলো নিক্ষেপ করেছিলেন, তা তাদের অন্তরে প্রবল ত্রাস আর আতঙ্কের জন্ম দেয়। আর মু'মিনদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা ঢেলে দিলেন প্রশান্তি বা সাকিনাহ। বদরের যুদ্ধেও এমনটা হয়েছিল। আল্লাহ যদি চান, যুদ্ধক্ষেত্রের অস্থির পরিস্থিতিতেও তাঁর বান্দাদের মনে প্রশান্তি ঢেলে দিতে পারেন। এই প্রশান্তি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে মু'মিনদের জন্য সাহায্য।

এই সাহায্য আসার পরেই যুদ্ধের পরিস্থিতি বদলে যায়। মুসলিমরা ময়দানে ফিরে আসলে হাওয়াযিনরা আর কোনো পাল্টা আক্রমণ করা দূরে থাক, কোনো প্রতিরোধই গড়তে পারেনি। বরং তারা ময়দান ছেড়ে পালাতে শুরু করে। সম্ভবত এর কারণ হলো অনভিজ্ঞ মালিক ইবন আউফের আর কোনো বিকল্প পরিকল্পনা ছিল না। একটিমাত্র কৌশলকে পুঁজি করে তার বাহিনী এই যুদ্ধে অংশ নেয়। প্রাথমিকভাবে তাদের এই কৌশল কাজে লাগলেও যখন মুসলিমরা ঘুরে দাঁড়ালো, তখন তাদের কৌশলগত দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যায়। ফলে তারা হেরে যেতে থাকে। যে অল্প কয়েকজন সাহাবি রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে থেকে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন আবু বকর, উমার ইবন খাত্তাব, আলী ইবন আবি তালিব, আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব, তাঁর ছেলে ফাযল ইবন আব্বাস, আবু সুফিয়ান ইবন হারিস, রাবিয়া প্রমুখ।

### □ ২৮.তাবুক যুদ্ধ:

গাজওয়ে তাবুক বা তাবুক যুদ্ধ। এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনের শেষ যুদ্ধ এবং যা রোম সম্রাজ্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। তৎকালীন সময়ের অর্ধেক পৃথিবীর একচ্ছত্র শাসক রোম সম্রাটের সিরিয় গভর্নরের বিরুদ্ধে ৮ম হিজরীর জুমাদাল ঊলা মাসে পরিচালিত 'মুতা' অভিযানে এক অসম যুদ্ধে রোমকদের পিছুটানের ফলে আরব উপদ্বীপে মুসলিম শক্তির শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রভাব বিস্তৃত হয়। ইসলামের ইতিহাসে এটি তাবুক অভিযান নামেও পরিচিত।

এ সময় মদীনার সাবেক আউস নেতা ও খৃষ্টান ধর্মীয় গুরু আবু আমের আর-রাহেব হোনায়েন যুদ্ধের পর সবদিক দিয়ে নিরাশ হয়ে অবশেষে সিরিয়ায় (শাম) চলে যান। কেননা এটি তখন ছিল খৃষ্টানদের কেন্দ্রবিন্দু। সেখানে গিয়ে তিনি রোম সম্রাটকে মদীনা আক্রমণের জন্য প্ররোচনা দিতে থাকেন। এ উদ্দেশ্যে মদীনার মুনাফিকদের সাথে তিনি পুরা যোগাযোগ রাখেন এবং তাদেরকে দিয়ে তিনি মসজিদে ক্বোবার অদূরে 'মসজিদে যেরার' নির্মাণ করান মসজিদের মুখোশে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র হিসাবে। রোম সম্রাটকে তিনি বুঝাতে সক্ষম হন যে, মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিরুদ্ধে তার একটি বিরাট দল রয়েছে। যারা বাহ্যিকভাবে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর দলে মিশে আছে। বাইরে থেকে রোমকরা হামলা করলেই তারা ঘুরে দাঁড়াবে এবং রোমকদের সহজ বিজয় লাভ হবে।

একদিকে রাজনৈতিক বাস্তবতা অন্যদিকে আবু আমেরের এই প্ররোচনা রোম সম্রাটকে উৎসাহিত করল। পূর্ণরূপে শক্তি সঞ্চয়ের পূর্বেই উঠতি ইসলামী শক্তিকে নির্মূল করে দেবার সংকল্প নিয়ে তিনি ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেন। যাতে রোম সাম্রাজ্য সংলগ্ন আরব এলাকা থেকে ভবিষ্যতে কোনরূপ ফিৎনা বা বিদ্রোহ দেখা দেবার সুযোগ সৃষ্টি না হয়।

## ▢ কুরআনের চোখে তাবুকের যুদ্ধ:

রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যুর আগে তাবুকের যুদ্ধ ছিল মুসলিমদের জন্য একটি কঠিন। পরীক্ষা। তাবুকের জিহাদ ছিল ইসলামের স্বর্ণশিখর, রাসূলের জীবনের জিহাদের অধ্যায়টি এর দ্বারা সমাপ্ত হয়। জিহাদ সম্পর্কিত চূড়ান্ত বিধানগুলো তাবুকের সময় নাযিল হয়। এই জিহাদ মু'মিন ও মুনাফিকদের মাঝে পার্থক্য গড়ে দিয়েছিল। বদর যুদ্ধের পরপরই মদীনায় নিফাকের উৎপাত দেখা যায়। তাবুকের সময় যে আয়াতগুলো নাযিল হয় তা মুনাফিকদের পুরোপুরি উন্মোচিত করে দেয়। নিফাক সম্পর্কিত বেশিরভাগ আয়াত এসেছে সূরা আত-তাওবায়। এই সূরাটি নাযিল হয়েছিল ৯ম হিজরিতে। এর অধিকাংশ আয়াতই তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কিত।

জিহাদের প্রতি অনীহা অন্তরের একটি রোগ:

তাবুকে যদিও কোনো লড়াই হয়নি, তবুও শরীয়াহ, ঈমান ও সিয়াসাহ- সবক্ষেত্রেই তাবুক থেকে আমাদের শেখার অনেক কিছু আছে। তাই তাবুক যুদ্ধের ব্যবচ্ছেদের আগে এই যুদ্ধসংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর উপর আলোকপাত করা জরুরি।

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক আর জেনে রাখো, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।" (আত-তাওবাহ ৯: ১২৩)

তাবুকের জিহাদ ছিল একটি পরীক্ষা। আল্লাহর পক্ষ থেকে তখন পর্যন্ত আসা সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা। তাই এই যুদ্ধের বাহিনীকে বলা হয় যাইশ আল 'উসরাহ বা 'প্রতিকূলতার বাহিনী'। উসরাহ অর্থ কঠিন, প্রতিকূল। এই বাহিনীর জন্য অর্থ যোগানো ছিল কষ্টকর, সৈন্যদের একত্র করা ছিল কষ্টসাধ্য, আবহাওয়া ছিল রূঢ়, পানি ছিল দুষ্প্রাপ্য। যে পথ পাড়ি দিয়ে যুদ্ধে যেতে হতো, তা ছিল প্রতিকূল। প্রতিপক্ষ হিসেবে রোমানরাও ছিল সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল কুরআনে এই সময়কে বলেছেন সা'আতুল উসরাহ বা 'প্রতিকূল সময়'।

নবীজি ﷺ এই যুদ্ধের জন্য মক্কা, মদীনা ও এর আশেপাশের গোত্রগুলো থেকে যে যেখানে আছে তাদের সবাইকে ডাক দিয়েছিলেন। এর আগে কখনো এমনটা হয়নি। নবীজি চেয়েছেন প্রত্যেক সবল মুসলিম এই যুদ্ধে অংশ নিক।

কুরআন আমাদের অন্তরের রোগগুলোর কথা বলে। কুরআন নাযিল হয়েছে সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, যিনি আমাদের ভেতরের ও বাইরের সব খবর জানেন। কুরআন আমাদের এমন কিছু দুর্বলতার কথা বলে দিতে পারে, যেগুলো অনেক সময় আমরা নিজেরাও বুঝতে পারি না বা বুঝলেও স্বীকার করি না। এজন্যই কুরআন অনন্য। তাবুকের বাহিনীতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ ছিল না। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল কুরআনে জানিয়ে দিয়েছেন কেন যুদ্ধে যেতে কিছু মানুষের এত অনীহা আর অনাগ্রহ ছিল।

এখনকার সময়েও জিহাদে যোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথাই বলে। কেউ বলে যে ফিকহ অনুসারে এটা ঠিক নয়, কেউ বলে যে এই বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, কেউ বলে যে এটা করা হিকমাহর পরিচয় নয়, কেউ বলে এসবের কোনো মানেই হয় না! কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলেছেন এমন কথা যা কেউ সহজে স্বীকার করতে চায় না।

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হলো? যখন আল্লাহর পথে বের হওয়ার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি আঁকড়ে ধরো, তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের ভোগবিলাস তো অতি অল্প।" (আত-তাওবাহ ৯: ৩৮)

এই আয়াত আমাদের অন্তরের রোগ ও রোগের চিকিৎসাও বলে দিয়েছে। এই রোগ হচ্ছে দুনিয়ার প্রতি মায়া, ভালোবাসা। আমরা আমাদের জীবনকে অনেক বেশি ভালোবাসি, তাই সবকিছু ছেড়েছুড়ে জিহাদে যেতে চাই না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন দুনিয়ার জীবন আখিরাতের তুলনায় কিছুই না। সুতরাং রোগের চিকিৎসা হচ্ছে বাস্তবতা উপলব্ধি করে আখিরাতের জন্য বাঁচা।

**❑ যুদ্ধের ময়দানে:**

তাবুকের যুদ্ধ ছিল রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে। কিন্তু কোনো রোমান ব্যাটালিয়ন বা স্থানীয় আরব খ্রিস্টান কোনো বাহিনীর চিহ্নই দেখা গেল না। কোনো যুদ্ধই হলো না। কারণ রাসূলুল্লাহর ﷺ আগমনের খবর রোমানদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দেয়। তাই তাদের আধুনিক সমরাস্ত্র আর বিরাট সেনাবাহিনী থাকা সত্ত্বেও তারা যুদ্ধের জন্য বের হয়নি। সম্মুখ সমরে মুখোমুখি হতে তারা ভয় পেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে অবস্থান করে তাদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন কিন্তু কেউই এল না। সে সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ শাম ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কয়েকটি শহর দখল করে তাদের সাথে চুক্তি করেন ও জিযিয়া গ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দাউমাতুল জান্দালের রাজা উকাইদকে বন্দী করে আনার জন্য খালিদ ইবন ওয়ালিদকে পাঠান। রাসূলুল্লাহ ﷺ খালিদকে বলেই দিয়েছিলেন, 'তুমি দেখবে উকাইদ গাভী শিকারে ব্যস্ত।' হলোও তাই। সেদিন ছিল এক পূর্ণিমার রাত। উকাইদ দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছিল গাভী শিকারের জন্য। খালিদ ইবন ওয়ালিদ তাকে আক্রমণ করে বন্দী করলেন। উকাইদ জিযিয়া দিতে রাজি হলো। জারবা, আযরা, মাকনা- এই অঞ্চলের খ্রিস্টানরা জিযিয়া দিতে রাজি হয় এবং ইসলামী শাসনের অধীনে চলে আসে। এই ছোট ছোট রাজ্যগুলো ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়ায় ইসলামী সাম্রাজ্যের উত্তর সীমা সুরক্ষিত হয় এবং এই অঞ্চলটি রোমান ও মুসলিমদের মাঝে 'বাফার জোন' হিসেবে কাজ করে। এই রাজ্যগুলো যদিও ইতিপূর্বে রোমানদের অধীনস্থ ছিল, কিন্তু রোমানদের প্রতি তারা খুশি ছিল না। যে কারণে তারা বেশ সহজেই ইসলামের অধীনে চলে আসে। পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশিদার সময়ে এই অঞ্চলগুলো থেকে রোমান সাম্রাজ্যের ওপর সামরিক হামলাগুলো পরিচালনা করা হয়।

তাবুকের যুদ্ধ ছিল আল্লাহর রাসূলের ﷺ জীবনের সর্বশেষ বড় অভিযান। এই যুদ্ধ ছিল মুসলিমদের জন্য একটি পরীক্ষা।

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করেছেন নবীর ওপর, অনুগ্রহ করেছেন মুহাজির ও আনসারদের ওপর, যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে ছিল। (এমনকি) যখন তাদের একটি দলের অন্তর বাঁকা পথে ঝুঁকে পড়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিল, অতঃপর আল্লাহ এদের সবার ওপর দয়া করলেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়।" (সূরা তাওবা, ৯: ১১৭)

এই আয়াত আল্লাহর রাসূলের ﷺ জীবনের সমাপ্তির ইঙ্গিত দেয়। কেননা ক্ষমা হলো এমন একটি ব্যাপার, যা সমাপ্তির দিকেই আসে। ইবাদাতের শেষ দিকেই আমরা সাধারণত ইস্তিগফার করি। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও অন্যান্য মুসলিমদেরকে জানানো হচ্ছে যে, আল্লাহ রাসূলুল্লাহকে ﷺ ক্ষমা করে দিয়েছেন, আরও ক্ষমা করে দিয়েছেন সেই সব আনসার ও মুহাজিরদের যারা কঠিন সময়ে তাঁর সাথে ছিলেন।

## ☐ ২৯.বিদায় হজ্জ:

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সম্পূর্ণ হল এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সার্বভৌমত্বে অস্বীকৃতি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পয়গম্বরের ভিত্তির উপর এক নতুন সমাজ কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হল। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট আভাষ দেয়া হচ্ছিল যে, পৃথিবীতে তাঁর অবস্থানের সময় কাল ফুরিয়ে এসেছে। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মু'আয বিন জাবাল-কে ইয়ামানের গভর্ণর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন দশম হিজরী সনে। তখন তাঁর বিদায়কালে অন্যান্য উপদেশাবলীর নঙ্গে এ কথাও বললেন,

'হে মু'আয! এ বছরের পর তোমার সঙ্গে আমার হয়ত আর সাক্ষাত নাও হতে পারে, তখন হয়ত বা আমার এ মসজিদ এবং আমার কবরের পাশ দিয়ে তোমরা যাতায়াত করবে।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মুখ থেকে মু'আয (রা) এ কথা শুনে আসন্ন বিচ্ছেদের চিন্তায় অস্থির হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছেয় রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সেই ঐতিহাসিক হজ্জে মকবুলের জন্য তাঁর ইচ্ছে এবংকর্মসূচি ঘোষণা করলেন তখন আরবের মুসলিমগণ দলে দলে সমবেত হতে আরম্ভ করে দিলেন। প্রত্যেকেরই ঐকান্তিক ইচ্ছে ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পদচিহ্নকে নিজ নিজ চলার পথে একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত ও অনুসরণযোগ্য বা পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে নেবেন।'অতঃপর যুল ক্বা'দাহ মাসের ৪ দিন অবশিষ্ট থাকতে শনিবার দিবস রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা অভিমুখে যাত্রার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।

মাসজিদুল হারামে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে কা'বাহ গৃহের তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। অতঃপর সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ করেন। কিন্তু ইহরাম ভঙ্গ করেন নি। কারণ, হজ্জ এবং 'উমরাহর জন্য তিনি একই সঙ্গে ইহ্রাম বেঁধে ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে হাদয়ীও (কুরবানীর পশু) ছিল। তাওয়াফ ও সা'ঈ সম্পন্ন করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার উপরিভাগে হাজুন নামক স্থানের পাশে অবস্থান করেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার হজ্জের ত্বাওয়াফ ছাড়া আর অন্য কোন ত্বাওয়াফ করেন নি। সাহাবাগণের মধ্যে যাঁরা কুরবানীর পশু (হাদয়ী) সঙ্গে নিয়ে আসেন নি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে নিজ নিজ ইহ্রাম 'উমরাহয় পরিবর্তন করে নিতে এবং বায়তুল্লাহ ত্বাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সা'ঈ সম্পন্ন করে নিয়ে হালাল হয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন।

যুল হিজ্জাহ মাসের ৮ তারিখে তারবিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় গমন করেন এবং তথায় ৯ই যুল হিজ্জার সকাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। সেখানে যুহর, 'আসর, মাগরিব, এশা এবং ফজর এ পাঁচ ওয়াক্তের সালাত আদায় করেন। অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। অতঃপর আরাফার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং সেখানে যখন পৌঁছেন তখন ওয়াদীয়ে নামিরায় তাঁবু প্রস্তুত হয়েছিল। সেখানে তিনি অবতরণ করলেন। সূর্য যখন পশ্চিম দিকে ঢলে গেল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশে কাসওয়া নামক উটের পিঠে হাওদা চাপানো হল। এরপর তিনি বাতুনে ওয়াদীতে গমন করলেন। ঐ সময় নাবী ﷺ এর সঙ্গে ছিলেন এক লক্ষ চল্লিশ কিংবা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের এক বিশাল জনতার ঢল। এ বিশাল জনতার উদ্দেশ্যে তিনি এক ঐতিহাসিক এবং

মর্মস্পর্শী ভাষণ প্রদান করেন। সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে সবার উদ্দেশ্য ভাষণ দিলেন,যেটা বিদায় হজ্জের ভাষণ নামে পরিচিত। তিনি বলেন,

“আজকের এই দিন, এই মাস ও এই শহর যেমন পবিত্র; তোমাদের জান, মাল, ইজ্জত কিয়ামত পর্যন্ত তেমনই পবিত্র। কারো কাছে যদি কোনো আমানত রক্ষিত থাকে, তাহলে সে যেন তা আমানতকারীর কাছে পৌঁছে দেয়। তোমরা অন্যের ওপর অত্যাচার করবে না, নিজেরাও অত্যাচারিত হবে না।

জেনে রেখো, জাহিলী যুগের সকল অপসংস্কৃতি আমার পায়ের নিচে। শুধু কাবাঘরের তত্ত্বাবধান ও হাজীদের পানি পান করানো ছাড়া। জাহিলিয়াতের সকল রক্তপণের দাবি বাতিল করা হলো। প্রথম যে রক্তপণের দাবি বাতিল করছি, তা হলো রবিয়া ইবন হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিবের রক্ত। সে শিশু অবস্থায় বনু সাদের দুগ্ধপোষ্য ছিল, তখন হুযায়ল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে।

জাহেলী যুগের সুদের প্রথা বিলুপ্ত করা হলো। তোমাদের কেবল মূলধনের ওপর অধিকার থাকলো। সর্বপ্রথম যে সুদ বাতিল করছি, তা হলো আমাদের বংশের আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবের সুদ। তার সমস্ত সুদ বাতিল করা হলো।

নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নারীদের উপর যেমন পুরুষদের অধিকার রয়েছে, তেমনি পুরুষদের উপর রয়েছে নারীদের অধিকার। তোমরা তাদের আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর নির্ধারিত কালিমা বাক্যের মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছো। তাদের উপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তোমরা অপছন্দ করো এমন কাউকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেবে না। যদি তারা এরূপ করে, তবে হালকাভাবে প্রহার কর। আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার হলো, তোমরা তাদের ভরণ-পোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছেদের ভার বহন করবে ন্যায়সঙ্গতভাবে।

আমার পর তোমরা পরস্পর খুনোখুনিতে জড়িয়ে কুফরে পতিত হয়ো না। যারা সালাত আদায় করবে, তারা (পুনরায়) শয়তানের ইবাদাত করবে, এটা শয়তান আশা করে না। কিন্তু সে তোমাদের মধ্যে বিবাদ করতে থাকবে।

তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে। যদি বিকলাঙ্গ কোনো দাসও তোমাদের উপর নেতা নিযুক্ত হয় এবং সে তোমাদের আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী নেতৃত্ব দেয়, তাহলে তাঁকে শুনবে ও মানবে।

সাবধান। অপরাধী তার অপরাধের জন্য নিজেই দায়ী। সাবধান! পিতার অপরাধ সন্তানের ওপর বর্তায় না, না বর্তায় সন্তানের অপরাধ পিতার ওপরে। জেনে রেখো, এ নগরে আর কখনো শয়তানের ইবাদাত হবে না, এ থেকে সে নিরাশ হয়ে গেছে। তবে তুচ্ছ ভেবে এমন অনেক কাজ তোমরা করবে, যা করলে সে খুশি হবে।

তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করবে, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, রামাদান মাসে সিয়াম পালন করবে, যাকাত আদায় করবে ও তোমাদের নেতার আদেশ মেনে চলবে, তবে তোমরা জান্নাত লাভ করবে।

তোমাদের গোলাম ও অধীনস্থদের বিষয়ে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। তোমরা যা খাবে, তাদেরকে তা খেতে দেবে। তোমরা যা পরবে তাদেরকেও সেভাবে পরতে দেবে।

জেনে রেখো, এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। তোমাদের একের সম্পদ আরেকজনের জন্য বৈধ নয়। তবে কেউ স্বেচ্ছায়, খুশি মনে তার সম্পদ কাউকে দিয়ে দিলে সেটা ভিন্ন কথা। কাজেই নিজেরা নিজেদের ওপর জুলুম কোরো না।

আল্লাহ তাআলা তোমাদের সম্পদের মিরাস নির্দিষ্টভাবে বণ্টন করে দিয়েছেন। তার থেকে কম বেশি করবে না। সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগের চেয়ে অতিরিক্ত কোনো অসিয়ত বৈধ নয়। সন্তান যার বিছানায় জন্ম গ্রহণ করবে, সে তারই হবে। ব্যভিচারের শাস্তি হচ্ছে প্রস্তরাঘাত। (অর্থাৎ সন্তানের জন্য শর্ত হলো তা বিবাহিত দম্পতির হতে হবে। ব্যভিচারীর সন্তানের অধিকার নেই)। যে সন্তান আপন পিতা ব্যতীত অন্যকে

পিতা এবং যে দাস নিজের মালিক ব্যতীত অন্য কাউকে মালিক বলে স্বীকার করে, তাদের উপর আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতাকুল এবং সমগ্র মানব জাতির অভিশাপ।

নিশ্চয়ই তোমাদের রব এক, তোমাদের পিতা এক। আরবের ওপর অনারবের এবং অনারবের ওপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সাদার উপর কালোর আর কালোর উপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হবে কেবল তাকওয়ার মাপকাঠিতে।

মনে রেখো, সকলকে একদিন আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির হতে হবে। সে দিন তিনি প্রতিটি কাজের হিসাব গ্রহণ করবেন। তোমরা আমার পরে গোমরাহিতে লিপ্ত হবে না, পরস্পর হানাহানিতে মেতে উঠবে না। আমি শেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না। আমার মাধ্যমে ওয়াহীর পরিসমাপ্তি হতে যাচ্ছে। আমি তোমাদের জন্য দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এই দুটি বস্তু আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব ও অপরটি রাসূলের সুন্নাহ।

প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে আমার কথাগুলো পৌঁছিয়ে দেয়। হতে পারে, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে এমন অনেকে থাকবে যারা উপস্থিত শ্রোতার চাইতে আমার কথাগুলো ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারবে।”

খুতবা শেষে আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন,

“তোমাদেরকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা তখন কী বলবে?”

সাহাবিরা (রা) উত্তর দিলেন, “আমরা সাক্ষ্য দেবো, নিশ্চয়ই আপনি আপনার বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন, দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আমাদের আন্তরিক উপদেশ দিয়েছেন।” এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ আকাশের দিকে আঙুল তুললেন, এরপর আবার মানুষের দিকে আঙুল দেখালেন, এরকম কয়েকবার করলেন আর বলতে থাকলেন,

“হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো! হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো! হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো!”

## ▢ আল্লাহর রাসূলের দুআ:

বিদায় হজ্জের আলোচনার উপসংহার হিসাবে যোগ্য আল্লাহর রাসূলের ﷺ এই দু'আটি। শাইখ আবুল হাসান আন-নাদভী তাঁর আস-সীরাহ আন-নববী গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন,

'হে আল্লাহ! তুমি নিশ্চয়ই আমার কথাগুলো শুনেছো, দেখেছো আমি কোথায় আছি। তুমি আমার অন্তরের খবর জানো, তুমি আমার বাহ্যিক অবস্থাও জানো, আমার কিছুই তোমার কাছে গোপন নয়। আমি অসহায়, দুর্বল। আমি তোমার কাছে সাহায্য চাই, তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আমি তোমার শাস্তির আশঙ্কা করি, ভয় করি। আমি নিজের সমস্ত দোষ তোমার কাছে স্বীকার করে নিচ্ছি। এক অসহায় বান্দা হিসেবে আমি তোমার কাছে সাহায্য চাই, গুনাহগার হিসেবে আমি তোমার কাছে তাওবা করি। একজন ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ হয়ে আমি তোমার কাছে মিনতি করছি, নিজেকে সঁপে দিয়ে তোমার কাছে মিনতি করছি, অঝোরে কেঁদে তোমার কাছে মিনতি করছি, বিনম্র হয়ে তোমার কাছে মিনতি করছি। ও আল্লাহ! ও আমার রব! তুমি আমার এই মিনতি কবুল করে আমাকে সন্তুষ্ট করো। আমার প্রতি দয়া করো, করুণা করো! তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দুআ শ্রবণকারী, তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দাতা!'

## ▢ ৩০.জীবনসায়াহ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ:

আল্লাহর রাসুলের ﷺ সীরাতের সফলতম সময় চলছিল। আল্লাহর রাসূলকে নবুওয়াতের যে মিশন দিয়ে পাঠানো হয়েছিল, সে মিশনের পূর্ণতাপ্রাপ্তি হয়েছে। আজ থেকে তেইশ বছর আগে যে তাওহীদের বার্তা নিয়ে তিনি এসেছিলেন, সেই বার্তাকে লোকেরা এখন সাদরে গ্রহণ করেছে। আরব উপদ্বীপ থেকে শিরক বিতাড়িত হয়েছে, আল্লাহর ঘর কাবায় তাওহীদ প্রত্যাবর্তন করেছে। সমগ্র আরব ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছে, আরবের চারপাশে ইসলাম কড়া নাড়তে শুরু করেছে। আর আল্লাহর ইচ্ছায় রাসূল এমন এক প্রজন্মকে তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন যারা ইসলামের এই বিজয় মশাল

পুরো বিশ্বে বহন করে নেওয়ার যোগ্যতা রাখেন। দুনিয়ার বুকে মুসলিমদের জীবন কীভাবে পরিচালিত হবে তার বাস্তব উদাহরণ মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের মাধ্যমে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর ওপর আরোপিত গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন, তাঁর বিদায় নেওয়ার সময়ও তাই ঘনিয়ে এসেছে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ যে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবেন, সে ব্যাপারে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল আগে থেকেই বেশ কিছু আয়াত নাযিল করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

"আপনার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। আপনার রব শীঘ্রই আপনাকে এমন কিছু দেবেন যে আপনি খুশি হবেন।" (সূরা আদ দুহা, ৯৩: ৪-৫)

“নিশ্চয়ই আপনারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরা সবাই তোমাদের রবের সামনে বাকবিতণ্ডা করবে।" (সূরা যুমার, ৩৯: ৩০-৩১)

"আপনার আগেও কোনো মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে? প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" (সূরা আম্বিয়া, ২১: ৩৪-৩৫)

"আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূল। তার আগে নিশ্চয়ই অনেক রাসূল বিগত হয়েছে। যদি তিনি মারা যান অথবা তাঁকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি পেছনে ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায়, সে কখনো আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৪৪)

সে বছর সফর মাসের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন মাঝরাতে আবু মুওয়াইহিবাকে ডেকে বললেন, 'আবু মুওয়াইহিবা, আমাকে বাক্বী'র অধিবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। চলো আমার সাথে।' আবু মুওয়াইহিবা ছিলেন

আল্লাহর রাসূলের ﷺ আযাদকৃত দাস। আল বাক্বী' হলো মদীনার কবরস্থান।সেখানে সমাহিত করা হয়েছে সেইসব সাহাবিদের যারা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে কষ্ট করেছেন, যুদ্ধ করেছেন, ইসলামের জন্য জান দিয়েছেন। গভীর রাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাক্বীতে গেলেন,

'হে কবরবাসী, তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা যে অবস্থায় আছো, সেটা জীবিতদের চাইতে ভালো। তোমরা সুখী হও। আঁধার রাতের মতো ধেয়ে আসছে ফিতনা-ফাসাদ -- একটার পেছনে আরেকটা, আর প্রথমটার চাইতে পরেরটা ভয়াবহ।'

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু মুওয়াইহিবার দিকে তাকালেন। বললেন, 'আমাকে এই দুই এর মাঝে একটি বাছাই করতে বলা হয়েছিল, হয় আমি দুনিয়ার সমস্ত রত্নভাণ্ডার আর সম্পদের চাবি নিয়ে শেষ পর্যন্ত থাকবো। এরপর জান্নাতে যাবো। অথবা আমার রবের সাথে সাক্ষাৎ এবং জান্নাত।'

আবু মুওয়াইহিবা বললেন, 'আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক। আপনি দুনিয়ার রত্নভাণ্ডার, শেষপর্যন্ত দুনিয়াতে থেকে তারপর জান্নাত এই সুযোগটাই বেছে নিন!' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

'না, আল্লাহর কসম, আমি আমার রবের সাথে মিলিত হওয়া এবং জান্নাতকেই বেছে নিয়েছি।'

### ▢ বিদায়বেলা:

আল্লাহর রাসূল ﷺ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আইশা পাশেই ছিলেন। প্রচণ্ড মাথাব্যথায় কাতর হয়ে আইশা বলছিলেন, 'উহ! ব্যথায় মারা যাচ্ছি!' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন রসিকতা করে বললেন, 'যদি তা-ই হয়, আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারবো, তোমার জন্য দুআ করতে পারবো।' আইশা তখন স্বভাবসুলভ অভিমানী ভঙ্গিতে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি তো সেটাই চান। আমি মরে গেলে তো আপনি অন্য স্ত্রীদের কাছে যেতে পারবেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, 'আমারই বরং বলা উচিত -- ব্যথায় মারা যাচ্ছি!'

রাসূলুল্লাহর ﷺ ছিল প্রচণ্ড জ্বর। এক সাহাবি রাসূলুল্লাহর ﷺ মাথায় হাত রেখে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহﷺ! আপনার তো প্রচণ্ড জ্বর!' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা নবীরা অন্য যে কারো চেয়ে দ্বিগুণ কষ্ট ভোগ করে থাকি।' আল্লাহ আযযা ওয়া জাল তাঁদের বেশি ভালোবাসেন, তাই তাঁদের পরীক্ষাগুলো বেশি কঠিন, কষ্টগুলো বেশি তীব্র, আর পুরস্কারও অন্যদের চাইতে বেশি।

শেষ দিনগুলো আল্লাহর রাসূল ﷺ কাটিয়েছেন স্ত্রী আইশার (রা) ঘরে। অন্য স্ত্রীরা তাতে সায় দিয়েছিলেন, কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েন যে প্রত্যেকের ঘরে যাওয়া তাঁর জন্য খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে। দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে তাকে আইশার (রা) ঘরে আসতে হয়। শেষ দিনগুলোতে একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে যেতে চাইলেন। তিনি চাইলেন মানুষদের কিছু নাসীহা দেবেন। বললেন, 'আমার গায়ে সাত বালতি পানি ঢেলে দাও, আমি মানুষের কাছে গিয়ে কিছু কথা বলতে চাই।' রাসূলুল্লাহর ﷺ শরীরে ঠাণ্ডা পানি ঢালা হলো যেন শরীরের তাপমাত্রা কমে আসে আর তিনি মসজিদে যেতে পারেন। রাসূলুল্লাহকে মসজিদে নিয়ে যাওয়া হলো, তাঁর মাথা কালো কাপড়ে জড়ানো ছিল। রাসূলুল্লাহ একা হাঁটতে পারছিলেন না, তাঁর পা মাটিতে ঘষা খাচ্ছিল, তাই অন্যের ওপর ভর করে তাঁকে মসজিদে যেতে হলো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন একজন বান্দা আছে যাকে দুনিয়ার শান শওকত অথবা আল্লাহর কাছে যা আছে এই দুইয়ের যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।'

আল্লাহর রাসূল ﷺ আসলে নিজের কথাই বলছিলেন, কিন্তু কে এই বান্দা সেটা আবু বকর (রা)ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারলো না। আবু বকর (রা) কাঁদতে শুরু করলেন। সাধারণ মানুষের কাছে মৃত্যুর ফেরেশতা হঠাৎ করে আসে। কিন্তু নবীদের কাছে জান কবজের আগে তাঁদের অনুমতি গ্রহণ করা হয়। আবু বকর (রা)কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, 'আমরা আর আমাদের সন্তানরা আপনার জন্য কুরবান হয়ে যাক!'

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকরকে (রা) থামিয়ে দিয়ে বললেন,

'বন্ধুত্ব আর অর্থ-সম্পদের ত্যাগ স্বীকারে যে মানুষটি আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি ইহসান করেছে, সে হচ্ছে আবু বকর। আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে খলিল হিসেবে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবু বকরকেই নিজের খলিল বানাতাম। কিন্তু আমার সাথে আবু বকরের সম্পর্ক হলো ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার। তোমরা মসজিদের খোলা দরজাগুলোর দিকে তাকাও। ওগুলো তোমরা বন্ধ করে দেবে, শুধু আবু বকরের দরজা ছাড়া।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনের শেষপ্রান্তে এসে সবার সামনে আবু বকরের (রা) উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানিত অবস্থান সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছেন। খলিল হলো বন্ধুত্বেরও ওপরে একটি স্থান, যা অন্তরকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দেয়। যদি দুনিয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কাউকে খলিল হিসেবে বেছে নিতেন, তাহলে সে স্থানটি আবু বকরের (রা) হতো। কিন্তু যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর খলিল, তাই আবু বকর হলেন তাঁর দ্বীনের ভাই,বন্ধু,সবচেয়ে আপনজন।

মৃত্যুর চার দিন আগ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল ﷺ সালাতের ইমামতি করেছিলেন। কিন্তু ইশার ওয়াক্তে তাঁর শরীর এত খারাপ হয়ে গেল যে তিনি কোনোভাবেই উঠে দাঁড়াতে পারছিলেন না। বারবার বেঁহুশ হয়ে পড়ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বললেন, আবু বকর (রা)যেন ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু আইশা (রা) চাচ্ছিলেন না তার বাবা আবু বকর (রা) সালাতে নেতৃত্ব দিক। তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ, আমার বাবা তো খুব নরম মনের মানুষ। আমি ভয় পাচ্ছি উনি যদি আপনার স্থানে দাঁড়ান তাহলে হয়তো উনার পক্ষে ইমামতি করাই অসম্ভব হয়ে যাবে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার বললেন, 'আবু বকরকে (রা)বলো সালাতে ইমামতি করতে।' আইশা (রা)আবারও একই কথা বললেন। এভাবে তিনবার। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমরা নারীরা হলে ইউসুফের নারীদের মতো। আবু বকরকে বলো সালাতে ইমামতি করতে।'

## ▢ উম্মাহর জীবনে বিষাদতম দিন:

দিনটা ছিল সোমবার। আল্লাহর রাসূল ﷺ সেদিন আমাদের ছেড়ে চলে যান। কেমন ছিল সেই দিন? ফজরের ওয়াক্তে আবু বকর মুসলিমদের সালাত পড়াচ্ছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরের পর্দা সরিয়ে মসজিদের ভেতর তাকালেন। তিনি চোখ ভরে তাঁর উম্মাহকে দেখছিলেন। তাঁর উম্মাহ সারিবদ্ধভাবে সালাহ আদায় করছে। তাওহীদের যে বীজ তিনি রোপণ করেছিলেন, সেই চারাগাছ আজ সুবিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। তাঁর দাওয়াহ সফল, তাঁর মিশন সম্পূর্ণ। মুসলিমরা আজ নিজেরাই জামাতবদ্ধ হয়ে সালাত আদায় করছে। রাসূলুল্লাহর ﷺ মন এক অপার আনন্দে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল।

তিনি মুচকি হাসলেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ হাসিমুখ দেখে সাহাবিরাও খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। আনন্দের আতিশয্যে তাদের সালাত ভেঙে যাবার উপক্রম! আনাস ইবন মালিকের বর্ণনায়,

'আল্লাহর রাসূলের মুখ সেদিন যেন কুরআনের পাতার মতো ঝলমল করছিল।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাহর সর্বশেষ যে দৃশ্যটি দেখেছেন সেটি হলো সালাতের জামাত। এই দৃশ্য দেখেই রাসূলুল্লাহর ﷺ মন আনন্দে ভরে উঠেছিল। নিশ্চয়ই তাওহীদের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সালাহ।

রাসূলুল্লাহকে ﷺ দাঁড়াতে দেখে সাহাবিরা ভাবলেন রাসূলুল্লাহর ﷺ শারীরিক অবস্থার হয়তো উন্নতি হয়েছে। তাই আবু বকর অনুমতি নিয়ে তার দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে দেখা করতে আস-সুনহে চলে গেলেন, সেটা ছিল মদীনার কিছু দূরে।

সোমবারের ফজর সালাহ ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ শেষ সালাহ। আইশার ভাই আবদুর রহমান তাদের ঘরে এলেন, তার হাতে একটা মিসওয়াক ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই মিসওয়াকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুখে কিছু বলাও তখন কষ্টকর। আইশা (রা)তাঁর চাহনি দেখেই বুঝতে পারলেন রাসূলুল্লাহ মিসওয়াকটি ব্যবহার করতে চাইছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি এটা চান?' রাসূলুল্লাহ ﷺ ইঙ্গিতে বললেন, হ্যাঁ চাই।

আইশা তখন মিসওয়াকটি তার ভাইয়ের কাছ থেকে নিয়ে এর অন্য পাশ নরম করে রাসূলুল্লাহকে ﷺ এগিয়ে দিলেন। আইশা (রা)বলেন, তিনি এমনভাবে মিসওয়াক করছিলেন যে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি একদম সুস্থ। জীবনের একদম শেষ প্রান্তে এসেও রাসূলুল্লাহ ﷺ মিসওয়াক ব্যবহারের সুন্নাহ ত্যাগ করেননি।

রাসূলুল্লাহর ﷺ কষ্ট, যন্ত্রণা বাড়তে থাকে। তাঁর কষ্ট দেখে ফাতিমা (রা) বলে উঠলেন, 'বাবার কতই না কষ্ট হচ্ছে।' সেই কষ্টের মুহূর্তেও তিনি মেয়ের কথার উত্তর দিলেন, বললেন, 'আজকের দিনের পর তোমার বাবার আর কোনো কষ্ট নেই মা!'

মৃত্যুর মুহূর্তে আল্লাহর রাসূল ﷺ শুয়ে ছিলেন আইশার (রা)পাত্রে হাত ভিজিয়ে বারবার নিজের মুখ মুছে বলছিলেন, মাবুদ নেই। নিশ্চয়ই মৃত্যু বড়ই কঠিন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ সেরা সৃষ্টি, তাঁকেও মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল। কোলে মাথা রেখে। পানির 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ছিলেন সমগ্র মানবজাতির শেষ সময় ঘনিয়ে এল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে সূরা নিসার একটি আয়াত পড়ে আল্লাহর কাছে দুআ করছিলেন, বলছিলেন,

'হে আল্লাহ! আমাকে অন্তর্ভুক্ত করো নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎ ব্যক্তিদের সাথে, যাদের আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন!

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও! আমার ওপর রহম করো! আমাকে সর্বোচ্চ সাথীর কাছে মিলিত করো।'

মৃত্যুর একেবারে শেষ মুহূর্তে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর তর্জনী উপরে তুলে বলছিলেন,

ফীর-রফিকুল আ'লা!

ফীর-রফিকুল আ'লা!

ফীর-রফিকুল আ'লা!

রাসূলুল্লাহর ﷺ চোখের পাতা ভারী হয়ে এল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করলেন, দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন তাঁর সর্বোচ্চ সঙ্গী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে। জীবনের

শেষ মুহূর্তেও উচ্চারণ করছিলেন তাঁর জীবনভর চেয়ে যাওয়া ইচ্ছার কথা -- ওয়ালহিকনী বির- রফিকিল আ'লা আমাকে সর্বোচ্চ সঙ্গীর (আল্লাহ) সাথে সাক্ষাত করিয়ে দিন।

মুসলিম উম্মাহর জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্যোগ ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ মৃত্যু। মুসলিম উম্মাহ হারালো তাদের সবচেয়ে আপনজনকে। মাথার ওপর ছায়া হয়ে থাকা নেতাকে, বাবার মতো বুকের মাঝে আগলে রাখা মানুষটাকে। ভয়ে-কষ্টে-বিপদে-দ্বন্দ্বে সবাই যার কাছে ছুটে যেতো, যার কাছে সবাই নির্বিঘ্নে সব সমস্যার কথা বলতে পারত, যিনি ছিলেন সবার আশ্রয়, সেই মানুষটা আজ চলে গেলেন। উম্মাহর জীবনে সবচেয়ে বড় ফিতনা সেই দিন। সবচেয়ে অন্ধকার আর বিষাদমাখা একটা দিন।

### ☐ কাফন-দাফন:

এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাফন-দাফনের পূর্বেই নাবী কারীম (স)-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ব্যাপারে মুসলিমগণের মধ্যে মত বিরোধের সৃষ্টি হল। সাকীফা বনু সায়িদার মধ্যে, মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে আলোচনা ও বাদানুবাদ চলতে থাকল এবং দলীল প্রমাণাদি পেশ ও প্রশ্নোত্তর চলছিল, অবশেষে আবু বকর (রা) এর প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হল। এর ফলে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয় এবং রাত্রি আগমন করে। লোকজনেরা নাবী ﷺ এর কাফন-দাফনের পরিবর্তে আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় সোমবার দিবাগত রাত্রি অতিবাহিত হয়ে সমাগত হয় মঙ্গলবার সকাল। এ সময় পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দেহ মোবারক একটি জরীদার ইয়ামানী চাদর দ্বারা আবৃত অবস্থায় বিছানায় শায়িত ছিল। ঘরের মানুষেরা ভিতর থেকে দরজা বন্ধ রেখেছিল।

মঙ্গলবার দিবস রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কাপড়সহ গোসল দেয়া হল। গোসল দেওয়ার কাজে অংশ গ্রহণ করলেন 'আব্বাস, 'আলী, 'আব্বাসের পুত্র ফযল এবং কুসাম(রা), রাসূলে কারীম ﷺ এর আযাদকৃত দাস শুকুরান, উসামা বিন যায়দ এবং আওস বিন

খাওলী(রা)। 'আব্বাস, ফযল ও কুসাম) নাবী কারীম ﷺ এর পাশ পরিবর্তন করে দিচ্ছেলেন। উসামা এবং শুকুরান পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন, 'আলী (রা)ধৌত করছিলেন এবং আওস রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দেহ মোবারককে আপন বক্ষের উপর ভর করে নিয়ে রেখেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তিনবার কুল পাতার মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল দেয়া হয়। কুবায় অবস্থিত সা'দ বিন খায়সামাহ 'গার্স' নামক কূপের পানি দিয়ে তাঁকে গোসল দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই কূপের পানি পান করতেন। কাফনের গোসলের পর তিনটি কুরসুফ হতে তৈরি সাদা ইয়ামানী সাহুলিয়্যাহ চাদর দ্বারা রাসূলুল্লাহ)-এর ব্যবস্থা করা হল। এ সবের মধ্যে জামা কিংবা পাগড়ি ছিল না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অন্তিম আরামগাহ (শান্তি শয্যা) সম্পর্কে সাহাবীগণ (রা)এর মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আবূ বকর (রা) বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, 'কোন নাবীকে (পৃথিবী) থেকে উঠানো হয় নি (মৃত্যুবরণ করেন নি) তাঁকে সেই স্থানে দাফন করা ব্যতীত যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।' এ মীমাংসার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বিছানায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন আবু তালহাহ (রা) তা উঠিয়ে নিলেন। অতঃপর তার নীচে বগলী কবর খনন করা হল। এরপর সাহাবীগণ পালাক্রমে দশ দশ জন করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে জানাযা আদায় করলেন। নির্ধারিত কোন ইমামের ব্যবস্থা ছিল না। সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিবার বনু হাশিমের লোকজনেরা সালাত আদায় করেন। এরপর ক্রমান্বয়ে মুহাজির ও আনসারগণ জানাযা সালাত আদায় করেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে অন্যান্য পুরুষ, মহিলা ও শিশুগণ সালাত আদায় করেন। সালাতে জানাযা আদায় করতে মঙ্গলবার দিবস পুরোটাই অতিবাহিত হয়ে যায়। মঙ্গলবার দিবস অতিবাহিত হওয়ার পর বুধবারের রাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দেহ মোবারককে সমাহিত করা হয়। 'আয়িশাহ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, পুরো দিবসটাই সালাতে জানাযা চলার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দাফন সম্পর্কে আমাদের জানা ছিল না। এভাবে সময় অতিবাহিত হতে থাকার পর বুধবার রাত্রের মধ্যভাগে দাফন-কাফনের শব্দ কর্ণগোচর হয়।

## □ ৩১.রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পরিবার:

### ১. খাদীজাহ বিনতে খুওয়াইলিদ (রা):

হিজরতের পূর্বে মক্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পরিবারের সদস্য ছিলেন তাঁর প্রথমা পত্নী খাদীজাহ ভারা।বিবাহের সময় রাসূলের ﷺ এর বয়স ছিল পঁচিশ বছর এবং খাদীজাহ উল্লা-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। তাঁর জীবদ্দশায় রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্য কাউকেও বিবাহ করেন নি। নাবী কারীম ﷺ সন্তানাদির মধ্যে ইবরাহীম ছাড়া পুত্র কন্যাদের সকলেই খাদীজাহঊনা-এর গর্ভে জন্মলাভ করেন। পুত্র সন্তানগণের মধ্যে কেউই জীবিত ছিলেন না, কিন্তু কন্যা সন্তানগণ সকলেই জীবিত ছিলেন। তাঁদের নাম হচ্ছে যথাক্রমে, যায়নাব, রুকাইয়াহ, উম্ম কুলসূম এবং ফাতিমাহা। যায়নাব উল্লা-এর বিবাহ সম্পন্ন হয় তাঁর ফুফাত ভাই আবুল 'আস বিন রাবী'র সঙ্গে হিজরতের পূর্বে। রুকাইয়াহ এবং উম্ম কুলসূম ভাড়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন (একজনের পর অন্য জন) 'উসমান (রা)-এর সঙ্গে। ফাত্বিমাহ উল্লা-এর বিবাহ সম্পাদিত হয় 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (রা)এর সঙ্গে বদর এবং উহুদ যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে। ফাত্বিমাহ (রা)এর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন হাসান ও হুসাইন যায়নাব (রা)এবং উম্ম কুলসূম (রা) এটি একটি বিদিত বিষয় যে, উম্মতবর্গের তুলনায় তাঁর একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল এ রকম যে, আল্লাহর দ্বীনের খুঁটিনাটি প্রচারার্থে চারটিরও অধিক পত্নীগ্রহণের জন্য তিনি আদিষ্ট হয়েছিলেন। এ প্রেক্ষিতে যে সকল মহিলার সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁদের সংখ্যা ছিল এগার জন। এঁদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যু পর্যন্ত জীবিত ছিলেন নয় (৯) জন। তিনি`ﷺ এর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন দু'জন। এ দু'জন ছিলেন খাদীজাহ এবং উম্মুল মাসাকীন যায়নাব বিনতে খুযায়মাহা। অধিকন্তু, আরও দু'জন মহিলার সঙ্গে নাব বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন কিনা সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটি ব্যাপারে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এ দু'জনকে নাবী কারীম-এর নিকট বিদায় করা হয় নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পবিত্র বিবিগণ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুন্না)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্পর্কে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হল।

**২. সাওদাহ বিনতে যাম'আহ্ (রা):**

খাদীজাহ(রা)এর মৃত্যুর কয়েক দিন পর নুবওয়াতের দশম বর্ষ শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবি সাওদাহ (রা)এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে বিবাহের পূর্বে সাওদাহ তাঁর চাচাত ভাই সাকরান বিন 'আমরের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর কারণে তাঁকে বৈধব্য বরণ করতে হয়েছিল। সাওদাহ ৪৫ হিজরীতে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন।

**□ ৩.আয়িশাহ সিদ্দীকা বিনতে আবূ বকর (রা):**

'আয়িশাহ (রা)এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন একাদশ নবুওয়াত বর্ষের শাওয়াল মাসে। অর্থাৎ সাওদাহ (রা)এর সঙ্গে বিবাহের এক বছর পর এবং হিজরতের দু' বছর পাঁচ মাস পূর্বে। ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর। অতঃপর হিজরতের সাত মাস পর প্রথম হিজরীর শাওয়াল মাসে তাঁকে বিদায় জানানো হয়। সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিল নয় বছর। তিনি কুমারী। 'আয়িশাহ (রা) ছাড়া আর অন্য কোন স্ত্রীকেই তিনি কুমারী অবস্থায় বিবাহ করেন নি। 'আয়িশাহ (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সব চেয়ে প্রিয়পাত্রী অধিকন্তু, নাবী পত্নীগণের মধ্যে তিনিই ছিলেন সব চেয়ে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমতী। তিনি ৫৭ বা ৫৮ হিজরীর ১৮ রামাযান মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁকে জান্নাতুল বাক্বী'তে দাফন করা হয়।

**৪. হাফসাহ বিনতে উমার বিন খাত্তাব (রা)**:তিনি ছিলেন বিধবা, তাঁর পূর্ব স্বামীর নাম ছিল খুনাইস বিন হুযাফাহ),বদর এবং উহুদ যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। খুনাইসের মৃত্যুর পর হাফসাহ কেল্লা ইদ্দত শেষ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সঙ্গে তৃতীয় হিজরীর শা'বান মাসে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হাফসাহ ৪৫ হিজরীর শা'বান মাসে মদীনায় ইনতিকাল করেন এবং তাঁকে বাক্বী' কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

**৫. যায়নাব বিনতে খুযায়মা েহ (রা):**

এ মহিলার সম্পর্কে ছিল বনু হিলাল বিন 'আমির বিন সা'সাহ গোত্রের সঙ্গে। মিসকীনদের প্রতি দয়া- দাক্ষিণ্য, দানশীলতা ও সহানুভূতিশীল হওয়ার কারণে তার

পদবী হয়েছিল উম্মুল মাসাকীন। তাঁর প্রথম স্বামী ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন জাহশ। উহুদ যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। অতঃপর চতুর্থ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে মাত্র প্রায় তিন মাস সংসার জীবন যাত্রার পর চতুর্থ হিজরীর রবী'উল আখির মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সালাতে জানাযা পড়ান এবং তাঁকে বাক্বী' কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

**৬. উম্মু সালামাহ হিন্দ বিনতে আবী উমাইয়া(রা):** এ মহিলা আবূ সালামাহ-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা ছিলেন। আর সেখানে তার সন্তান-সন্ততি ছিল। চতুর্থ হিজরীর জুমাদাল আখেরাহ মাসে আবু সালামাহ মৃত্যুবরণ করলে সে বছরেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সঙ্গে ২৯ শাওয়াল বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।বিবিগনের মধ্যে তিনি ছিলেন সব চেয়ে বেশি পান্ডিত্যের অধিকারী এবং বুদ্ধিমতী।

**৭. যায়নাব বিনতে জাহশ বিন রিবাব (রা):**

এ মহিলা বনু আসাদ বিন খুযাইমা (রা)এর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। তাছাড়া, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ফুফাতো বোন। পূর্বে তিনি যায়দ বিন হারিসার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, যাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পুত্র মনে করা হত। কিন্তু যায়দের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব সৃষ্টি না হওয়ার কারণে তিনি তাঁকে তালাক দিয়েছিলেন। ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সম্বোধন করে এ আয়াত নাযিল

: [فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا) [الأحزاب: ٣٧

'অতঃপর যায়দ যখন তার (যায়নাবের) সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দিলাম।' [আহযাব (৩৩): ৩৭]

তাঁর সম্পর্কেই সূরাহ আহযাবের কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। যাতে মুতাবান্না বা পোষ্যপুত্রের বিতণ্ডার মীমাংসা করা হয়। এর বিস্তারিত আলোচনা হবে পরে। পঞ্চম হিজরীর যুল ক্বা'দাহ মাসে কিংবা চতুর্থ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে যায়নাব -এর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। তিনি অত্যান্ত ইবাদত গুজারিনী ছিলেন এবং সবচেয়ে

বেশি দান-খয়রাত করতেন। ২০ হিজরীতে ৫৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের মধ্যে তিনিই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম ইনতিকাল করেন। 'উমার (তাঁর জানাযা পড়ান এবং বাক্বী' কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

৮. **জুওয়াইরিয়াহ বিনতে হারিস (রা):** তাঁর পিতা ছিলেন খুযা'আহ গোত্রের শাখা বনু মুসত্বালাক্বের সর্দার। জুওয়াইরিয়াকে বনু মুসত্বালাকু গোত্রের বন্দীদের সঙ্গে ধরে আনা হয়েছিল এবং সাবিত বিন কায়স বিন সাম্মাসের অংশে দেয়া হয়েছিল।তিনি জুওয়াইবিয়ার সঙ্গে 'মুকাতাবার' করে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে স্বাধীন করে দেয়ার চুক্তি হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে চুক্তি মুতাবিক অর্থ প্রদান করে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল এম অথবা ৬৪ হিজরীর শাবান মাসে। এ বিবাহ উপলক্ষে মুসলমানগণ বলু মুসত্বালাত্ত্বের ১০০ বন্দী পরিবারকে মুক্তি দেন এবং তাদেরকে রাসুমুল্লাহ ﷺ সংশয় বলা হয় তিনি ছিলেন তাঁর গোত্রের বরকতপূর্ণ মহিলা। ৫৫ বা ৫৬ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে ৬৫ নম্বর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

**১০. উম্মু হাবীবাহ রামলাহ বিনতে আবু সুফইয়ান(রা)**:প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন উবাইদুল্লাহ বিন জাহশের স্ত্রী। সেখানে তিনি হাবীবাহ নামক এক কন্যা সন্তান জন্ম দেন এবং জাহশের সঙ্গে মিল রেখেই তার কুনিয়াত বা ডাকনাম রাখা হয়। তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে হাবশে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে উবাইদুল্লাহ মুরতাদ হয়ে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করার পর মৃত্যুবরণ করে, কিন্তু উম্মু হাবিবা ইসলামের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। অতঃপর ৭ম হিজরী মুষাররম মাসে রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন আমর বিন উমাইয়া যামরীকে একটি পত্রসহ সম্রাট নাজাশীয় নিকট প্রেরণ করেন, তখন উম্মু হাতীবার সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বিবাহের প্রস্তাবও পেশ করা হয়। উম্মু হাবীবার স্বীকৃতি গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ চারশর দিনার মোহরানা প্রদান করে তাঁর সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন করা হয় এবং শুয়াহবিল বিন হাসানারর সঙ্গে তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খিদমতে প্রেরণ করা হয়। খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তনের পর অসুমুয়াহ যাপন করেন। ৪২ অথবা ৪৪ মতান্তরে ৫০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। বাসর

**১১. সাফিয়্যাহ বিনতে হুওয়াই বিন আখতার (রা)**:তিনি ছিলেন বনি ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত। বধু নাষীর গোত্রের সদার হওয়াই বিন আখতার এর কন্যা।খায়বার যুদ্ধে তাঁকে বন্দী করা হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নিজের জন্য মনোনীত করেন ও তার কাছে ইসলামের বাণী পেশ তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁকে আসে করে দিয়ে খায়বার। বিজয়ের পর ৭ম হিজরীতে তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবন্ধ হন। খায়বার হতে ফেরার পথে মদীনা হতে ১২ মাইল দূরে সামে সাহবাতে উন্মুল মু'মিনীনের সঙ্গে বাসর যাপন করেন। ৩৬ বা ৫০ মতান্তরে ৫২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে বাক্কী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

**১২. মায়মুনাহ বিনতে হারিস(রা):**

তিনি ছিলেন উন্মুল জবল লুবাবাহ বিনতে হারিসের বোন।রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ৭ম হিজরীতে মূল বাসাহ মাসে কৃাষা 'উমরাহ শেষ করার পর বিশুদ্ধ কথায় ইরান হতে হালাল হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মক্কা হতে ৯ মাইল দূরত্বে সরিফ নামক স্থানে বাসর যাপন করেন। ৬১ হিজরীতে সারিতে ইনতিকাল করেন। আবার বলা হয় যে, তিনি ৩৮ বা ৬৩ হিজরীতে ইনতিকাল করেন এবং তাঁকে যেখানেই সমাহিত বহ হয়। তার সমাহিত স্থান প্রসিদ্ধ লাভ করে।

উপযুক্ত এগার জন মহিলা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাঁর সাহচর্য ও বন্ধুত্ব পাত করেছিলেন। এঁদের মধ্যে খাদীজাহ এবং উজ্জ্বল মাসাকীন যায়নাব প্লামা মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর ওফাত প্রাপ্তির পর ৯ জন উম্মাহাতুল মুমিনীন জীবিত ছিলেন। এয়াড়া আরও দু' মহিলা সম্পর্কে জানা যায় যাঁদেরকে বারই কাইন এর খিদমতে বিদায় করা হয় নি। এ দু' জনের মধ্যে একরুন ছিলেন বস্তু কিলাব গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং অন্য জন ছিলেন বিদাহ গোত্রের যাতে সম্পর্কিত কিন্দাহ গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ও মহিলাই চুনারাহ নামে প্রসিদ্ধ। এ মহিলার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদ্ধ হয়েছিলেন কিনা এবং তার পরিচয়ের ব্যাপারে বিতর্ককারীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে।

## ▢ ৩২.পরিবার, আত্মীয় ও প্রতিবেশীর সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আচরণবিধি:

### স্ত্রীগণের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আচরণবিধি:

**স্ত্রীর মাজা মিসওয়াক দিয়ে দাঁত মাজতেন-**

আয়িশা (রা)বলেন, 'আমার ওপর আল্লাহর অন্যতম মেহেরবানি হচ্ছে, রাসুল ﷺ আমার ঘরেই মৃত্যুবরণ করেন। সেদিনটি আমার পালায় ছিল। মৃত্যুর সময় তাঁর ও আমার মুখের লালা একত্রিত হয়েছিল। (সেদিন) আব্দুর রহমান আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তার হাতে ছিল একটি মিসওয়াক। রাসুল ﷺ আমার গায়ে হেলান দিয়ে ছিলেন। আমি দেখলাম, তিনি আব্দুর রহমানের হাতের মিসওয়াকের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি জানতাম, তিনি মিসওয়াক করতে পছন্দ করেন। রাসুল ﷺ এর কাছে জানতে চাইলাম, আমি কি মিসওয়াকটা নেব? মাথা নেড়ে তিনি সায় দিলেন। মিসওয়াক নিয়ে বললাম, "নরম করে দিই?" রাসুল ﷺ আবারও মাথা নেড়ে সায় জানালেন। আমি দাঁত দিয়ে মিসওয়াকের আগা কেটে নিলাম, এরপর চিবিয়ে নরম করে রাসুল-কে দিলাম। তিনি আমার বুকের ওপর ভর দেওয়া অবস্থায় মিসওয়াক করলেন।'[সহিহুল বুখারি:৪৪৩৮]

**অসুস্থ ও বিষণ্ণ স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতেন-**

'হজের সময় আয়িশা (রা)এর হায়িজ শুরু হলো। এ কারণে তিনি কাঁদছিলেন। নবিজি ﷺ এসে দেখলেন, আয়িশা কেঁদে চলেছেন। জিজ্ঞেস করলেন:

কী হয়েছে? তোমার কি হায়িজ শুরু হয়েছে?

জি।

এতে কাঁদার তো কোনো কারণ নেই। আল্লাহ এটি প্রত্যেক আদম-কন্যার জন্য নির্ধারণ করেছেন। তুমি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত হজের বাকি আমলগুলো করতে থাকো।

আয়িশা (রা)বলেন, "হজ আদায়ের পর তিনি আব্দুর রহমানকে আদেশ দিলেন আমাকে তানয়িম থেকে উমরা করিয়ে আনতে যেখান থেকে আমি উমরার ইহরাম বেঁধেছিলাম।[সহিহুল বুখারি:৩১৬]

স্বামীদের উচিত স্ত্রীদের প্রতি খেয়াল রাখা। তাদের অবস্থাদি বোঝার চেষ্টা করা। নারীরা কখনো চিন্তিত থাকে। কখনো হায়িজ, নিফাস, জন্মদানের কারণে অসুস্থতা বোধ করে। এ সময়টাতে স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীর পাশে থাকা। তার কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করা।

স্বামী যখন স্ত্রীর কষ্টগুলো উপলব্ধি করে এবং তা দূর করতে সচেষ্ট হয়, স্ত্রী কখনো এই অনুপম আচরণ ভুলতে পারে না। সে সারা জীবনের জন্য নিজেকে স্বামীর কাছে ঋণী মনে করে।

**স্ত্রীকে বাহনে চড়তে সাহায্য করতেন-**

রাসুল ﷺ এর খাদিম আনাস বলেন (রা), 'আমি দেখলাম, সাফিয়্যা (রা) এক উটে আরোহণের সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে কাপড়ে ঢেকে দিচ্ছেন। এরপর উটের কাছে বসে হাঁটু উঁচু করে রাখছেন। সাফিয়্যা (রা) রাসুল ﷺ এর হাঁটুর ওপরপা রেখে বাহনে চড়ছেন।[সহিহুল বুখারি]

রাসুল ﷺ তাঁর হাঁটু দাঁড় করে রাখছেন আর সাফিয়্যা রাসুল ﷺ এর হাঁটুর ওপর পা রেখে বাহনে চড়ছেন। এটা রাসুল ﷺ এর বিনম্রতা, স্ত্রীর প্রতি প্রেম- ভালোবাসার এক আশ্চর্য বহিঃপ্রকাশ।

**রাসুল ﷺ স্ত্রীদের জন্য নিজেকে পরিচ্ছন্ন ও সুরভিত রাখতেন-**

রাসুল ﷺ যখনই ঘরে আসতেন, মিসওয়াক করতেন প্রথমে। যাতে কোনো মতেই স্ত্রী তাঁর মুখ থেকে গন্ধ না পান। শুরাইহ (রা)বলেন, 'আমি আয়িশা (রা)এর কাছে জানতে চাইলাম, "রাসুল ﷺ ঘরে ঢুকে প্রথমে কী করতেন?"

উত্তরে আয়িশা বলেন, "প্রথমে এসে তিনি মিসওয়াক করতেন।" [সহিহুল মুসলিম:২৫৩]

'ঘরে এসে প্রথমেই মিসওয়াক করার রহস্য হচ্ছে, অনেক সময় মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে মুখের ঘ্রাণ পাল্টে যায়। তাই বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই মুখের গন্ধ দূর করাই উত্তম আচরণের অংশ।

যখনই ঘুম থেকে জাগতেন, মুখ ও দাঁত পরিষ্কার করে নিতেন তিনি। আয়িশা (রা) বলেন, 'রাতে দিনে যখনই রাসুল ﷺ ঘুম থেকে জাগতেন, তখনই অজুর আগে মিসওয়াক করে নিতেন। '

'এ থেকে বোঝা যায়, মুখে যখন দুর্গন্ধ আসে, খাবারের পরে বা অন্য সময়ে মুখের ঘ্রাণ পাল্টে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হলে তখন মিসওয়াক করে নেওয়া মুসতাহাব।'

ইবনুল কাইয়িম বলেন, 'রাসুল ﷺ মিসওয়াক পছন্দ করতেন। রোজাহীন অবস্থায় যেমন রোজা অবস্থায়ও তিনি মিসওয়াক করতেন। ঘুম থেকে উঠলে মিসওয়াক করতেন। মিসওয়াক করতেন অজুর সময়, নামাজের সময়, বাড়িতে প্রবেশের সময়। ব্যবহার করতেন আরাক গাছের মিসওয়াক।

**বড় গুনাহের মতো ছোট ছোট গুনাহ থেকেও বেঁচে থাকার তাকিদ দিতেন-** আয়িশা (রা)বলেন, 'রাসুল ﷺ আমাকে উপদেশ দেন, "আয়িশা (রা), তুচ্ছ গুনাহ থেকেও বিরত থাকো। কারণ, সেগুলোর জন্যও আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন নিযুক্ত আছে।"

**'তুচ্ছ গুনাহ'** তথা যে গুনাহ মানুষ করতে পরোয়া করে না। একজন নিযুক্ত আছে- তথা একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা আছে, যে এসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গুনাহ লিখে রাখে। মানুষের কাছে গুনাহগুলো ক্ষুদ্র মনে হলেও আল্লাহর কাছে এ গুনাহগুলো গুরুতর।

**মাসআলা দুর্বোধ্য মনে হলে স্ত্রীগণ বারবার জিজ্ঞেস করে স্পষ্ট হয়ে নিতেন-**

ইবনে আবি মুলাইকা বলেন, 'আয়িশা (রা)রাসুল ﷺ এর কোনো কথা না বুঝলে বারবার জিজ্ঞেস করে বুঝে নিতেন। একবার নবিজি ﷺ বললেন, "যে হিসাবের সম্মুখীন হলো, তাকে শাস্তি পেতে হবেই হবে।" আয়িশা বলেন (রা), "তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ কি বলেননি? فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا - "হিসাব সহজভাবেই নেওয়া হবে। (সুরা আল-ইনশিকাক, ৮৭: ৮)" উত্তরে রাসুল ﷺ বললেন, "এটা তো কেবল প্রকাশ করা। কিন্তু পুঙ্খনাপুঙ্খরূপে যার হিসেব নেওয়া হবে, সে ধ্বংস হবে।"[সহিহুল বুখারী:১০৩]

## ◻ সন্তানদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আচরণ:

রাসুল ﷺ ছিলেন নিজ পরিবারের প্রতি সর্বোচ্চ সুন্দর আচরণকারী। শ্রেষ্ঠ প্রতিপালন, সর্বোত্তম শিক্ষা পদ্ধতি ও অটুট সম্পর্ক ইত্যাদি মহৎ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল সন্তানদের প্রতি রাসুল-এর আচরণ।

রাসুল ﷺ এর সন্তানসন্ততি:

রাসুল ﷺ পুত্র-সন্তান-

রাসুল ﷺ ছেলে-সন্তান ছিল তিনজন কাসিম, আব্দুল্লাহ ও ইবরাহিম। এ ছাড়া তাইয়িব ও তাহির দুটি নামও পাওয়া যায় তাঁর ছেলেদের। তবে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, তাইয়িব ও তাহির দুটি নামই আব্দুল্লাহর উপাধি।

রাসুল ﷺ সকল ছেলেই কম বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

**কাসিম** : মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন দুবছর কয়েক মাস বয়সে। কাসিমের নামানুযায়ী রাসুল-এর কুনিয়াত হয় আবুল কাসিম। কাসিম ছিলেন খাদিজা ৯৩-এর গর্ভজাত সন্তান।

**আব্দুল্লাহ:** রাসুল ﷺ এর নবুওয়াত লাভের পর জন্ম হয়েছিল তার। মক্কায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনিও খাজিদা -এর গর্ভের সন্তান।

**ইবরাহিম:** তার মায়ের নাম মারিয়া কিবতিয়া। মদিনায় ৮ম হিজরির জিলহজ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। আর ১৭ কি ১৮ মাস বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

**রাসুল-এর কন্যা-সন্তান**-

আল্লাহ তাআলা চারজন কন্যা-সন্তান দান করেছেন তাঁকে। তাঁরা হচ্ছেন জাইনাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা। সবাই একই মায়ের সন্তান। সবার জন্ম খাদিজা-এর গর্ভে।

**জাইনাব:** রাসুল ﷺ এর প্রথম মেয়ে। তাঁর বিয়ে হয় আবুল আস বিন রাবি'র সাথে।

**রুকাইয়া:** রাসুল ﷺ এর দ্বিতীয় কন্যা-সন্তান। ইসলাম-পূর্ব যুগে উতবা বিন আবু লাহাবের সাথে বিয়ে হয় তাঁর। কিন্তু উতবার সাথে বাসর হওয়ার আগেই উতবা তালাক দিয়ে দেয় রুকাইয়া (রা)কে। এরপর তাঁকে বিয়ে করেন উসমান বিন আফফান। উসমান (রা)এর সাথে তিনি হিজরত করেন হাবশায়। পরবর্তীকালে হিজরত করেন মদিনায়।

রাসুল ﷺ যখন বদর অভিযানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, রুকাইয়া অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই রাসুল উসমান বিন আফফান-কে মদিনায় রেখে যান তাঁর দেখাশোনার জন্য। রমাজানেই তিনি ইনতিকাল করেন। তখন রাসুল ﷺ বদর অভিযানে ব্যস্ত।

**উম্মে কুলসুম:** রাসুল ﷺ এর তৃতীয় কন্যা। রুকাইয়া (রা)এর মৃত্যুর পর উসমান উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেন। তিনিও মৃত্যুবরণ করেন উসমান ৬-এর বিবাহ বন্ধনে থাকাবস্থায়।

**ফাতিমা:** রাসুল-এর চতুর্থ ও কনিষ্ঠ কন্যা। রাসুল ﷺ এর মেয়েদের মধ্যে তিনিই ছিলেন রাসুল ﷺ এর সর্বাধিক প্রিয়। রাসুল ﷺ এর যখন ৪১ বছর বয়স, তখন জন্মগ্রহণ করেন ফাতিমা। রাসুল ﷺ এর মৃত্যুর ৬ মাস পর মৃত্যুবরণ করেন ফাতিমা(রা)। তাঁর বিয়ে হয়েছিল আলি বিন আবু তালিব (রা)এর সাথে।

**ছেলে-মেয়েদের প্রতি রাসুল ﷺ এর আচরণনীতি-**

রাসুল ﷺ এর কন্যা ছিল চারজন। সন্তানদের মধ্যে কন্যারাই কেবল জীবিত ছিলেন। পুত্র-সন্তানগণ শৈশবেই মৃত্যুবরণ করেন। রাসুল ﷺ তাঁর কন্যাদের ভালোবাসতেন এবং সম্মান করতেন। তাদের নিয়ে তিনি অনেক বেশি খুশি ছিলেন।

এখানে কন্যার জনকদের শেখার আছে অনেক কিছু। কন্যা-সন্তান যত বেশিই হোক, পিতার উচিত তাদের নিয়ে খুশি প্রকাশ করা, এই অমূল্য নিয়ামতের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা এবং তাদের যথাযথ তালিম-তরবিয়তের দিকে মনোযোগী হওয়া।

রাসুল বলেন ﷺ, 'কাউকে যদি কন্যা-সন্তান দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, আর সে যদি তাদের সঙ্গে সদাচরণ করে—তবে তারা জাহান্নাম ও তার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।'[সহিহুল বুখারি:৫৯৯৫]

**বিয়ের ব্যাপারে কন্যাদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন-**

আতা বিন রবাহ (রা) বলেন, 'আলি যখন ফাতিমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন, রাসুল ﷺ ফাতিমার কাছে এলেন। বললেন, "আলি তোমার কথা বলেছে।" ফাতিমা চুপ হয়ে থাকলেন। এরপর রাসুল ﷺ বেরিয়ে এলেন ফাতিমার কাছ থেকে। তাকে বিয়ে দিলেন আলি (রা)এর সাথে।

ফাতিমা (রা)এর চুপ থাকাই সম্মতি ছিল। 'রাসুল ﷺ সাহাবিদের উদ্দেশে বলেন, "কুমারী মেয়ের সম্মতি ব্যতীত তাকে বিয়ে দেবে না।" সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, "তার অনুমতি কেমন, আল্লাহর রাসুল?" রাসুল ﷺ উত্তর দিলেন, "কুমারী কন্যার চুপ থাকাই সম্মতি।"[সহিহুল বুখারি:৫১৩৬]

কন্যা পিতার কাছে আমানত। কন্যার অমতে তার বিয়ে দেওয়া বৈধ নয়।

**দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণময় কাজের নির্দেশনা দিতেন-**

আলি বলেন (রা), 'একবার ফাতিমা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর ঘরে এলেন তাঁর আটা পেষার কষ্টের কথা জানিয়ে একটি খাদিম চাওয়ার জন্য। কিন্তু ঘরে এসে তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ কে পেলেন না। তাই বিষয়টি আয়িশা (রা) কে বলে চলে গেলেন। রাসুল ﷺ ঘরে এলে আয়িশা (রা) তাঁকে ফাতিমার (রা)খাদিম চাওয়ার কথা জানালেন।' আলি বলেন, 'এরপর রাসুল ﷺ আমাদের কাছে আসলেন। ততক্ষণে আমরা শুয়ে পড়েছিলাম। তাঁকে দেখে আমরা উঠে বসতে চাইলাম। কিন্তু তিনি "তোমরা আপন জায়গায় থাকো" বলে আমাদের মাঝখানে এসে বসলেন। আমি তখন আমার বুকে তাঁর ﷺ দুপায়ের শীতল স্পর্ক অনুভব করলাম। তিনি ﷺ বললেন, "আমি কি তোমাদের খাদিমের চেয়ে উত্তম কিছুর সন্ধান দেবো না? যখন তোমরা ঘুমানোর জন্য বিছানায় আসবে অথবা শুয়ে পড়বে, তখন ৩৩ বার "আল্লাহু আকবার", ৩৩ বার "সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার

"আলহামদুলিল্লাহ" পড়বে। এটা তোমাদের জন্য খাদিমের চাইতেও বেশি উত্তম।"[সহিহুল বুখারি:৩৭০৫]

রাসুল ﷺ নিজ কন্যাকে খাদিম না দেওয়ার কারণ হচ্ছে, তিনি আহলে সুফফার দরিদ্রদের কষ্ট লাঘব করাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। নিজের পরিবারের জন্য সবর করাই শ্রেয় মনে করেছিলেন। কারণ, এতে তারা অধিক সাওয়াবের অধিকারী হয়।

**☐ বিয়ের পরও মেয়ের দেখাশোনা করতেন:**

বিয়ের পরও নবিজি ﷺ আগের মতোই কন্যাদের খোঁজখবর অব্যাহত রাখেন। কোনো ব্যস্ততাতেই তিনি কন্যাদের তত্ত্বাবধানে পিছপা হতেন না। এমনকি কঠিন থেকে কঠিন অবস্থায়ও কন্যাদের ব্যাপারে চিন্তা করতেন। নবিজি ﷺ যখন বদর অভিযানে বের হন। তখন তাঁর কন্যা রুকাইয়া(রা) অসুস্থ। একটু পরে তাঁকে কুরাইশ ও কুরাইশের প্রবল নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। ভীষণ এক বাস্তবতা তাঁর সামনে। কিন্তু তবুও তিনি কন্যার অসুস্থতার কথা ভুলে যাননি। রুকাইয়াক(রা)এর স্বামী উসমান বিন আফফান(রা)কে তিনি মদিনায় থাকার আদেশ করলেন। যাতে রুকাইয়ার দেখাশোনা করতে পারেন। তিনি তাকে গনিমতের অংশ তো দিলেনই এবং বললেন, আল্লাহর কাছে তিনি জিহাদের সাওয়াবও পাবেন।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কারণে কেউ একজন উসমান (রা)সম্পর্কে ইঙ্গিতে অসংলগ্ন মন্তব্য করল। জবাবে ইবনে উমর (রা)বলেন, 'বদরের যুদ্ধে অংশ না নেওয়ার কারণ হচ্ছে রাসুল ﷺ এর সাহেবজাদি রুকাইয়া ছিলেন উসমানের স্ত্রী। বদরের সময়টাতে রুকাইয়া বেশ অসুস্থ ছিলেন। তাই নবিজি ﷺ তাঁকে মদিনায় থেকে যাওয়ার আদেশ করলেন এবং বললেন, "তোমার জন্য বদরে যোগদানকারীর প্রতিদান রয়েছে এবং রয়েছে বদরের গনিমতের অংশও।"[সহিহুল বুখারী:৩১৩০]

## ☐ আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আচরণ:

আত্মীয়দের প্রতি রাসুল ﷺ ছিলেন পৃথিবীর সর্বোত্তম সদাচরণকারী। আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ প্রতিটি মানুষের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল ভালোবাসাপূর্ণ। রাসুল ﷺ এর সাহাবিদের ভাষায়, 'তিনি মানুষের প্রতি সর্বোচ্চ অনুগ্রহকারী ও সর্বোত্তম আত্মীয়তা রক্ষাকারী।’'[সহিহ মুসলিম:১০৭২]

## ☐ রাসুল ﷺ তাঁর আত্মীয়তার প্রশংসা ও মূল্যায়ন করতেন:

মুত্তালিব বিন আবু বিদাআ বলেন, 'কারও মুখে কিছু একটা শুনে আব্বাস (রা) এলেন রাসুল ﷺ এর কাছে। রাসুল ﷺ মিম্বারে উঠে সবার উদ্দেশে বললেন, "আমি কে?" সবাই বলল, "আপনি আল্লাহর রাসুল ﷺ , আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

এরপর তিনি বললেন, "আমি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব। আল্লাহ তাআলা মাখলুককে সৃষ্টি করলেন। তাদের মধ্যকার উত্তম দলে আমাকে রাখলেন। এরপর এ দলকে তিনি দুটি ভাগে বিভক্ত করলেন। সবচেয়ে উত্তম দলে আমাকে রাখলেন। এরপর এ দলটিকে তিনি অনেকগুলো গোত্রে বিভক্ত করলেন। আমাকে রাখলেন সর্বোত্তম গোত্রে। এরপর সে গোত্রকে অনেকগুলো ঘরে বিভক্ত করলেন। আমাকে রাখলেন সবচেয়ে উত্তম ঘর ও সবচেয়ে উত্তম বংশে।

"কারও মুখে কিছু একটা শুনে আব্বাস এলেন রাসুল ﷺ এর কাছে"- অর্থাৎ কোনো কাফিরের মুখে রাসুল ﷺএর নিন্দা শুনে তাঁর কাছে এলেন আব্বাস। আর এ হাদিসে রাসুল ﷺ এর আত্মীয়দের সর্বোচ্চ প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে।

সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস বলেন, 'রাসুল ﷺ আব্বাসের উদ্দেশে বললেন, "এ হচ্ছে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব, কুরাইশদের মাঝে সবচেয়ে মহানুভব ও সবচেয়ে বেশি আত্মীয়তা রক্ষাকারী।

### ☐ বিশেষ মুহূর্তে আপন আত্মীয়দের সাহায্য চাইতেন:

আকাবার ঘটনায় রাসুল ﷺ তাঁর চাচা আব্বাসকে নিয়ে এসেছিলেন। ঘটনাট কাব বিন মালিক (রা)এর মুখে শোনা যাক। তিনি বলেন, 'আমরা হজ্জে এলাম। রাসুল ﷺ আমাদের ওয়াদা দিলেন তাশরিকের দিনগুলোর মধ্যবর্তী এক দিনে আসবেন তিনি। আমরা সময়মতো সাক্ষাতের স্থানে এসে রাসুল ﷺ এর অপেক্ষা করছিলাম। শেষ পর্যন্ত রাসুল ﷺ উপস্থিত হলেন। সাথে ছিলেন তাঁর চাচা আব্বাস। তখনো তিনি মুসলমান হননি। তবে তিমি চাচ্ছিলেন যে, ভাতিজার বিষয়টিতে তিনি হাজির থাকেন এবং আলোচনাটি সুদৃঢ় করেন।

আমরা সবাই বসে পড়লাম। আব্বাস প্রথমে কথা আরম্ভ করেন। বলেন, "খাজরাজ গোত্র, তোমরা জানো মুহাম্মাদকে আমরা আমাদের গোত্রের ভেতরের শত্রুদের থেকে নিরাপদে রেখেছি। তিনি আপন গোত্রের মাঝে সম্মান, মর্যাদা ও নিরাপত্তার সঙ্গে আছেন। কিন্তু তোমাদের সাথে গিয়ে মিলিত হওয়ার ব্যাপারে তিনি সংকল্পবদ্ধ। তোমরা যদি তোমাদের ওয়াদামাফিক। তাঁকে সাহায্য করো এবং তাঁর শত্রুদের অনিষ্ট থেকে তাঁকে রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকো, তবে ঠিক আছে। তোমরা যে জিম্মাদারি গ্রহণ করতে যাচ্ছ, আশা করি তার গুরুত্ব সম্পর্কে তোমাদের জানা আছে।

কিন্তু যদি বিষয়টি এমন হয় যে, তোমাদের কাছে যাওয়ার পর তোমরা তাঁকে শত্রুদের হাতে সোপর্দ করবে, বিপদে তাঁর সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে নেবে, তবে এখনি তাঁকে পরিত্যাগ করো। কেননা, তিনি আপন গোত্রে সম্মান, মর্যাদা ও নিরাপত্তার সাথে আছেন।

কাব (রা)বললেন, "আমরা আপনার কথা মেনে নিয়েছি।” তারপর রাসুল ﷺ কে লক্ষ করে বললেন, “হে আল্লাহর রাসুল ﷺ, আপনি কথাবার্তা বলুন। আপনি নিজের জন্য এবং আপনার রবের জন্য যা শর্ত নির্ধারণ করতে চান করুন। এরপর রাসুল ﷺ কথা বললেন। কুরআন তিলাওয়াত করলেন; আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন এবং সমবেত লোকদের ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করলেন....

**আত্মীয়দের সহযোগিতা নিতেন এবং তাদের দায়িত্ব দিতেন:**

কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ :

-হিজরতের রাতে নিজের বিছানায় শোয়ার জন্য আলি (রা)কে আদেশ দেন।

-খাইবারের যুদ্ধের দিন আলি (রা)কে মুসলিম বাহিনীর আমির নিযুক্ত করেন।

-হজের সময় রাসুল ﷺ নিজের পক্ষ থেকে কুরবানির জন্য পশুগুলো রেখে অতিরিক্ত জন্তুগুলো আলি(রা)কে দিয়ে দিয়েছিলেন। রাসুল ﷺ এর উটগুলোর দায়িত্বও দিলেন তাকে। তার দায়িত্ব ছিল উট জবাইয়ের গোশত, চামড়া ও উটের ঝুল মানুষকে দান করা ।

আলি (রা)বলেন, 'নবিজি ﷺ হাদি হিসেবে একশটি উট নিয়েছিলেন সাথে। জবাইয়ের পর আমাকে গোশত বণ্টনের নির্দেশ দিলেন। আমি বণ্টন করে দিলাম। এরপর হুকুম দিলেন উটগুলোর ঝুল বণ্টন করার। আমি করলাম। এরপর নির্দেশ দিলেন উটগুলোর চামড়া বাটোয়ারা করে দেওয়ার। আমি তাও করলাম।

রাসুল ﷺ তাঁর চাচাতো ভাই জাফর (রা)কে হাবশার মুহাজিরদের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেন। রাসুল ﷺ এর পক্ষ থেকে তিনিই হাবশার বাদশাহর কাছে প্রথম রিসালাতের ফরমান নিয়ে যান। তিনিই নাজ্জাশির সামনে ইসলামের পরিচিতিমূলক সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ ভাষণ দেন।

## ▢ প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহর ﷺ আচরণ:

আল্লাহ তাআলা মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। তাদের রূপ ও আকৃতিতে যেভাবে বৈচিত্র রেখেছেন, তেমনই শরীর, বর্ণ ও শক্তিমত্তার ক্ষেত্রেও পার্থক্য নিরূপণ করেছেন।

কিছু মানুষকে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন শারীরিক নিয়ামত থেকে বঞ্চিত রেখেছেন যা অন্যদের মাঝে যথাযথরূপে বিদ্যমান আছে। এ ধরনের মানুষ আবার কয়েক শ্রেণিতে বিভক্ত: দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, অবশ, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ইত্যাদি।

সাধারণত, কোনো সমাজই এ শ্রেণির লোকদের থেকে মুক্ত হয় না। বিপদ ও নিয়ামত-বঞ্চনার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে আবার তারতম্য আছে। যেমন: অন্ধের চেয়ে কানার বিপদ ও কষ্ট কম এবং অবশের চেয়ে খোড়ার বিপদ ও বঞ্চনা কম। সুতরাং যার বিপদ ও বঞ্চনা কম, সে বেশি বিপদ ও বঞ্চনাযুক্তকে দেখে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তি এই শ্রেণির সবাইকে দেখে উপদেশ গ্রহণ করবে।

তবে মানুষ পূর্ণ সুস্থ হোক বা প্রতিবন্ধী হোক, প্রত্যেকের মাঝে কিন্তু আল্লাহর অসংখ্য ও অগণিত নিয়ামত রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক মানুষকে সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

'যদি আল্লাহর নিয়ামত গণনা করো, তবে গুনে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ।'[সূরা ইবরাহীম,১৪:৩৪]

যারা প্রতিবন্ধী, তাদের আল্লাহ তাআলা অন্য কোনো নিয়ামতের মাধ্যমে তর প্রতিবন্ধিত্বের বদলা দিয়েছেন। এ কারণেই অন্ধ ব্যক্তি অন্যদের তুলনায় অধিক মেধাবী, প্রখর স্মৃতিশক্তি ও তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তির অধিকারী হয়ে থাকে।

মূর্খরা বলে, প্রতিবন্ধীদের প্রতি গুরুত্ব প্রদান বা তাদের চিকিৎসা ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যে কী এমন উপকারিতা রয়েছে?

আমরা বলি, এমন মানসিকতা কেবল এমন ব্যক্তিরই থাকতে পারে, যার মারে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ইমান নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সাওয়ার ও প্রতিদানের আশা করে না, সে-ই কেবল এমন মানসিকতা লালন করয়ে পারে। বরং এমন মানসিকতা যে লালন করে, তার মনুষ্যত্ব ও মানবিকতাও চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ।

যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা জানে এবং বিশ্বাস করে, আমাদের মাঝে প্রতিবন্ধীদের উপস্থিতিতে রয়েছে অনেক বড় হিকমত ও সূক্ষ্ম উপকারিতা। প্রতিবন্ধিত্ব আক্রান্তদের জন্য নানাবিধ উপকারিতা বয়ে আনে এবং সুস্থ-

সবলদের জন্য অনেক বড় উপদেশ।প্রতিবন্ধী ও স্থায়ী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাথে রাসুল ﷺ এর আচরণবিধির আলোচনা অনেক ব্যাপক।

## তাদের জান্নাতের সুসংবাদ দিতেন

আনাস বিন মালিক বলেন, আমি রাসুল ﷺ কে বলতে শুনেছি

إن الله قَالَ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بحبيبتيه فصبر، عوضته منهما الجنة

'আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, "যদি আমি আমার বান্দাকে তার দুটি প্রিয় বস্তু দ্বারা (দুই চোখের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করার মাধ্যমে) পরীক্ষা করি, অতঃপর সে তার ওপর ধৈর্যধারণ করে, তখন তার বিনিময়ে আমি তাকে জান্নাত দান করব।"[সহিহুল বুখারী:৫৬৫৩]

'দুটি প্রিয় বস্তু' অর্থ দুই চোখ। কারণ, এ দুটিই মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। যার চোখ নেই, সে ভালো ও উপকারী বস্তু দেখে তা অর্জন করতে পারে না এবং মন্দ ও ক্ষতিকর বস্তু দেখে তা থেকে বাঁচতে পারে না-এ আফসোস তাকে সর্বদা তাড়িয়ে ফেরে।

'অতঃপর সে তার ওপর ধৈর্যধারণ করে'-হাদিসের এ অংশটির ব্যাখ্যা অন্য রিওয়ায়াতে বিদ্যমান আছে-

مَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الجَنَّةِ

'যার দুটি প্রিয় বস্তু আমি নিয়ে নিয়েছি, অতঃপর সে তার ওপর ধৈর্যধারণ করেছে এবং (আমার নিকট) তার প্রতিদান কামনা করেছে, তাকে এর প্রতিদান হিসেবে জান্নাত না দিয়ে আমি সন্তুষ্ট হব না।[সুনানুত তিরমিজি:২৪০১]

## ▢ প্রতিবেশীর সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আচরণ:

প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহয় অসংখ্য বক্তব্য পাওয়া যায়। প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা, তাদের কল্যাণ কামনা করা, সম্মানের হিফাজত করা, তাদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা, তাদের গাইরে মাহরামদের দেখলে চক্ষু অবনত রাখা, তাদের সন্দেহের উদ্রেক হয় কিংবা কষ্ট হয়—এমন কাজ থেকে দূরে থাকা ইত্যাদি প্রতিবেশীর হকের মধ্যে পড়ে।

### ▢ প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে সচেতন করতেন:

আয়িশা বলেন, 'রাসুল বলেন ﷺ, "জিবরিল আমাকে প্রতিবেশীদের সম্পর্কে এত বেশি নির্দেশনা দিচ্ছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত আমার ধারণা হলো অচিরেই প্রতিবেশীদের ওয়ারিশ বানিয়ে দেওয়া হবে।"[সহিহুল বুখারি:৬০১৪]

এক আনসারি সাহাবি বলেন, 'আমি ঘর থেকে বেরিয়ে নবিজি ﷺ এর কাছে এলাম। দেখলাম, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। এক লোক তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। আমার মনে হলো, হয়তো লোকটার কোনো প্রয়োজন আছে।

আল্লাহর কসম, রাসুল ﷺ এত দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন যে, আমার নিজেরই দুঃখবোধ হতে লাগল তাঁর জন্য। লোকটা চলে গেলে আমি এগিয়ে এলাম রাসুল ﷺ এর কাছে। বললাম, "আল্লাহর রাসুল ﷺ, লোকটা এত দীর্ঘ সময় ধরে আপনাকে দাঁড় করিয়ে রাখল যে, আমি দুঃখবোধ করতে শুরু করেছিলাম আপনার জন্য।"

রাসুল ﷺ ও বললেন, "তুমি তাকে দেখেছ?"

"জি", বললাম আমি।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি জানো, কে ছিল লোকটা?"

“না", বললাম আমি।

রাসুল ﷺ বললেন, "লোকটা ছিল জিবরিল। তিনি আমাকে প্রতিবেশীর অধিকার বিষয়ে এত বেশি নির্দেশনা দিতে থাকলেন যে, আমার ধারণা হচ্ছিল প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ বানিয়ে ওহি নাজিল হবে।"

এমনকি বিদায় হজের দিনও রাসুল ﷺ সাহাবিদের নির্দেশনা দিলেন প্রতিবেশীর অধিকার আদায়ের ব্যাপারে। আবু উমামাও বলেন, 'বিদায় হজের দিন রাসুল ﷺ কে তাঁর উটের ওপর বসে বলতে শুনলাম, "আমি তোমাদের প্রতিবেশীর অধিকার বিষয়ে অসিয়ত করছি।" তিনি এ কথাটি অনেক বার বললেন। এমনকি আমি মনে মনে বলে ফেললাম, রাসুল ﷺ প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ ঘোষণা করবেন।

**▢ প্রতিবেশীর সম্মান করা ইমানের নিদর্শন আখ্যা দিয়েছেন:**

আবু শুরাইহ আদাবি (রা)দেখেছি। যখন রাসুল বলেন, 'আমি নিজ কানে শুনেছি। নিজ চোখে বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে।"

'এ হাদিসের রাবি আতা খুরাসানি(রা)এর কাছে জানতে চাওয়া হলো, প্রতিবেশীর অধিকার কী কী?'

তিনি বললেন, 'যখন প্রতিবেশী তোমার কাছে সাহায্য চায়, তাকে সাহায্য করা। যখন ঋণ চায়, ঋণ দেওয়া। প্রতিবেশী দরিদ্র হলে তাকে দান করা। অসুস্থ হলে সেবা করা। ভালো কিছু অর্জন করলে তাকে অভিনন্দন জানানো। বিপদে পতিত হলে সান্ত্বনা জানানো। মৃত্যুবরণ করলে তার জানাজায় অংশ নেওয়া।

প্রতিবেশীর অনুমতি ছাড়া তোমার ঘরটি এত উঁচু তৈরি করবে না যে, এতে করে প্রতিবেশীর ঘরে বাতাস প্রবেশে বিঘ্ন ঘটে। প্রতিবেশীকে তোমার ঘরের রান্নার ঘ্রাণ দিয়ে কষ্ট দেবে না, যদি না তুমি তাকে সে খাবারের কিছু অংশ দাও।।

যদি ফল কিনে থাকো, তবে তার কিছু প্রতিবেশীকে হাদিয়া দাও। যদি হাদিয়া না দিতে পারো, তবে নিজের ঘরে ফল গোপনে প্রবেশ করাও। তোমার সন্তানদের হাতে দিয়ে

সে ফল নিয়ে বাইরে বের হতে দেবে না। এতে প্রতিবেশীর সন্তানের মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে। '

ইবনে হাজার (রাহি)বলেন, 'প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষা করা পরিপূর্ণ ইমানের নিদর্শন। এমনকি ইসলাম-পূর্ব যুগেও এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হতো। প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষা করার ধরন হচ্ছে, সাধ্যমতো প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ করা। যেমন: তাকে হাদিয়া দেওয়া, সালাম দেওয়া। তার সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা। তার খোঁজখবর নেওয়া। প্রয়োজনের সময় তাকে সাহায্য করা। বাহ্যিক ও মানসিক দিক থেকে কষ্ট না দেওয়া এবং কষ্টের কারণ দূর করা।'

**□ জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অনুসরণীয় আদর্শ:**

মানব ইতিহাসে কারো জীবনী এত বিস্তারিত, সুক্ষাতিসুক্ষ,জীবনের প্রত্যকেটি দিক প্রামাণিকভাবে লেখা হয়নি। ইমাম আত-তিরমীযী (রাহিমাহুল্লাহ) এর শামায়েলে তিরমীযী- তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর শোয়ার ধরণ, তাঁর শরীরের রঙ, কপালের বর্ণনা, চোখের বর্ণনা, চুলের পরিপাটি, হাটার ধরণ, খাওয়ার পদ্ধতি, কথার বলার বাচন ভংগিমা, অন্যের সাথে আচার-আচরণ থেকে শুরু করে পারিবারিক, আত্মীয়সজনের সাথে চলাফেরা, বন্ধু, স্ত্রী, সাহাবী, সবার সাথে কেমন চলতেন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সব দিক—-এভাবে সকল দিক প্রামাণিকভাবে এতো সুক্ষাতিসুক্ষ রক্ষণাবেক্ষন ইতিহাসে জীবন্ত হয়ে আছে রাসূল ﷺ এর জীবনীতে। অথচ তিনি কোনো জীবনী নিজে লেখননি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন অসামান্য সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং পরিপূর্ণ স্বভাবের এমন এক ব্যক্তিত্ব, মানব সমাজে কোনকালেও যাঁর তুলনা মেলে না। তিনি ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিত এবং সর্বপ্রকার চরিত্র ভূষণে বিভূষিত এমন এক ব্যক্তিত্ব যাঁর সংশ্রবে আসা ব্যক্তিমাত্রই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা সম্পদে হৃদয় মন পরিপূর্ণ না করে পারতেন না। জাতি ধর্ম বর্ণ এবং শ্রেণী নির্বিশেষে সকল মানুষেরই তিনি ছিলেন অকৃত্রিম বন্ধু, একান্ত নির্ভরযোগ্য সুহৃদ এবং পরম হিতৈষী আপন জন। তাঁর সাহচর্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণও তাঁর জানমালের হেফাজত, সেবা যত্ন এবং মান-মর্যাদা সমুন্নত রাখার ব্যাপারে এতই সচেতন ও তৎপর থাকতেন

যে, মানব জাতির ইতিহাসে কোনকালেও এর কোন নজির মেলে না। শুধু তাই নয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতেও কক্ষনো কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

**দেহ সৌষ্ঠব:**

**উম্মু মা'বাদ খুযায়ীয়্যাহ এর বর্ণনা:** হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ উন্মু মা'বাদ খুযায়ীয়্যাহ নাম্নী এক মহিলার তাঁবুর পাশ দিয়ে গমন করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গমনের পর তাঁর চেহারা মোবারক সম্পর্কে সে মহিলা স্বীয় স্বামীর নিকট যে বর্ণনা চিত্র তুলে ধরেছিলেন তা হচ্ছে এই ঝকঝকে গাত্রবর্ণ, সমুজ্জ্বল মুখমণ্ডল, সুশোভন দেহ সৌষ্ঠব, লম্বোদর ও টেকো মাথা হতে ত্রুটিমুক্ত, সুমিষ্ট উজ্জ্বলতায় সুস্নাত সুশোভন চিত্র, দীর্ঘ পলকবিশিষ্ট সুরমা সুশোভিত চক্ষু, গাম্ভীর্যমণ্ডিত কণ্ঠস্বর, দীর্ঘ গ্রীবা, পরস্পর সন্নিবেশিত চিকন ভ্রূযুগল, জাঁকাল কৃষ্ণ কেশদাম, নীরবতা অবলম্বন করলে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে গাম্ভীর্য, অত্যন্ত আকর্ষণীয় কথনভঙ্গী, সুমিষ্টভাষী, সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন কথাবার্তা না সংক্ষিপ্ত, না অতিরিক্ত, কথা বললে মনে হয় মালা থেকে মুক্তা ঝরছে, মানানসই মধ্যম উচ্চতা বিশিষ্ট দেহ, না অস্বাভাবিক দীর্ঘ, না খর্ব, দু' শাখার মধ্যে এক শাখা বিশিষ্ট তিনটির মধ্যে যেটি সব চেয়ে তাজা, সুন্দর ও উজ্জ্বলতাপূর্ণ। বন্ধুগণ তাঁর চারপাশে গোলাকৃতি ধারণ করেন। তিনি যখন কোন কিছু বলেন তাঁরা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তা শ্রবণ করেন। তাঁর পক্ষ থেকে কোন নির্দেশপ্রাপ্ত হলে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করেন। আনুগত্যশীল, সম্মানিত, সুমিষ্ট ও স্বল্পভাষী।

**'আলী (রা)এর বর্ণনা:** রাসূলুল্লাহ ﷺ গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে 'আলী বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বেমানান দীর্ঘকায় কিংবা হ্রস্বকায় কোনটিই ছিলেন না। তিনি ছিলেন এ দুয়ের সমন্বয়ে অত্যন্ত মানানসই মধ্যম দেহী পুরুষ। তাঁর চুলগুলো অতিরিক্ত কোঁকড়ানো ছিল না, কিংবা একেবারে সোজা খাড়াও ছিল না, বরং এ দুয়ের সমন্বয়ে ছিল এক চমৎকার রূপভঙ্গীবিশিষ্ট। তাঁর গণ্ডদেশে মাংস বাহুল্য ছিল না। চিবুক ক্ষুদ্রাকার এবং কপাল নীচু ছিল না। তাঁর মুখমণ্ডল ছিল গোলাকার, গাত্রবর্ণ ছিল গোলাপী ও বাদামীর সংমিশ্রণ। চোখের পাতা ছিল লম্বাটে গড়নের, সন্ধিসমূহ এবং

কাঁধের হাড্ডিগুলো ছিল বড় আকারের, বক্ষের উপরিভাগ থেকে নাভি পর্যন্ত ছিল স্বল্প পশমবিশিষ্ট একটি হালকা বক্ষরেখা, শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিল কেশমুক্ত। হাত ও পাদ্বয় ছিল মাংসল, পথ চলার সময় একটু সম্মুখভাগে ঝুঁকে পা ওঠাতেন এবং এমনভাবে চলতেন যা দেখে মনে হতো যে,যেন কোন ঢালু পথ।

যখন কারো প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন তখন সে ব্যাপারে পুরোপুরি মনোযোগী হতেন। তাঁর পৃষ্ঠদেশে উভয় কাঁধের মধ্যভাগে ছিল মোহরে নবুওয়াত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সর্বশেষ নাবী। দানশীলতা, সাহসিকতা এবং সত্যবাদিতায় তিনি ছিলেন সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা অধিক আমানতের হিফাজতকারী এবং অঙ্গীকার পালনকারী, তিনি ছিলেন সর্বাধিক কোমল স্বভাবের অধিকারী এবং সকলের চেয়ে বিশ্বস্ত সহচর এবং নির্ভরযোগ্য সঙ্গী।

কেউ আকস্মিকভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাক্ষাতপ্রাপ্ত হলে তার অন্তর ভয়ে কম্পিত হত। কেউ তাঁর সঠিক পরিচয় লাভ করলে ঐকান্তিক আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সীরাত বর্ণনাকারীগণ শুধুমাত্র এটুকুই বলতে পারেন যে, তাঁর আগে এবং পরে অনুরূপ কোন ব্যক্তিকেই তাঁর মতো দেখিনি।'

## □ ৩৩.শেষ কথা:

আলহামদুলিল্লাহ,আমি আল্লাহ আযযা ওয়া জালের কাছে কৃতজ্ঞ কারণ তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির সম্পূর্ণ জীবনী শুরু থেকে শেষ করার জন্য আমাকে তাওফীক্ব দিয়েছেন। আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে দুআ করি যেন তিনি আমাকে তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা সত্যিই রাসূলুল্লাহ ﷺ কে ভালোবাসে। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল যেন আমাকে তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা রাসূলুল্লাহর সুন্নাহ অনুসরণ করে, তাঁর দেখানো পথ আঁকড়ে ধরে এবং নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করে।

আল্লাহ আযযা ওয়া জাল যেন আমাকে তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে কিয়ামতের দিন মিলিত হবেন এবং তাঁর হাতে হাউযে কাউসারের পানি পান করবেন। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল যেন আমাকে তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে জান্নাতে প্রবেশ করার তাওফীক প্রাপ্ত হবে।

সালাম বর্ষিত হোক সায়্যিদানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি,তার পরিবার এবং সাহাবিদের প্রতি।

## তথ্যসূত্র:

১.আর-রাহিকুল মাখতূম বা মোহরাঙ্কিত জান্নাতী সুধা(শায়খুল হাদীস আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী রাহি:)

২.রেইন ড্রপস সীরাহ

৩.যেমন ছিলেন তিনি ﷺ (শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ)

৪.নবীজি ﷺ (শাইখ ড.আয়য আল করনি)

৫.সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া ﷺ (মুফতি মুহাম্মাদ শফি রাহ:)

৬.সীরাতে ইবনে হিশাম

---

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111536941/